অভিজিৎ রায়

বিশ্বাসের ভাইরাস

বিশ্বাসের বিবর্তনীয় বিশ্লেষণ

বিশ্বাস নির্ভর ধর্মের প্রভাব আমাদের সমাজে ব্যাপক। আমাদের পরিচিতি, রীতি-নীতি, বিয়ে সামাজিক উৎসব–বহু কিছুতেই আমরা ধর্মের অস্তিত্বের খোঁজ পাই। কিন্তু আমরা ক'জন জানি যে, ধর্মের বিস্তার আর টিকে থাকার ব্যাপারগুলো ভাইরাসের মত করে কাজ করে অনেকটা? একটি ভাইরাসের যেমন একগাদা 'হোস্ট' দরকার হয় বংশবৃদ্ধির জন্য, নিজেকে ছড়িয়ে দেবার জন্য, ধর্মেরও টিকে থাকার জন্য দরকার হয় এক গাদা অনুগত বান্দা এবং সেবকের, যাদের বুকে আশ্রয় করে ধর্ম টিকে থাকে। শুধু তাই নয়, এক জীবাণু যেমন নিজেকে রক্ষার জন্য অন্য জীবাণুর সাথে প্রতিযোগিতা করে, ঠিক তেমনি এক বিশ্বাসও প্রতিযোগিতা করে অন্য বিশ্বাসের সাথে। নিজেকে অন্য বিশ্বাসের হাত থেকে রক্ষা করতে চায়। ভাইরাস যেমন চোখ বন্ধ করে নিজের কপি করে করে জীবাণু ছড়িয়ে যায়, প্রতিটি ধর্মীয় বিশ্বাস অন্য বিশ্বাসগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে একইভাবে কেবল নিজের বিশ্বাসের কপি করে যেতে থাকে। বিস্তার ঘটাতে থাকে বিশ্বাস নির্ভর সাম্রাজ্যের।

বিশ্বাস ব্যাপারটাকে এমনিতে শান্ত, সুন্দর, নিরীহ আর গোবেচারা গোছের বলে সাধারণভাবে ধরে নেয়া হলেও সময় এবং সুযোগ পেলে কীভাবে নখদন্ত বের করে তার রক্তলোলুপ চেহারাটা প্রকাশ করে দেয়, তা আমরা সবাই কমবেশি জানি। বিশ্বাসের প্রভাবে বলীয়ান হয়ে মানুষ সেই প্রাচীনকাল থেকেই কুমারী শিশু হত্যা করে দেবতাকে তুষ্ট করেছে, কখনো জীবন্ত কবর দিয়েছে, সতীদাহের নামে শত সহস্র নারীকে পুড়িয়ে মেরেছে, নাস্তিক-মুরতাদ-বিধর্মীদের হত্যা করেছে, চাপাতি দিয়ে কুপিয়েছে, ক্রুসেড করেছে, ধর্মযুদ্ধ করেছে, ডাইনী সাব্যস্ত করে নিরপরাধ মেয়েদের পুড়িয়ে মেরেছে, কখনো বা সারা পৃথিবী জুড়ে চলেছে জিহাদের নামে রক্তের হোলি খেলা। বিশ্বাসের এই সংক্রমণকে থামাতে হলে বিশ্বাসের ভাইরাসকে ভাল করে বোঝা চাই।

বিজ্ঞান লেখক হিসেবে ড. অভিজিৎ রায়ের নাম আজ প্রথম সারিতে। বাংলাদেশে হাতে গোনা মুষ্টিমেয় যে সমস্ত লেখকেরা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রান্তিক জ্ঞান এবং তথ্যের নিরিখে সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ সাধারণ পাঠকদের দুয়ারে নিত্য পৌছে দিচ্ছেন, অভিজিৎ রায় নিঃসন্দেহে তাদের শীর্ষস্থানীয় কাণ্ডারি। বিজ্ঞান এবং দর্শনের জগতে তার অবাধ বিচরণ দেখে ইন্টারনেটের বাংলা ব্লগ সাইটগুলোতে তার গুণমুগ্ধ পাঠকেরা তাকে অভিহিত করেছেন 'বাংলাদেশের রিচার্ড ডকিন্স' অভিধায়। কেউ বা তাকে আখ্যায়িত করেছেন 'শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান লেখক' (এ পার ওপার দুপার বাংলা মিলিয়েই) হিসেবে। বিজ্ঞানের জটিল অথচ রোমাঞ্চকর বিষয়গুলোকে কথাশিল্পের মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে প্রকাশ করা সহজ কাজ নয়। অথচ এই কঠিন কাজটি খুব সহজেই নিবিষ্ট মনে করে চলেছেন অভিজিৎ রায়। তার অপূর্ব প্রকাশভঙ্গী, আর সহজ সরল সাবলীল অথচ ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপনা বিজ্ঞানের জটিল ধারণাগুলোকে নিয়ে গিয়েছে সুন্দর এক শৈল্পিক স্তরে–যা তাকে দিয়েছে পাঠকপ্রিয়তা আর সুপরিচিতি।

বিজ্ঞান লেখার পাশাপাশি ড. অভিজিৎ রায়ের আরেকটি পরিচিতি আছে। তিনি বিজ্ঞানমনস্ক, অনুসন্ধিৎসু, সমাজ সচেতন, সত্যসন্ধানে আপোষহীন এবং নির্ভীক। বিজ্ঞান, মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদের আলোকে সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তার বহুদিনের। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা সমমনা বাঙালিদের নিয়ে ২০০১ সালে তিনি গঠন করেছেন মুক্তমনা সাইট (www.mukto-mona.com); এটি এখন বাঙালি বিজ্ঞানকর্মী, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদীদের সর্ববৃহৎ অনলাইন সংগঠন এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্লগসাইট হিসেবে দেশে-বিদেশে পরিচিতি পেয়েছে।

তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা আটটি।

অভিজিৎ রায় পেশায় প্রকৌশলী। পড়াশুনা করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট), পিএইচডি করেছেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরে (এন.ইউ.এস)। বর্তমানে আমেরিকার আটলান্টায় কম্পিউটার প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন।

বিশ্বাসের ভাইরাস

বিশ্বাসের বিবর্তনীয় বিশ্লেষণ

বিশ্বাসের ভাইরাস

বিশ্বাসের বিবর্তনীয় বিশ্লেষণ

অভিজিৎ রায়

জাগৃতি প্রকাশনী

বিশ্বাসের ভাইরাস / অভিজিৎ রায়

পুনর্মুদ্রণ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন, ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৪

প্রকাশক : ফয়সল আরেফিন দীপন
জাগৃতি প্রকাশনী
৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট
নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
আলাপন : ৮৬২৩২৩০
E-mail : jagritibooks@gmail.com
Website : www.jagritibooks.com
Facebook : Jagriti Prokashony

প্রচ্ছদ ফয়সল আরেফিন

মুদ্রণ দি ঢাকা প্রিন্টার্স
পান্থপথ, গ্রীনরোড, ঢাকা

মূল্য : তিনশত পঁচাত্তর টাকা

ISBN 978 984 90914 5 5

Bishwasher Virus (The Viruses of Faith) by Avijit Roy
Reprint of second edition February 2015, Published by Jagriti Prokashony
33 Aziz Super Market, Shahbag, Dhaka-1000. Price $ 15.00

উ ৎ স র্গ

শহীদ রাজীব হায়দার শোভন (থাবা বাবা)

শাহবাগ আন্দোলনে 'বিশ্বাসের ভাইরাস'-এর প্রথম শিকার

‘বিশ্বাসী মন খাঁচায় বন্দি পাখি, আর মুক্তমন যেন মুক্ত বিহঙ্গ – ঘন মেঘের পর্দা ভেদ করে উড়ে চলা অবিশ্রান্ত এক ডানামেলা ঈগল।’

– রবার্ট গ্রিন ইঙ্গারসোল (১৮৩৩-১৮৯৯)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্বাসের ভাইরাসের দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়ে গেল। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারির বইমেলায় যখন বইটির প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছিল তখন ভাবতেই পারিনি এতো দ্রুত — মানে কয়েক মাসের মধ্যেই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখতে হবে। কিন্তু লিখতে হল। নতুন সংস্করণের জন্য ভূমিকা লেখার পেছনে যেমন আনন্দের ছোঁয়া আছে, তেমনি পাশাপাশি আছে কিছুটা বেদনার ছোঁয়াও। সাধারণত কোন বইয়ের পুনঃ-প্রকাশের সময় ভূমিকা লিখতে গিয়ে লেখকেরা বেদনার্ত হন না; মনঃক্ষুণ্ণ হন না — বরং খুশিতে হন আপ্লুত। সেটাই তো স্বাভাবিক, তাই না? খুশি আমি যথেষ্টই, কিন্তু পাশাপাশি একটা জায়গায় আছে বেদনাও। নতুন বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে আমি খুশির পাশাপাশি বেদনার্ত হচ্ছি — এ কথা শুনে হয়তো অনেকে অবাক হবেন; কিন্তু সেটাই হচ্ছি। কারণ আছে অবশ্য। বইটি ২০১৪ সালের একুশে বইমেলায় অন্যতম সফল বিক্রিত বই হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। বহু পাঠক লাইন দিয়ে বইটি কিনেছেন। অনেকেই বইটি নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন। অনেকেই পড়ে মুগ্ধ হয়ে অন্যদেরও পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, বইমেলা শেষ হতে না হতেই বইটির বেশ কিছু ভাল রিভিউ অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছিল। তারমধ্যে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে মুক্তমনা ব্লগার দেব প্রসাদ দেবুর 'বিশ্বাসের ভাইরাস : মেনে নয়, মনে নিন' শিরোনামের চমৎকার রিভিউটির কথা। সেটি একাধিক সাইটে প্রকাশিত হয়েছিল[1]। এ ছাড়াও বহু জায়গায় বইটি নিয়ে লেখালিখি হয়েছে। এ পর্যন্ত অখুশি হবার কোন কারণ ছিল না।

কিন্তু খুশির সেই স্রোতে যেন খানিকটা ভাটা পড়ে গেল এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে শাফিউর রহমান ফারাবী নামের এক উগ্র জিহাদি ব্যক্তির কর্মকাণ্ডে। ফারাবী নামক চরিত্রটিকে যারা চেনেন, তারা জানেন — ফেসবুকে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, লুচ্চামি লোফারি করা, অজানা-অচেনা মেয়েদের হঠাৎ করে ম্যাসেজ পাঠিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া, নিজের মোবাইলে ফ্লেক্সিলোডের জন্য টাকা পয়সা চাওয়াসহ বহু ফাতরামির জন্য ফারাবী ইতোমধ্যেই কুখ্যাত (যারা ফারাবীর এ কাজগুলোর সাথে সম্যকভাবে পরিচিত নন, তারা মুক্তমনায় অনন্ত বিজয় দাশের লেখা 'ফারাবীর ফাতরামি' লেখাটা পড়ে নিতে পারেন[2])। কিন্তু সেটাই ফারাবীর একমাত্র পরিচয় নয়। নারী লোলুপ ফারাবী একদিকে যেমন মেয়েদের সাথে 'লুলামি'তে মহা-

---

[1] দেব প্রসাদ দেবু, বিশ্বাসের ভাইরাস: মেনে নয়, মনে নিন, মুক্তমনা, ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১৪; বইনিউজ২৪, মার্চ ২০, ২০১৪ ইত্যাদি।

[2] অনন্ত বিজয় দাশ, ফারাবীর ফাতরামি!, মুক্তমনা, লিঙ্ক: http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=40189

ওস্তাদ, ঠিক একই ধারায় আবার ধর্ম রক্ষার সাচ্চা সৈনিকও বটে! নারী অবমাননার পাশাপাশি তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে পাওয়া যায় ইসলাম ধর্ম প্রচারণার তাগুদি পোস্ট। ধর্মপ্রচারণা আর নারী অবমাননা যে একসূত্রে বাঁধা, তা ফারাবীকে না দেখলে ভাল করে বোঝা যাবে না। 'মানুষিকতা' গ্রন্থের লেখক এবং ব্লগার রায়হান আবীর বিডিনিউজ পত্রিকায় তার একটি কলামে ফারাবীকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন, তা খুবই তাৎপর্যমন্ডিত[3] –

> 'নিজেকে কখনও নিষিদ্ধ ঘোষিত 'হিজবুত তাহরির' কখনও 'শিবিরের' অনুসারী বলে প্রচার করা ফারাবীর ব্লগে আগমন ঘটেছিলো মূলত সহব্লগার মেয়েদের বিরক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে, তার প্রথম পোস্টও ছিলো অজানা অচেনা মেয়েদের 'বিয়ে করার অনুরোধ জানিয়ে'। মূলত বিভিন্ন ভুয়া আইডি খুলে ফেসবুক এবং ব্লগে মেয়েদের অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ প্রস্তাব দেওয়াই ছিলো তার কাজ। ফেসবুকে আপনারা যারা নিয়মিত, তারা খেয়াল করে দেখবেন, বাংলা ভাষায় ফেসবুকে যে সকল নারীবিদ্বেষী, অশ্লীল, যৌন সুড়সুড়ি যোগানো পাতা রয়েছে তাদের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এরা ইন্টারনেট থেকে নারীদের বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করে সেটা তাদের অনুসারীদের সামনে উপস্থাপন করে এবং একই সাথে আরও একটা বিষয়ে তারা সমান কম্পাঙ্কে পোস্ট করে। কী সেই বিষয়টা? ধর্ম। এবং যেহেতু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ইসলাম, তাই এই অশ্লীল পাতাগুলোর কাছেও ধর্ম বলতে কেবল ইসলাম। ফারাবী যেন এই মানুষগুলোরই প্রতিনিধি। যার একমাত্র কাজ হলো নারীদের উত্যক্ত করা এবং ইসলাম ধর্ম নিয়ে পোস্ট দেওয়া'।

ফারাবীর মত মানুষকে নিয়ে লিখতে কারো ভাল লাগে না, ফারাবী নামটা কোন মননশীল বইপত্রে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। 'বিশ্বাসের ভাইরাস' বইটির ভূমিকায় ফারাবীর মত লোককে নিয়ে সময় এবং শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে – ব্যাপারটা সত্যই বেদনার। কিন্তু তারপরেও একটা জায়গায় গুরুত্ব আছে। আসলে 'বিশ্বাসের ভাইরাস' ধারণাটির সাথে সাথে ফারাবীর সম্পর্ক গভীর। বিশ্বাসের ভাইরাস মস্তিষ্ক অধিকার করে ফেললে কী হয় – তার সহজ সরল এবং জলজ্যান্ত উদাহরণ হচ্ছে এই ফারাবী। ফারাবীর মত 'বিশ্বাসের ভাইরাস আক্রান্ত' মননেরা মনেই করে যে লেখকেরা ধর্মকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন, এ নিয়ে যুক্তিবাদী লেখা লেখেন, তাদের ধরে ধরে হত্যা করা জায়েজ। ফেসবুকে ফারাবীর খুব সহজ স্বীকারোক্তি – 'ইসলাম অর্থ শান্তি নয়, ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন। ইসলামের ভিতরে জিহাদ, ক্বিতাল সবই আছে। আল্লাহর রসূলকে যারা ঠাণ্ডা মাথায় গালিগালাজ করবে, আমরা তাদের হত্যা করব, এতে লুকোচুরির কিছু নেই।' আমি ইসলাম বা আল্লাহ রসূলকে গালিগালাজ করে কোন লেখা বা বই প্রকাশ করিনি। যারা আমার লেখালিখির সাথে পরিচিত তারা জানেন, আমার সবগুলো বই-ই আসলে প্রান্তিক বিজ্ঞান এবং দর্শনের অন্তিম সমস্যা নিয়ে আবর্তিত। কোন বিশেষ ধর্ম বা ধর্মগুরুর প্রতি লক্ষ্য স্থির করে কোন বই-ই লিখিত হয়নি। তারপরেও দেখছি আমার বই এবং

---

[3] রায়হান আবীর, উল্লাস ও রাহী বৃত্তান্ত: এখনও গেল না আঁধার, বিডিনিউজ২৪, মতামত বিশ্লেষণ, এপ্রিল ১৬, ২০১৪

লেখালিখি ফারাবীর মত বিশ্বাসের ভাইরাসাক্রান্ত মননের গায়ে জ্বালা ধরানোর জন্য ছিল যথেষ্ট। আসলে বিজ্ঞান এবং দর্শনের নির্মম সত্যগুলো সব সময়ই ধর্মবাদীদের বুকে শেলের মত বেঁধে। ধর্মরক্ষার জন্য তারা হয়ে উঠে মরিয়া। বছরের শুরুতেই আমাকে হত্যার হুমকি দিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিল এই উগ্র জঙ্গি। স্ট্যাটাসে বলেছিল, আমাকে হত্যা করা নাকি মুসলমানদের জন্য এখন 'ফরজ' হয়ে গেছে। পরে আরো বেশ কয়েকবার হত্যার হুমকি দিয়েছিল। ফেসবুক মন্তব্যে আমাকে শেষবার যে হত্যার হুমকি দিয়েছিল তাতে সে বলেছিল – 'অভিজিৎ রায় আমেরিকা থাকে। তাই তাকে এখন হত্যা করা সম্ভব না। তবে সে যখন দেশে আসবে তখন তাকে হত্যা করা হবে'। জনপ্রিয় জাতীয় দৈনিক বিডিনিউজ পত্রিকার একটি রিপোর্টে রীতিমত স্ক্রিনশট উল্লেখ করে ফারাবীর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছিল সে সময়[4]।

অবশ্য ফারাবীর হত্যার ফতোয়া নতুন কিছু নয়। এই ফারাবী ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাইম লাইটে এসেছিল রাজীব হায়দার শোভন ওরফে থাবা বাবার জানাজা পড়ার জন্য নিয়োজিত ইমামকে হত্যার উস্কানি দিয়ে। প্রকাশ্যেই বলেছিল, 'যে ইমাম থাবা বাবার জানাজা পড়াবে তাকেও হত্যা করা হবে'। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল সে সময়[5]। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে ফারাবীকে জামিনে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল দিন কয়েক পরেই। অনেকেই বলেছেন, এরপর থেকেই তার ডিজিটাল ফতোয়ার দাপট বেড়ে গিয়েছে মাত্রাতিরিক্তভাবে। সে অতীতে ঢাকা জজ কোর্টের জেলা জজ জহুরুল হককেও হত্যার হুমকি দিয়েছিল। খ্যাতনামা ব্লগার এবং অ্যাক্টিভিস্ট আসিফ মহিউদ্দীনকেও হত্যার হুমকি দিয়েছিল ফারাবী একাধিকবার। মজার ব্যাপার হচ্ছে যাকে সে হত্যার হুমকি দেয়, দুই দিন পরে আবার তার কাছেই টাকা চায়। হত্যার হুমকি দেয়ার মতো টাকা চাওয়াটাও ওর বাতিক, কিংবা হয়তো ফ্যাশন (আমি যখন ফেসবুকে নতুন, আমার কাছেও বেশ কয়েকবার ম্যাসেজ দিয়েছিল ফেসবুকে টাকা পয়সা চেয়ে; একবার তো ১০,০০০ টাকা চেয়ে বসল স্মার্টফোন কিনবে বলে; আরেকবার ম্যাসেজ দিয়েছিল পয়সাওয়ালা সুন্দরী মেয়ে আছে কিনা যাতে কিনা সে বিয়ে করতে পারে)। অনেকের কাছে এও শোনা যায়, ফারাবীর টাকা চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তির ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়ে গিয়েছিল যে, মেয়েদের সাথে যৌনালাপ করতে করতেই সে নাকি তাদের কাছে টাকা চাইতে থাকতো। পাশাপাশি নাস্তিক, মুরতাদ এবং বিধর্মীদের হত্যার ফতোয়া তো আছেই। এর মধ্যে একবার দেখলাম, নাট্যব্যক্তিত্ব পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে লিখেছিল – 'এফডিসির এই পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি দেশের আলেম উলামাদের কাছে ক্ষমা না চায় তাইলে এই পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও থাবা বাবার মত করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে'[6]। কিছুদিন আগে মুক্তচিন্তার লেখক পারভেজ আলমকে হত্যার ফতোয়া দিয়েছিল এই ডিজিটাল জিহাদি। তার নোটে খুব পরিষ্কারভাবেই লিখেছিল – '...এই পারভেজ আলমের বাসা হচ্ছে শনির আখড়ায়।

---

[4] জঙ্গিবাদ প্রচারকারীর উস্কানিতে চট্টগ্রামে দুই কিশোর গ্রেপ্তার, বিডিনিউজ২৪, এপ্রিল ২, ২০১৪, http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article767003.bdnews

[5] সেই ফারাবী গ্রেপ্তার, বিডিনিউজ২৪, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১৩

[6] পীযুষ বন্দোপাধ্যায়কে হত্যার জন্য ফারাবীর ফতোয়া, https://www.facebook.com/shafiur2012/posts/752622994764487

এই পারভেজ আলম প্রতিদিন বিকালবেলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবির হাটে আড্ডা দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে চরমভাবে কটাক্ষ করে status লেখার কারণে এই পারভেজ আলমকে হত্যা করা বাংলার মুসলমানদের জন্য এখন ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[7] হত্যার উস্কানির পাশাপাশি আবার অন্য ধরণের উস্কানিও আছে। কিছুদিন আগে সেনাবাহিনী এবং পুলিশকে উস্কানি দিয়েছিল, 'দেশের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে' অস্ত্র তুলে নিতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ড্রাকুলামানবী' হিসেবে চিহ্নিত করে দেশে 'আরেকটি রক্তাক্ত ১৫ আগস্ট' ঘটানোর উদাত্ত আহবান জানিয়েছিল এই উগ্রপন্থী ব্যক্তিটি। তার স্ট্যাটাসে ফারাবী বলেছিল[8] –

> 'শেখ হাসিনা বর্তমানে একটি ড্রাকুলায় পরিণত হয়ে গেছে। ড্রাকুলা তো সেই যে মানুষের রক্ত খায়। শেখ হাসিনা শুধু ড্রাকুলার ন্যায় বাংলার নিরীহ মানুষের রক্তই খাচ্ছেন না শেখ হাসিনার ভাত খাওয়ার জন্য, শেখ হাসিনার গোসল করার জন্য আরো অনেক বাংলার নিরীহ মানুষের রক্ত দরকার। শেখ হাসিনা বর্তমানে বাংলার নিরীহ মানুষের রক্ত খেয়ে বেঁচে আছে। "রক্ত রক্ত আমি তৃষ্ণার্ত" এটাই এখন ড্রাকুলা মানবী শেখ হাসিনার নীতি। ... আমাদের দরকার এখন আরেকটি ১৫ আগস্ট, ৭ নভেম্বর যার মাধ্যমে আমরা সিকিমের পরিণতি থেকে রেহাই পাব। তাই দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে আমি অনুরোধ করছি আজ রাতেই আপনারা একটা রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থান করে আমাদেরকে ড্রাকুলামানবী রক্তপিপাসু শেখ হাসিনার হাত থেকে উদ্ধার করেন'।

এ ধরণের বক্তব্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল। এ ধরণের বক্তব্য দিয়েও ফারাবী কিভাবে আইনের উর্ধ্বে থাকে সেটা রীতিমত বিস্ময়কর। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. মো. আনোয়ার হোসেন বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের একটি প্রখ্যাত দৈনিক পত্রিকার একটি কলামে ফারাবীর ব্যাপারে এমনকি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকেও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন[9]। অথচ দেশের আইনরক্ষকেরা এ ব্যাপারে ছিলেন বরাবরই নির্বিকার।

তাদের নির্বিকার থাকার একটি কারণ হয়তো যে ফারাবীর মৃত্যু হুমকিকে কেউ গুরুত্ব দিয়ে নেয়নি। ফারাবী প্রতিদিনই ফেসবুকে কাউকে না কাউকে মৃত্যু হুমকি দিয়ে বেড়াতো। ফারাবীর মৃত্যু-হুমকির ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু হলে ফেসবুকের প্রায় সকল মননশীল লেখক সাহিত্যিকেরা এতদিনে পরপারে সুখনিদ্রা যাপন করতেন। সত্যি বলতে কি ফারাবীর মতো লুম্পেনের দেয়া মৃত্যু ফতোয়া আমরা কেউই 'সিরিয়াসলি' নেইনি। কিন্তু আমরা না নিলেও একটি প্রতিষ্ঠান নিল। রকমারি-ডট-কম নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে অনলাইনে বই বিক্রি

---

[7] পারভেজ আলমকে হত্যার জন্য ফারাবীর ফতোয়া, https://bn-in.facebook.com/QawmiCyberArmy/posts/714518841903289

[8] Farabi Shafiur Rahman, Facebook Status, December 16, 2013; https://www.facebook.com/shafiur2012/posts/796970570329729

[9] ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয় দ্রুত ব্যবস্থা নিন, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ এপ্রিল ২০১৪

করে। ফারাবী বাংলাদেশের অনলাইন বই কেনার সাইট 'রকমারি-ডট-কমের' অফিসের ঠিকানা প্রদান করে পোস্ট দেয় মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়। বাংলাদেশে নাস্তিকতা ছড়ানোর অপরাধে সে তার তাগুদি অনুসারীদের রকমারির অফিস আক্রমণের আহ্বান জানায়। একই সাথে স্ট্যাটাসে প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারীর প্রোফাইল উল্লেখ করে তাকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়। যেখানে ফারাবীকে সাথে সাথেই আইনের হাতে সোপর্দ করার দরকার ছিল, বাংলাদেশের শুভবুদ্ধির সব মানুষকে ভীষণ রকম অবাক করে দিয়ে 'রকমারি-ডট-কমের' স্বত্বাধিকারী মাহমুদুল হাসান সোহাগ ফারাবীর হুমকির পর তার স্ট্যাটাসে এসে আমি (অভিজিৎ রায়) সহ অন্যান্য লেখকদের বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তার বই বিক্রি করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কিন্তু তারপরও ফারাবী সন্তুষ্ট না হওয়ায় রকমারি-ডট-কম তার দেওয়া লিস্ট ধরে নিমেষেই সকল বই তাদের ওয়েবসাইট থেকে প্রত্যাহার করে বিক্রি বন্ধের ঘোষণা দেয়। অনেকেই এই ঘটনার সময় রকমারি ডট কমের সংশ্লিষ্টদের ফারাবীর ভয়ে ভীত হওয়ার বদলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেও সবার অনুরোধকে উপেক্ষা করে রকমারি-ডট-কম মৌলবাদী তোষণকেই তাদের নীতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং 'নাস্তিক'দের বই (পড়ুন বিজ্ঞান, যুক্তিবাদী এবং প্রগতিশীল বই) বিক্রি চিরতরে বন্ধ করে দেয়। অথচ সকল অপকর্মের হোতা ফারাবীর বিরুদ্ধে কোনো ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তারা (রকমারির এই মেরুদণ্ডহীণতার ফলাফল যে মোটেই ভাল হয়নি পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহ ছিল তার প্রমাণ। ফারাবীর পদতলে রকমারির স্বত্বাধিকারী মাহমুদুল হাসান সোহাগের অহেতুক ক্ষমাপ্রার্থনায় নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে এই কুখ্যাত ফারাবী এবং সেই সাথে শুরু হয় তার নিত্য-নৈমিত্তিক হত্যা-হুমকি প্রদান। আমি যখন এ বইয়ের ভূমিকা লিখছি, তখন ফারাবীর আরেকটি হুমকি এবং আক্রমণের শিকার হয়ে কারাগারে দিন কাটাচ্ছেন চট্টগ্রামের মুক্তচিন্তার দুই তরুণ – মাহমুদর রহমান রায়হান (রায়হান রাহী) এবং উল্লাস দাশ[10]। তারা নিদেনপক্ষে ফারাবীকে বলতে পারতেন যে, বইয়ের যে অংশে আপত্তিজনক অংশ আছে তা তাদের দেখাতে এবং সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নিবেন তারা। কিংবা বলতে পারতেন, 'যে বই রাষ্ট্র এবং সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ নয়, সে বই কারো মুখের কথায় আমরা সাইট থেকে সরিয়ে দিতে পারি না'। কিন্তু কোনো অনুসন্ধান ছাড়াই, কোনো যুক্তিনিষ্ঠ প্ল্যান-প্রোগ্রাম এবং পলিসি ছাড়াই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে বই উঠিয়ে নেয়ার ঘোষণা দিলেন। এটা কোনো ধরণের ভাল ব্যাবসায়িক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ব্যবসা করতে হলে নিজস্ব বিশ্বাসকে সিস্টেমের বাইরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত বিপণন প্রতিষ্ঠান আমাজন-ডট-কম এর মতো একটি ভাল উদাহরণ তো ছিলই তাদের সামনে। আমাজন থেকে চাইলে যেমন ধর্মীয় বইপত্র কেনা যায়, তেমনি কেউ চাইলে রিচার্ড ডকিন্স, স্যাম হ্যারিস, ক্রিস্টোফার হিচেন্সদের মতো নাস্তিকদের বইপত্রও কিনতে পারেন বিনা বাধায়। কেউ হুমকি দিলেই আমাজন রিচার্ড ডিকিন্সের বই সরিয়ে নেয় না। রকমারির এ ধরণের একটি স্ট্যান্ড-এ অবিচল থাকা উচিৎ ছিল। আর উচিৎ ছিল ফারাবীর মতো মৃত্যু-হুমকিদাতার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের। কিন্তু তারা সেটা না করে ভাইরাসকে জিইয়ে রেখে সাইটকে 'পবিত্র পানি' দিয়ে 'পাক-গোসল' দিতে মনস্থ

---

[10] জঙ্গিবাদ প্রচারকারীর উস্কানিতে চট্টগ্রামে দুই কিশোর গ্রেপ্তার, বিডিনিউজ২৪, পূর্বোক্ত।

করলেন। কিন্তু এভাবে তো সমস্যার সমাধান হয় না। কোনো রোগ সারাতে হলে রোগের উৎসটা নির্ধারণ করা জরুরী।

পৃথিবীতে বই পুড়িয়ে, বইকে নিষিদ্ধ করে মুক্তচিন্তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা অবশ্য নতুন নয়। সেই প্রাচীন যুগ থেকেই শাসকেরা নিজেদের চিন্তার বিপরীতে যাওয়া মতবাদ কিংবা ধ্যান ধারণাকে রুদ্ধ করতে চেয়েছে। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনোদের বাইবেলবিরোধী সৌরকেন্দ্রিক মতবাদকে নিষিদ্ধ করে ক্যাথলিক চার্চ একসময় সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা থামাতে চেয়েছিল। যখন তা সম্ভব হয়নি বিপরীত ধারার বইপত্র জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তাড়িয়ে নাশ করে দিতে চেয়েছে। এ ধরণের গ্রন্থহন্তারক কাজ ব্যাবিলনীয় শাসকেরা করেছে, এথেনীয়রা করেছে, রোমানরা করেছে। খ্রিষ্টান এবং মুসলিম শাসকদের হাতে একটা সময় ধ্বংস হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ার সুবিখ্যাত প্রাচীন পাঠাগার। কথিত আছে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের বই-পত্তর ধ্বংস করতে গিয়ে খলিফা ওমর নাকি বলেছিলেন – 'বইপত্রগুলো যদি কোরআনের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তবে সেগুলো আমাদের দৃষ্টিতে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। কাজেই ওগুলোর ধ্বংস অনিবার্য; আর বই-পত্তরগুলোতে যদি কোরানের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো কথাবার্তা আদৌ থেকেও থাকে তবে সেগুলো হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কাজেই সে দিক দিয়েও ওগুলো ধ্বংস করা জায়েজ'। তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি এবং তার অনুগত সৈনিকেরা ভারতবর্ষ আক্রমণের পর জ্ঞানবিজ্ঞানের সূতিকাগার নালন্দা বিদ্যানিকেতনও একই কায়দায় ধ্বংস করেছিলেন। এমনকি গত শতকে নাৎসী জার্মানির শাসকেরা রীতিমত বই পোড়ানোর বহ্নিউৎসব পালন করেছে ঘটা করে। অবশ্য মিত্র বাহিনীও পিছিয়ে ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের বোমারু বিমানগুলো নাকি টার্গেট হিসেবে প্রায়ই খুঁজে নিতো জার্মানির লাইব্রেরিগুলোকে। রাশিয়ার স্ট্যালিনীয় জামানায় যেমন বিপরীত চিন্তাকে নাশ করার_তাগিদে অসংখ্য বই পোড়ানো হয়েছে, তেমনি আবার পঞ্চাশের অন্ধকার দশকে ম্যাকার্থিজমের বিশুদ্ধি অভিযানে আমেরিকান মননকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যও বই পুড়তে আমরা দেখেছি। বই পোড়ানো ছাড়াও বইয়ের উপর নানা ধরণের সেন্সরশিপ আরোপ এবং নিষিদ্ধকরণের বহু আলামতের সাথেই আমরা পরিচিত। ভারতবর্ষে সালমান রুশদির 'স্যাটানিক ভার্সেস', কিংবা বাংলাদেশে তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' আমরা নিষিদ্ধ হতে দেখেছি চোখের সামনেই। বছর কয়েক আগে মামলা করে হুমায়ুন আজাদের 'নারী' গ্রন্থটিকে নিষিদ্ধ করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। 'বিশ্বাসের ভাইরাস'কে নিষিদ্ধ করার প্রচেষ্টাও এই তালিকায় নতুন সংযোজন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফারাবী নামক মুখচেনা লম্পট এবং ফতোয়াবাজের মুখের কথায় রকমারি কোন কিছু আগাপাশতলা বিচার বিবেচনা না করে যে সময়টিতে বিজ্ঞানমনস্ক বইপত্র উঠিয়ে নিয়েছে, ঠিক একই সময় তাদের সাইটে দর্পভরে শোভা পাচ্ছিল গোলাম আজম, মওদুদী, দেলওয়ার হোসেন সাইদীদের বই। শুধু তাই নয়, এই একবিংশ শতাব্দীতে বসে রকমারি-ডট-কম অনলাইনে বিক্রি করে চলেছে, 'পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে'র মত অবৈজ্ঞানিক বই, কিংবা 'আদি ও আসল সোলেমানী তাবিজের কিতাব' জাতীয় গ্রন্থ[11]। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের গবেষণাপত্র, জার্নাল, আর বইয়ের

---

[11] এ ব্যাপারে ফেসবুকে ব্লগার এবং অ্যাক্টিভিস্ট ওমর ফারুক লুক্সের মার্চ মাসের ১৫ তারিখের একটি

রেফারেন্স দেয়া শত কষ্টের ফসল 'বিশ্বাসের ভাইরাস' কিংবা 'অবিশ্বাসের দর্শন'-এর মতো বইগুলো তাদের জন্য তৈরি করেছে একেবারে জীবন-মরণ সমস্যা। তারা স্টোর থেকে উঠিয়ে নিয়েছে আমার সব বই। মিথ্যা লেবেল এঁটে দিয়েছে 'আউট অব প্রিন্ট' বলে। রকমারির এই হঠকারী সিদ্ধান্তের পর আমি আমার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছিলাম[12] –

> 'আমি সামান্য লেখক। কিন্তু যা লিখি সততার সাথে লিখি। কাউকে হুমকি ধামকি দেই না। আশা করব রকমারি এবং তাদের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা বিষয়টি মাথায় রাখবেন। দয়া করে ব্যবসার সাথে ব্যক্তিগত বিশ্বাস জড়াবেন না। ফারাবী হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যু হুমকি দিয়েছে। তার হুমকি সত্য হলে আমরা কেউ আজ বেঁচে থাকতাম না। রকমারির উচিৎ লেখকের স্বাধীনতার প্রতি অবিচল থাকা। আমার বই রাষ্ট্র থেকে ব্যান করা হয়নি, আদালতে যায়নি। ফারাবীই বরং আদালতে চার্জশিটপ্রাপ্ত ফেরারী আসামী। তার কথায় আমার বইকে তালিকা থেকে সরানোর কারণটা হাস্যকর। আমরা তো কোন ধর্মীয় বই তালিকা থেকে সরাতে বলছি না। শুধু ধর্মীয় বই কেন, বহু জিহাদি বাণীসমৃদ্ধ উগ্র বইপত্র থেকে শুরু করে বড় বড় রাজাকারদের লেখা বই রকমারিতে পাওয়া যায়। সব ছেড়ে আপনাদের চোখ পড়ল এমন এক লেখকের উপর যিনি হুমকি ধামকি দেন না, কেবল যিনি বিজ্ঞান নিয়ে লেখেন। আসলে ভয়টা কার? স্মরণ করি মিখাইল বুলগাকভের উপন্যাস 'মাস্টার এণ্ড মার্গারিটার' বিখ্যাত উদ্ধৃতি – 'পাণ্ডুলিপি পোড়ে না'। মুক্তচিন্তককে আক্রমণ করা যায়, কিন্তু তার চিন্তাকে নাশ করা যায় না'।

হ্যা, আমি সত্যই মনে করি – মুক্তচিন্তককে আক্রমণ করা যায়, কিন্তু তার চিন্তাকে কোনোভাবেই বিনাশ করা যায় না। এর প্রমাণ আমরা খুব ভালভাবেই পেয়েছি রকমারি-ফারাবী ঘটনার পরবর্তী সময়গুলোতে। রকমারি যখন কাপুরুষের মতো বিশ্বাসের ভাইরাস প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছিল, তখন 'পড়ুয়া' এবং 'নক্ষত্র বুক শপ' সহ অন লাইনে বই বিক্রির একগাদা প্রতিষ্ঠান আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় 'বিশ্বাসের ভাইরাস' বইটির বিক্রি অব্যাহত রাখতে[13]।

মজার স্ট্যাটাস ছিল এরকমের –

'ধর্মান্ধ মানসিক রোগী যদি আপনাকে হত্যার হুমকি দেয়, আপনি তখন কি করবেন? হয় আপনি তার হুমকিকে পাত্তা দেবেন না, আর পাত্তা দিলে পুলিশে অভিযোগ করবেন। কিন্তু আপনি যদি ভয় পেয়ে ইঁদুরের মতো গর্তে ঢুকে যান, গর্তে ঢুকে ডিগবাজি দিয়ে নীতি আদর্শ সব বিষর্জন দিয়ে গোলাম আজমের বই বিক্রি করতে শুরু করে দেন, তাহলে আপনি অবশ্যই একটা "রকমারি"'।

[12] অভিজিৎ রায়, ফেসবুক নোট, মার্চ ১৫, ২০১৪, https://www.facebook.com/Avijit.Roy.MuktoMona/posts/678791665510440

[13] সে সময় রকমারির (rokomari.com) এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিকল্প পাওয়া গিয়েছিল পাঠকদের কাছ থেকে -

১. পড়ুয়া: www.porua.com.bd : বিশ্বাসের ভাইরাস বইটি একটি চমৎকার উপক্রমণিকা সহযোগে আপলোড করে রেখেছেন ক্রেতাদের জন্য।

তারা মুক্তচিন্তার বইপত্র বিক্রি থেকে কোনভাবেই পিছু হটবে না বলে জানায়। ফারাবী হুমকি দিয়ে বইটির বিক্রি বন্ধ করতে চেয়েছিল, অথচ ফারাবীর এই কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসের ভাইরাস বিক্রি তো বন্ধ হলোই না, বরং বইটির বিক্রি এক মাসের মধ্যে আমাদের প্রত্যাশাকে একেবারে অতিক্রম করে গেল। বহু পাঠক আগ্রহী হয়ে বইটি কিনেছেন, এবং আমাকে ম্যাসেজ করে জানিয়েছেন। অনেকে রকমারির সিদ্ধান্তে এতোটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে তারা 'রকমারি বর্জন করুন' নামে ফেসবুক ইভেন্ট খুলে এ প্রতিষ্ঠানটি বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন। আমার বইয়ের বহু পাঠক সহমর্মিতা প্রকাশ করে স্ট্যাটাস দিয়েছেন। যেমন, খ্যাতনামা ব্লগার এবং অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট নিঝুম মজুমদার তার একটি স্ট্যাটাসে লিখেছিলেন, 'আমি এই পর্যন্ত রকমারি থেকে ১৬,৫৮৫ টাকার বই কিনেছি দুইটি একাউন্ট থেকে। যদি ফারাবীর কথা অনুযায়ী অভিজিৎদা কিংবা নাস্তিকতা প্রচার করছে, এমন অভিযোগে বা এমন কারণে এমন বই রকমারি বাদ দিয়ে দেয়, তবে পাব্লিক-স্ট্যাটাস দিয়েই রকমারি বর্জন করব'। আরেকজন পাঠক সাজেদুল ওয়াহিদ নিটোল লিখেছিলেন, 'আমার অর্ডার হিস্ট্রিতে গিয়ে ক্যালকুলেটরে হিসাব করে দেখলাম – রকমারি থেকে দুই বছরে প্রায় সাড়ে নয় হাজার টাকার বই আমি কিনেছি। ঢাকায় থাকি না, তাই রকমারি আমার জন্য একটু বিশাল সুযোগ হিসেবে এসেছিল। অনেক কৃতজ্ঞতা জমা ছিলো সাইটের পরিচালকদের জন্য। সাইটের এডমিনদের এমন একটা জীবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখে খুবই মন খারাপ লাগছে। শ্রদ্ধার জায়গাগুলো ধীরে ধীরে কমে আসছে। আজাদ সাহেব ঠিকই বলে গেছেন – সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে'। কিছু পাঠক আবার আগে অর্ডার করা বই গ্রহণ না করে সরাসরি ফেরত পাঠিয়েছেন রকমারির কাছে। যেমন, বিশ্বাসের ভাইরাস বইটির পাঠক দেব প্রসাদ দেবু তার মার্চ মাসের একটি স্ট্যাটাসে লিখেছিলেন, 'খুবই নগণ্য প্রতিবাদ। অনেকটা ছোটবেলায় মা'র উপর রাগ করে ভাত না খেয়ে থাকার মতো। অভিজিৎ রায়ের বই প্রত্যাহারের জের ধরে রকমারি ডট কম থেকে আসা আজকের পার্সেলটা ফেরত পাঠালাম। বাজারির কিছু যায় আসে না হয়তো, কিন্তু সেটি আমার বিবেচ্য নয়, আমি এই ক্ষুদ্র প্রতিবাদেই তৃপ্ত।'

স্বনামধন্য লেখক এবং ব্লগারেরাও এগিয়ে এসেছিলেন বাক-স্বাধীনতা রক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে। তাদের অনেকেই নিজেদের বইগুলো রকমারি থেকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়ে স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন। চরম উদাস, যার 'লাইনে আসুন' বইটি বইমেলায় মুড়ি-মুড়কির

---

২. নক্ষত্র: www.nokkhotro.com/books : পাঠকেরা এখান থেকে 'বিশ্বাসের ভাইরাস' অর্ডার করেছেন, খুব তাড়াতাড়ি পেয়েও গেছেন বলে জানিয়েছেন।
৩. পিবিএসচেইন: www.pbschain.com
৪. বইমেলা: www.boi-mela.com [Cash-on-Deliveryর ব্যবস্থা নেই। এরা বিদেশেও বই পাঠায়। ক্রেডিট কার্ড লাগবে। সবচেয়ে ভাল হয় পেপ্যাল একাউন্ট থাকলে]
৫. এওয়ানবাজার: www.a1bazar.com [এদেরও CoD নেই, তবে বিকাশের ব্যবস্থা আছে। অর্ডার দিলে বই এনে দেয়।]
৬. বইটুয়েন্টিফোর.কম: http://www.boi24.com/
৭. কারিগর http://www.karigor.com/

মত বিক্রি হয়েছে, তিনি তার মার্চ মাসের ১৫ তারিখে দেয়া স্ট্যাটসে লিখেছিলেন – 'কোন বই রাখবে আর কোন বই সরাবে সেটা রকমারির নিজস্ব সিদ্ধান্ত। মেয়েদেরকে আজেবাজে মেসেজ দিয়ে উত্যক্তকারী সেক্স ফ্রিক যদি হয় এই দেশের হাই প্রিস্ট এবং তার ধমকে যদি রকমারির কর্ণধাররা প্যান্ট ভিজিয়ে করজোড়ে মাফ চায়, তবে সেই মাফ চাওয়া ও প্যান্ট ভিজানোর অধিকার রকমারির আছে। আমার শুধু অধিকার আছে রকমারি বর্জন করার। আমি তাই করলাম। মাত্র দুদিন আগে আপনাদের কাছ থেকে কেনা আট হাজার টাকার বই হাতে পেয়েছি। এটাই হোক আমার শেষ বই এর অর্ডার। সেইসাথে যদি রায়হান আবির, অভিজিৎ রায়দের বই রকমারি থেকে সরিয়ে ফেলা হয় তবে আমি অনুরোধ জানাবো আমার 'লাইনে আসুন' বইটিও যেন তারা নিজেদের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলে। আপনাদের প্যান্ট আপনারা ভিজান, যখন খুশী তখন ভিজান। শুধু সেই ভিজা প্যান্টের ভেতর আমাকে রাখবেন না'। 'জাগরণের পূর্বাপর' গ্রন্থের লেখক কবির য়াহমেদ তার ১৭ মার্চের দেয়া স্ট্যাটাসে বলেছিলেন, 'অনলাইন সন্ত্রাসবাদের প্রচারক ফারাবীর হুমকিতে রকমারি-ডট-কম তাদের সাইট থেকে অভিজিৎ রায়'র 'বিশ্বাসের ভাইরাস' বইটি প্রত্যাহার করে নিয়েছে এটা একটা সংবাদ হলেও আদতে রকমারি-ডট-কম যদি সত্যিকার অর্থে ব্যবসা অথবা অসাম্প্রদায়িকতা ধারণ করতো তাহলে ফারাবীর মতো লোকদের হুমকিতে কী বই প্রত্যাহার করতে পারতো? এটা স্পষ্টত তাদের সাম্প্রদায়িকতা লালনের শামিল। একই সাথে ন্যাক্কারজনকও। রকমারি সম্পর্কে আমি অনেক উচ্চ ধারণা পোষণ করে আসছিলাম দীর্ঘদিন থেকে। নিয়মিতভাবে সেখান থেকে আমি বই সংগ্রহও করেছি। ফারাবীর হুমকিতে অথবা এমন কোন কিছুর অপেক্ষার পালা শেষ হবার পর তাদের আসল চেহারা বেরিয়ে আসার পর এখন থেকে আর কোন বই রকমারি থেকে সংগ্রহ করব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং একই সাথে বইমেলা ২০১৪তে প্রকাশিত গণজাগরণ আন্দোলন এবং তার পরের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে লিখিত আমার 'জাগরণের পূর্বাপর' বইটিও রকমারি থেকে প্রত্যাহার করে নিলাম'। সুলেখক রণদীপম বসু তার স্ট্যাটাসে বলেছিলেন, 'রকমারি.কম-এর তাকে আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলন 'অবমুক্ত গদ্যরেখা' বইটা এখনো শোভা পেলে এখন নিজেকে অপমানিতই বোধ করবো। কেননা বইটা সম্পূর্ণই মুক্তমনা পাঠকদের জন্য লেখা'। এখানে বলা দরকার, চরম উদাস, কবির য়াহমদের মতো অনেকেই জীবনে প্রথমবারের মতো বই প্রকাশ করেছিলেন। প্রথম বই প্রকাশের অনুভূতি যে কতটা বড় সেটা লেখক মাত্রই জানেন। তারপরেও তারা সে অনুভূতিকে দূরে সরিয়ে রেখে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন লেখকের স্বাধীনতাকে সম্মান করে। আমি জানি না রকমারি তাদের সাইট থেকে বইগুলো তুলে নিয়েছেন কিনা, কিন্তু তারা যে আমার মতো লেখকের জন্য এই ত্যাগ স্বীকারটুকু করতে চেয়েছেন, তাতে মুগ্ধ হয়েছি আমি। দেশের মধ্যে তো বটেই দেশের বাইরের কিছু পত্রপত্রিকাতেও ব্যাপারটি ফিচার করা হয়েছিল[14]।

[14] উদাহরণ হিসেবে অনলাইনে পড়ুন, 1. Death threat stops book sale, Dhaka Tribune, March 16, 2014; 2. Bangladesh online bookstore drops author after death threats, UCA News, March 18, 2014; 3. Islamic death threats over books by Avijit Roy, The Freethinker, March 20, 2014; 4. Bangladeshi-American Writer Censored, Threatened by Radical Islamist, The Investigative Project on Terrorism, April 4, 2014 ইত্যাদি।

সামান্য লেখক আমি। আমার সামান্য লেখা কাউকে কাউকে হয়তো অনুপ্রাণিত করে, কিন্তু তার ব্যাপকতা যে এতো বেশি তা আমি কখনোই অনুধাবন করিনি। সুব্রত শুভ, তারিক আজিজ (অনিকেত), অনন্ত বিজয় দাশ, রায়হান আবীর, মারুফ রসূল, রায়হান রশীদসহ অনেকেই মুক্তমনা, সচলায়তন, মুক্তাঙ্গনব্লগে কিংবা পত্রিকায় যেভাবে লিখেছেন, তাতে আমি সত্যিই আপ্লুত[15]। ওমর ফারুক লুক্স, ফারজানা কবীর স্নিগ্ধা, আসিফ মহিউদ্দীন, বিপ্লব রহমান, মুহাম্মদ গোলাম সারওয়ার, অঞ্জন আচার্যসহ অনেকেই এ নিয়ে ফেসবুকসহ বহু জায়গায় লিখেছেন। তাদের এ ঋণ বহন কিংবা শোধ কোনটাই করার সামর্থ্য আমার নেই। কেবল মনে মনে উচ্চারণ করেছি রবিঠাকুরের অমোঘ বাণী – 'আমায় তুমি অশেষ করেছ!' বস্তুতঃ তাঁদের মতো অগণিত লেখক, পাঠক এবং শুভানুধ্যায়ীরা আছেন বলেই বহু হুমকি ধামকির পরেও 'বিশ্বাসের ভাইরাস' বইটি অস্তিত্বের অতলান্তে হারিয়ে যায়নি, বরং নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে, আরো পরিশীলিত হয়ে আলোর মুখ দেখছে। বইটির প্রচার, প্রসার এবং সাফল্যের সবটুকু কৃতিত্ব আসলে তাদেরই।

নতুন এ সংস্করণে বইটির বেশ কিছু অংশ ঢেলে সাজানো হয়েছে। বইটির অনেক অংশই আগের চেয়ে পরিবর্ধিত। বিশেষ করে রাজীব হায়দার শোভন (থাবা বাবা) হত্যার প্রেক্ষাপটে 'ধর্মের প্যারাসাইটিক ধারণাই কি দায়ী নয়?' অংশটি বিবর্ধিত করা হয়েছে নতুন কিছু তথ্যের আলোকে। ইসলামের সূচনাকালে যেসব সহিংস পন্থা ব্যবহৃত হয়েছিল, গুপ্তহত্যা ছিল তার অন্যতম। আবু আফাক, কাব ইবনে আশরাফ, আসমা বিন্তে মারওয়ান এর পাশাপাশি আবু রাফেকে হত্যার বিবরণ হাজির করা হয়েছে। আবু রাফের ঘটনাটি আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। প্রায় চোদ্দ'শ বছর আগে আবু রাফেকে হত্যার জন্য মহানবীর নির্দেশে যেভাবে পাঁচজন সাহাবীর একটি দল গুপ্তহত্যায় অংশ নিয়েছিল, একই কায়দায় মুফতি জসিমের নির্দেশে সাতজনের দল গঠন করে থাবা বাবাকে পল্লবী থানার সামনে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল ২০১৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের বাণী এবং ধর্মগুরুদের দিকনির্দেশনা কীভাবে আজও জিহাদি প্রেরণা হিসেবে কাজ করে যায় ভাইরাস-আক্রান্ত মননের মাঝে – তার সাযুজ্য আর সংশ্লিষ্টতা আরো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বইয়ে।

---

[15] এ প্রসঙ্গে পড়ুন:

১. মারুফ রসূল, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, বিডি নিউজ২৪, মতামত বিশ্লেষণ, এপ্রিল ২, ২০১৪।
২. অনিকেত, রকমারির ঝকমারি, সচলায়তন, মার্চ ১৬, ২০১৪।
৩. সুব্রত শুভ, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের এক যাত্রী, মুক্তমনা, মার্চ ১৬, ২০১৪।
৪. অনন্ত বিজয় দাশ, ফারাবীর ফাতরামি!, মুক্তমনা, মার্চ ১৭, ২০১৪।
৫. রায়হান আবীর, উল্লাস ও রাহী বৃত্তান্ত: এখনও গেল না আঁধার, বিডিনিউজ২৪, মতামত বিশ্লেষণ, এপ্রিল ১৬, ২০১৪
৬. আইরিন সুলতানা, ফারাবী'র কলকাঠি নাড়ায় কারা? এবং আমাদের 'রকমারি' প্রতিক্রিয়া, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ২১ মার্চ ২০১৪
৭. রায়হান রশীদ, ৪৫১ ডিগ্রি ফারেনহাইট, মুক্তাঙ্গন (নির্মান ব্লগ), মার্চ ১৬, ২০১৪ ইত্যাদি

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত বোখারী শরীফ থেকে এ সংক্রান্ত সঠিক হাদিসগুলো খুঁজে তথ্যসম্ভার নিখুঁত করে তুলতে সাহায্য করেছেন খ্যাতনামা গবেষক আবুল কাশেম। তাঁর পরিশ্রমলব্ধ অবদান নিঃসন্দেহে বইটিকে ঋদ্ধ করেছে। চট্টগ্রামনিবাসী মুক্তচিন্তক দুই তরুণ উল্লাস এবং রাহীর উপর শারীরিক আক্রমণ এবং গ্রেপ্তারের পর তাদের মর্মস্পর্শী ঘটনাটি বইয়ে যোগ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে, দেশের 'নতুন কালাকানুন' হিসেবে চিহ্নিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০১৩)-এর ৫৭ ধারা নিয়েও কিছু নির্মোহ বিশ্লেষণ হাজির করতে হয়েছে। আর বইমেলার সময় বইটির প্রথম সংস্করণ খুব দ্রুতগতিতে বের করার খেসারত হিসেবে বইটিতে অল্প-বিস্তর মুদ্রণ এবং বানানপ্রমাদ রয়ে গিয়েছিল। কিছু কিছু জায়গায় ছিল অহেতুক পুনরুক্তিও। আমার আটলান্টানিবাসী লেখক-বন্ধু রাজর্ষি দেবনাথ বইটি পড়ে সেগুলো বের করে দিয়ে বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে সহায়তা করেছেন। তাঁর অবদান ছাড়া এই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ কোনোভাবেই পূর্ণতা পেত না। আর আমার সকল কাজের সবচেয়ে কঠোর সমালোচক আমার জীবনসঙ্গিনী বন্যা আহমেদের প্রেরণা সবসময়ই আমাকে অবাক করে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি বলাই বাহুল্য।

বইটি প্রকাশের পেছনে আমার বর্তমান এবং পূর্ববর্তী প্রকাশকদের অবদান আলাদাভাবে না বললে নিতান্তই অন্যায় করা হবে। শত হুমকি ধামকি সত্ত্বেও তারা ভয়ে পিছু হটেননি। আমার মত 'নাফরমান' লেখকের পাশে দৃঢ় পায়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, ভবিষ্যতেও এ ধরণের 'নাফরমানি বই' প্রকাশের অঙ্গীকার করে গেছেন। যেমন, শুদ্ধস্বর প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী আহমেদুর রশীদ চৌধুরী টুটুল তার একটি স্ট্যাটাসে খুব সোজাসাপ্টাভাবেই বলেন – 'শুদ্ধস্বর মুক্তমনের, মুক্তবুদ্ধির বই প্রকাশ থেকে কখনোই পিছু হটবে না। যত হুমকিই আসুক, যত ধমকিই দিক'। আর এই 'বিশ্বাসের ভাইরাস' বইটির বর্তমান প্রকাশক জাগৃতি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ফয়সল আরেফিন দীপনও একটি পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে বলে দিয়েছেন, "সমাজে ধর্মান্ধ মানুষ থাকবেই। এর জন্য ভীত হওয়ার কিছু নেই। আমরা মুক্তচিন্তার, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী"[16]। লেখক হিসেবে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বোধ হয় এখানেই। তাঁদের মতো সাহসী প্রকাশকেরা থাকলে বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধি এবং মুক্তচিন্তার আন্দোলন শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আর সেই সাথে ক্রমশঃ প্রশস্ত হবে 'বিশ্বাসের ভাইরাস'বিহীন সমাজ নির্মাণের বন্ধুর পথ।

ড.অভিজিৎ রায় (charbak_bd@yahoo.com)
মে ১৮, ২০১৪

[16] সেই ফারাবীর হুমকিতে বই বিক্রি বন্ধ!, পরিবর্তন, ১৭ মার্চ ২০১৪

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার এ বইটি বিশ্বাস নিয়ে। সমাজে বিশ্বাসের প্রভাব নিয়ে। বিশ্বাসের প্রভাব সবসময়ই সমাজে ছিল, আছে। বিশ্বাস ব্যাপারটাকে এমনিতে শান্ত, সুন্দর, নিরীহ আর গোবেচারা গোছের বলে সাধারণভাবে ধরে নেয়া হলেও সময় এবং সুযোগ পেলে কীভাবে নখদন্ত বের করে তার রক্তলোলুপ চেহারাটা প্রকাশ করে দেয়, তা আমরা সবাই কমবেশি জানি। দেখেছি। বিশ্বাসের প্রভাবে বলীয়ান হয়ে মানুষ সেই প্রাচীন কাল থেকেই কুমারী এবং শিশু হত্যা করে দেবতাকে তুষ্ট করেছে, কখনো জীবন্ত কবর দিয়েছে, সতীদাহের নামে শত সহস্র নারীকে পুড়িয়ে মেরেছে, নাস্তিক, মুরতাদ কিংবা বিধর্মীদের হত্যা করেছে, চাপাতি দিয়ে কুপিয়েছে, ক্রুসেড করেছে, ধর্মযুদ্ধ করেছে, ডাইনি সাব্যস্ত করে নিরপরাধ মেয়েদের পুড়িয়ে মেরেছে, কখনোবা সারা পৃথিবীজুড়ে চলছে জিহাদের নামে রক্তের হোলি খেলা। বলতে দ্বিধা নেই, বিশ্বাস আমাদের জন্য উপকারের চেয়ে অপকারই করেছে বেশি।

তারপরেও প্রশ্ন আসে, আমাদের কি বিশ্বাসের আদৌ দরকার নেই? বিজ্ঞান, সমাজ, সভ্যতা, নৈতিকতা এই সব কি বিশ্বাস ছাড়া একেবারেই অচল নয়? আমরা কি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করা ছাড়াই প্রযুক্তির উন্নয়ন করতে পারব? ভবিষ্যতের গতি প্রকৃতি বুঝতে পারব? সত্য মিথ্যা, পাপ পুণ্য যাচাই করতে পারব? এই বইটিতে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবেন কৌতূহলী পাঠকেরা।

আমি ২০১১ সালে আমার সহলেখক রায়হান আবীরের সাথে মিলে একটা বই লিখেছিলাম 'অবিশ্বাসের দর্শন' নামে। বেরুনোর এক বছরের মধ্যেই বইটির সবগুলো কপি নিঃশেষিত হয়ে যায়। ২০১২ সালে বের হয় বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ। শেষ খবর যা জানি, সেই সংস্করণও নিঃশেষ। সেই বইয়ের একটি অধ্যায়ের নাম ছিল 'বিশ্বাসের ভাইরাস'। কেন আমি বিশ্বাসকে ভাইরাস মনে করি তার একটা ছোট আনুষঙ্গিক পর্যালোচনা ছিল সেখানে। বইটি বেরুনোর পর থেকেই পাঠকদের থেকে অভিমত পেয়েছিলাম – ধারণাটিকে বিস্তৃত করার। আমারও ইচ্ছে ছিল সেটা নিয়ে কাজ করার, কিন্তু হয়ে উঠেনি। এর মধ্যে গত বছর (২০১৩) ঘটা বেশ কিছু ঘটনা আমাকে এ বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল আহসান নাফিস নামের একুশ বছরের এক যুবক যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে গ্রেফতার হয়ে বিশ্বব্যাপী পত্র-পত্রিকার আলোচিত খবর হয়েছিলেন। নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ভবন বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ও এফবিআই। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমেরিকায় থাকার কারণে তার ঘটনাপ্রবাহ আমি খুব কাছ থেকে দেখি। নাফিস আমেরিকায় পড়তে এসে জিহাদ করাকে নিজের 'কর্তব্য' মনে করেছেন, আমেরিকাকে 'দার আল-হারব' হিসেবে দেখেছেন, এবং আমেরিকার মুসলিমদের বলেছেন 'তালাফি'। তিনি কীভাবে বিন লাদেনকে প্রাণপ্রিয় নেতা মনে করেছেন,

ইয়েমেনে নিহত আলকায়েদা নেতা আনোয়ার আল আওলাকির ভিডিও লেকচারগুলো তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে – এ সবকিছু আমাকে ব্যথিত এবং উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। নাফিসের মত বিশ্বাস-নির্ভর যুবকেরা যেন একেকটি টাইম-বোমা। বিশ্বাসের একেকটি বিধ্বংসী জৈবাস্ত্র যেন। তারা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তৈরি করতে পারে নাশকতা। জলজ্যান্ত ভাইরাস যেন এরা। আমি এ নিয়ে বাংলা ব্লগে একটি লেখা লিখি 'একজন নাফিস এবং বিশ্বাসের ভাইরাস' শিরোনামে। কিন্তু তখনো আমার বই লেখার চিন্তাটা মাথায় আসেনি।

সেই একই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সূচিত হয়েছিল অবিস্মরণীয় শাহবাগ আন্দোলন। কাদের মোল্লার সঠিক বিচারের দাবীতে অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট এবং ব্লগারদের গড়ে তোলা এ আন্দোলন কাঁপিয়ে দিয়েছিল সারা বাংলাকে, এবং কিছুটা সময়ের জন্য হলেও বিশ্বকে। যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে সংগঠিত শাহবাগ গণআন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন ব্লগার রাজীব হায়দার শোভন। রাজীবকে শাহবাগ আন্দোলনের একেবারে শীর্ষসময়ে তার বাড়ির অদূরে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। রাজীবের হত্যার অভিযোগে নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ ছাত্রকে যখন গ্রেপ্তার করা হল, তারা নিজ মুখেই স্বীকার করল, 'ঈমানী দায়িত্ব পালনের জন্য' তারা রাজীবকে হত্যা করেছে। নর্থ সাউথের সামগ্রিক ঘটনা এবং রাজীবের উপর আক্রমণকে 'বিশ্বাসের ভাইরাস' হিসেবে চিহ্নিত করে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি অনলাইন পত্রিকায় এবং মুক্তমনা ব্লগে –'বিশ্বাসের ভাইরাস: নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কি জঙ্গিবাদের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে?' শিরোনামে। রাজীবকে হত্যার বিবরণ পড়লে হতবাক হতে হয়, কীভাবে তাদের মস্তিষ্ক 'ব্রেন ওয়াশড' হয়েছে প্যারাসাইটিক জিহাদি ধারণা দিয়ে। নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ভবন বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনার অভিযোগে নর্থ সাউথের কামেল প্রাক্তন ছাত্র কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল আহসান কিংবা রাজীব হত্যায় জড়িত নর্থ সাউথের ছাত্রদের মুখগুলোর দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি 'বিশ্বাসের ভাইরাস' কত প্রকটভাবে মস্তিষ্ককে অধিকার করে ফেলতে পারে, যার ফলে একজনকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে খুন করতেও তাদের বাধেনি, বরং এটাকে তারা 'ঈমানী দায়িত্ব' বলে মনে করেছে।

বিশ্বাসের ভাইরাসের প্রভাবে রাজীব হত্যার মতো ভয়ঙ্কর আলামতগুলো যখন দিনের আলোর মত উদ্ভাসিত, আশা করা হচ্ছিল যে, সরকার এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবেন। খুঁজে দেখবেন বিশ্বাসের ভাইরাসের উদ্ভব এবং সংক্রমণের মূল উৎসগুলো। কিন্তু তা না করে আওয়ামী সরকার চড়াও হল প্রগতিশীল এবং মুক্তমনা ব্লগারদের ওপর। ২০১৩ সালের পয়লা এপ্রিল বাংলা ব্লগের চারজন স্বনামখ্যাত মুক্তমনা ব্লগারকে গ্রেফতার করল 'সেক্যুলার' বলে কথিত আওয়ামী সরকার। বুঝলাম হেফাজতি মওলানা আর আমার দেশ এর মত প্রোপাগান্ডা মেশিনের চাপে বিশ্বাসের ভাইরাসের ব্যাপারটা আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোতেও। কিন্তু ভাইরাসের এহেন মহামারী দেখে তো আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না। আমার অনলাইন বন্ধুদের সাথে মিলে ব্লগারদের মুক্ত করার আন্দোলনে সামিল হলাম। শুরু হল পত্র-পত্রিকা, ফেসবুক এবং ব্লগে লেখালিখি। শুরু করলাম 'Worldwide Protests for Free Expression in Bangladesh' ক্যাম্পেইন। সারা পৃথিবীর মুক্তচিন্তার সংগঠনগুলো এগিয়ে এলো আমাদের ডাকে। একটা সময় পর সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হল ব্লগারদের।

তখন থেকেই মনে হচ্ছিল, এই ইতিহাসগুলো সংকলিত করে রাখা দরকার। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই। আমরা বড় বিস্মৃতি-পরায়ণ জাতি। দু'দিনেই ভুলে বসে থাকি আমাদের অর্জনগুলো, কখনোবা বিকৃতই করে ফেলি নিজেদের অজান্তে, কিংবা মিথ্যে প্ররোচনার শিকার হয়ে।

এ নিয়ে বইয়ের কথা মাথায় আসলেও সেটা যে এ বছরের মধ্যেই ঘটবে ঘুণাক্ষরেও মাথায় ছিল না। বইমেলা শুরুর দু'মাস আগে কেউ বইয়ের কাজ শুরু করে সেটা আবার শেষও করতে পারে নাকি? কিন্তু সেই অসম্ভব কাজই সম্ভব করে সবাইকে দেখিয়ে দিলেন জাগৃতি প্রকাশনীর তরুণ প্রকাশক ফয়সল আরেফিন দীপন। তিনি যেভাবে তাগাদা দিয়ে আমার কাছ থেকে লেখা আদায় করে নিলেন, বই আকারে পাঠকদের সামনে তুলে ধরলেন, সেটাও ভাইরাসের চেয়ে কম আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। তিনি এতো কম সময়ের মধ্যে শুধু বইয়ের লেখা আদায়ই করেননি, মনোরম একটি প্রচ্ছদ করে মেলা শুরুর বহু আগেই ফেসবুকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তার এহেন অবদান এবং নিরন্তর চাপাচাপি ছাড়া বইটি আলোর মুখ দেখতো না, তা হলফ করেই বলা যায়।

আর বইটি রচনার ব্যাপারে আর কারো কথা যদি নাও বলি, অন্তত একজনের কথা বলতেই হবে; সে আমার স্ত্রী বন্যা। এতো কম সময়ের মধ্যে এভাবে পাণ্ডুলিপি লিখে দিতে হবে জানতে পেরে পুরো সংসারের সবটুকু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে নিবিষ্ট মনে লেখার জন্য সময় করে দিয়েছে সে। নিজে অফিস করেছে, বাসায় এসে রান্না করেছে, মেয়ের কলেজের ভর্তির ব্যাপারে দেখভাল করেছে, এবং সর্বোপরি বাসার সমস্ত কাজ গুছিয়ে আবার আমার পাণ্ডুলিপির ব্যাপারেও অনেক পরামর্শ দিয়েছে। বন্যা নিজেও একজন শক্তিমান লেখক, এবং সবসময়ই আমার লেখার সবচেয়ে বড় সমালোচক। তার সমালোচনা এবং পরামর্শ সবসময়ই আমাকে ঋদ্ধ করে। এই বইটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

বইটি এতো কম সময়ে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি।

জীবন দীপান্বিত হোক, সমাজ হোক বিশ্বাসের ভাইরাসমুক্ত।

ড.অভিজিৎ রায় (charbak_bd@yahoo.com)

ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

সূচি

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

- অবিশ্বাসের দর্শন (জাগৃতি; ২০১৫, ৩য় সংস্করণ)
- ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো : এক রবি-বিদেশিনীর খোঁজে (অবসর; ২০১৫)
- শূন্য থেকে মহাবিশ্ব (শুদ্ধস্বর; ২০১৫)
- আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী (অঙ্কুর; ২০০৫, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬)
- মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে (অবসর; ২০০৭, পুনর্মুদ্রণ ২০০৮)
- স্বতন্ত্র ভাবনা : মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি (চারদিক; ২০০৮)
- সমকামিতা : বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান (শুদ্ধস্বর; ২০১০, পুনর্মুদ্রণ ২০১৩)
- বিশ্বাস ও বিজ্ঞান (চারদিক; ২০১২)
- ভালবাসা কারে কয় (শুদ্ধস্বর; ২০১২)

প্র থ ম অ ধ্যা য়
একজন নাফিস এবং বিশ্বাসের ভাইরাস

কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল আহসান নাফিস নামে একটি সুদর্শন ছেলের কথা হয়তো অনেকেরই মনে আছে। গত বছরের (২০১২) অক্টোবর মাসে এই একুশ বছরের যুবক যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে গ্রেফতার হয়ে বিশ্বব্যাপী পত্র-পত্রিকার আলোচিত খবর হয়েছিলেন। নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ভবন বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ও এফবিআই। মিডিয়ায় বলা হচ্ছিল যে ২০০১ সালে ৯-১১ এর ঘটনার পর এটাই নাকি আমেরিকায় সবচেয়ে বড় 'টেরোরিস্ট প্লট'। আমাদের জন্য এটি উদ্বেগের ছিল, কারণ এই প্লটের মূল উদ্যোক্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে একজন বাংলাদেশীকে। সন্দেহভাজনের তালিকায় বাংলাদেশের নাম উঠে আসায় নতুন করে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল আমেরিকায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে।

নাফিসের এই ঘটনা অবশ্য বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে সারা বিশ্ব জুড়েই নানা ধরণের সন্ত্রাসবাদ, আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং 'সুইসাইড টেরোরিজম'এর মাধ্যমে নির্বিচারে হত্যা এবং আতংক তৈরি ধর্মীয় উগ্রপন্থী দলগুলোর জন্য খুব জনপ্রিয় একটা পদ্ধতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আল-কায়দার ১৯ জন সন্ত্রাসী চারটি যাত্রীবাহী বিমান দখল করে নেয়। তারপর বিমানগুলো কব্জা করে আমেরিকার বৃহৎ দুটি স্থাপনার ওপর ভয়াবহ হামলা

চালায় তারা। নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার এবং ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর বা পেন্টাগনে ঐ হামলা চালানো হয়। প্রায় তিন হাজার মানুষ সেই হামলায় মৃত্যুবরণ করে। আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী হামলা ছিলো এটি। এই হামলার পেছনে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণ থাকলেও এটি অনস্বীকার্য যে এর পেছনে সবচেয়ে বড় মদদ আসলে বিশ্বাস-নির্ভর ধর্মীয় উগ্রতা। এতদিন পর্যন্ত এ ধরণের হামলায় আরবিয় কিংবা পাকিস্তানীদের নাম শোনা গেলেও বাংলাদেশী অভিবাসীরা সন্দেহের বাইরেই ছিল। নাফিসের এই ঘটনা সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের হালহকিকত পাল্টে দেবে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে।

আদালতে নাফিস দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। অক্টোবরে ধরা পড়ার চার মাসের মধ্যেই (৭ই ফেব্রুয়ারি) আদালতে দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি দেন নাফিস। তিনি স্বীকারোক্তিতে বলেন, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত তিনি তছনছ করে দিতে চেয়েছিলেন। আর এ লক্ষ্যেই তিনি বিস্ফোরক ভর্তি ভ্যানের সাহায্যে নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেন। নাফিস আদালতে বলেছিলেন, শিক্ষা ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগেই তিনি ওসামা বিন লাদেনের অনুসারী হন এবং সন্ত্রাসী হামলার সিদ্ধান্ত নেন। যুক্তরাষ্ট্রের আদালত আগস্ট মাসে নাফিসকে ৩০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

নাফিসের ঘটনাটা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। হয়তো আমি আমেরিকায় বাস করি বলেই। কিংবা এই প্রথম আন্তর্জাতিক মিডিয়া বাংলাদেশী এক তরুণকে সন্ত্রাসবাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া খবরে সয়লাব হতে দেখেছিলাম বলেই হয়তো ব্যাপারটা এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল আমায়। আসলে সত্য বলতে কি – একটা প্রশ্ন বরাবরই আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে। কেন এই সব তরুণ যুবকরা কেন সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিচ্ছে, কখনোবা হয়ে উঠছে আত্মঘাতী? ঘটনা তো একটা দুটো নয়, সারা বিশ্ব জুড়েই ঘটে চলেছে শত শত।

পাঠকদের মনে আছে বোধ হয়, আমেরিকায় ২০০১ সালে ৯-১১ এর তাণ্ডবলীলা শেষ হতে না হতেই ২০০৫ সালে লন্ডনের পাতাল রেলে ঘটেছিল ৭/৭ এর ঘটনা। নাফিসের তরুণ বয়স দেখে অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছেন। ভেবেছেন, এতো ছোট ছেলের পক্ষে কি এতো বড় একটা অপরাধ করা সম্ভব? হ্যাঁ – বয়স একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু আমরা ভুলে যাই, লন্ডনের পাতাল রেলে বিস্ফোরণের সাথে জড়িত আত্মঘাতী চার তরুণের সবার বয়সই ছিল ত্রিশের কম। সর্বকনিষ্ঠ হাসিব হুসাইন ছিলেন মাত্র ১৮ বছরের তরুণ। আর শুধু আমেরিকা বা লন্ডনই বা বলি কেন, বাংলাদেশেই কি আমরা খালেদা-নিজামী জামানায় বাংলা ভাইয়ের তাণ্ডব দেখিনি? দেখিনি ইসলামের নামে দেশের প্রতিটি জেলায় বোমাবাজি, কিংবা রমনা বটমূল কিংবা সিনেমা হলের মতো

'বেশরিয়তী' জায়গাগুলোর উপর আগ্রাসন? দেখিনি চট্টগ্রাম আদালতে আত্মঘাতী বোমার তাণ্ডবে জগন্নাথ পাঁড়ের মৃত্যু? দেখিনি পত্রিকার পাতায় ঘাতকাহত হুমায়ুন আজাদের রক্তাক্ত ছবি? এগুলোর ভিত্তি কী? ২০০৫ সালের পর শুধু মুম্বাইয়েই সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটেছে অন্তত: দশটি, যেগুলোর সাথে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে বলে মনে করা হয়। এর আগে আমরা রাম-জন্মভূমিকে ইস্যু করে উগ্র হিন্দুত্ব-বাদীদের সন্ত্রাস, বাবরি মসজিদ ধ্বংস কিংবা গুজরাটে দাঙ্গাও দেখেছি আমরা। এগুলোরই বা কারণ কী? এ ধরণের ঘটনা ঘটলেই খুব জোরে সোরে একটি কারণকে সামনে নিয়ে আসা হয় – 'বিদ্যমান সামাজিক অনাচার'। ২০০১ সালে ১১ই সেপ্টেম্বরের রক্তাক্ত ঘটনার পর পরই বাম ভাবাদর্শে বিশ্বাসী প্রখ্যাত আমেরিকান রাজনৈতিক বিশ্লেষক নোম চমস্কি বলেছিলেন, 'আমেরিকা নিজেই এক সন্ত্রাসী রাষ্ট্র, যার কর্মকাণ্ডই নাইন-ইলেভেনকে নিজের উপর টেনে এনেছে'[17]। তবে সব বিশ্লেষকই যে চমস্কির ঢালাও মন্তব্যের সাথে একমত হয়েছেন তা নয়। যেমন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রুস লিঙ্কন তার 'Holy Terrors, Thinking About Religion After September 11' গ্রন্থে পরিষ্কার করেই বলেছেন[18] –

'ধর্মের কারণেই আতা এবং তাদের অন্যান্য সহযোগীরা মনে করেছে এ ধরণের আক্রমণ শুধু নৈতিক নয়, সেই সাথে পবিত্র দায়িত্ব।'

আতা নিজেও তার সুটকেসে কোরআন বহন করছিলো। ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত শেষ নির্দেশাবলীও সেই সাক্ষ্যই দেয়, যে তারা পবিত্র আল্লাহ এবং ইসলামের প্রেরণাতেই এই জিহাদে অংশ নিয়েছিলো। সেই নির্দেশাবলীতে আতা খুব গুরুত্ব দিয়েই বলেছিলো – কীভাবে আল্লাহর নামে যাত্রা শুরু করতে হবে, কীভাবে অস্ত্র তৈরি রাখতে হবে, কীভাবে নিজের দেহকে কোরআনের আয়াত দিয়ে আশীর্বাদ-ধন্য করে নিতে হবে, কীভাবে ঘটনা ঘটানোর সময় সুরা পাঠ করে যেতে হবে ইত্যাদি[19]।

'পবিত্র' ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রভাব সাধারণ মানুষদের কাছে ব্যাপক, এমনকি এই আধুনিক সমাজেও। সেজন্যই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোর অমানবিক আয়াত কিংবা শ্লোকগুলো সন্ত্রাস এবং সহিংসতাকে উস্কে দিতে পারে। সহিংসতার সাথে যে ধর্মের বাণীর অনেক সময়ই সরাসরি সম্পৃক্ততা থাকে তার ব্যাখ্যা জ্যাক নেলসন প্যালমেয়ার দিয়েছেন তার 'ইজ রিলিজিয়ন কিলিং আস?' গ্রন্থে[20]। তিনি বলেন –

---

[17] 9-11, Noam Chomsky , Open Media/Seven Stories Press, 1 edition, October 2001

[18] Bruce Lincoln, Holy Terrors, : Thinking About Religion After September 11, University Of Chicago Press; 2 edition , 2006

[19] Last words of a terrorist, Guardian UK, http://www.guardian.co.uk/world/2001/sep/30/terrorism.september113

[20] Is Religion Killing Us?: Violence in the Bible and the Quran, Jack Nelson-

> 'সহিংসতা ব্যাপারটা ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য কারণ, পবিত্র বাণীগুলোতে এর অনুমোদন পাওয়া যায় এবং সহিংস সমাজগুলোতে এগুলোর ব্যবহার যৌক্তিক বলে মনে করা হয়।'

একই ধরণের কথা বলেছেন মুক্তচিন্তক স্যাম হ্যারিস তার নিউইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলার 'End of Faith' গ্রন্থে[21]। তিনি তার বইয়ে দেখিয়েছেন, অতিমাত্রায় মধ্যযুগীয় বিশ্বাস নির্ভরতার কারণেই সন্ত্রাস আর জিহাদ এখনো করাল গ্রাসের মত থাবা বসিয়ে আছে আমাদের সমাজে।

বিশ্বাস নির্ভর সন্ত্রাসবাদ এত ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে কোন নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক কিংবা জৈববৈজ্ঞানিক কারণ আছে কিনা তা খুঁজে দেখা আসলেই আমি জরুরী মনে করি। আমি দুবছর আগে 'অবিশ্বাসের দর্শন' নামে একটা বই লিখেছিলাম সহলেখক রায়হান আবীরের সাথে মিলে[22]। বইটির 'বিশ্বাসের ভাইরাস' অধ্যায়ে সামাজিক জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি আলোচনা করেছিলাম। আলোচনাটি এখানেও প্রাসঙ্গিক মনে করছি।

বিশ্বাসের প্রভাব

এটা অস্বীকার করার জো নেই – 'বিশ্বাসের' একটা প্রভাব সবসময়ই সমাজে বিদ্যমান ছিলো। না হলে এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও প্রাচীন ধর্মগুলো স্রেফ মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে এভাবে টিকে থাকে কিভাবে? এখানেই হয়ত সামাজিক বিবর্তনবাদের তত্ত্বগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এটা মনে করা ভুল হবে না যে, 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা মানব জাতির বেঁচে থাকার পেছনে হয়তো কোন বাড়তি উপাদান যোগ করেছিল একটা সময়। মানুষ আদিকাল থেকে বহু সংঘাত, মারামারি এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আজ এই পর্যায়ে এসে পৌছেছে। একটা সময় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করাটা ছিল মানব জাতির টিকে থাকার ক্ষেত্রে অনেক বড় নিয়ামক। যে গোত্রে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে পারা গিয়েছিল যে যোদ্ধারা সাহসের সাথে যুদ্ধ করে মারা গেলে পরলোকে গিয়ে পাবে অফুরন্ত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, হুর পরী উদ্ভিন্নযৌবনা চিরকুমারী অপ্সরা, (আর বেঁচে থাকলে তো আছেই সাহসী যোদ্ধার বিশাল সম্মান আর পুরস্কার) – তারা হয়ত অনেক সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছে এবং নিজেদের এই 'যুদ্ধংদেহী জিন' (আক্ষরিক অর্থে নয়, 'মেটাফর' হিসেবে বলা হচ্ছে) পরবর্তী প্রজন্মে বিস্তৃত করতে সহায়তা করেছে।

Pallmeyer, Trinity Press International, 2003

[21] The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, Sam Harris, W. W. Norton, 2005

[22] অভিজিৎ রায় এবং রায়হান আবীর, অবিশ্বাসের দর্শন, জাগৃতি, ২০১৫

আমার পরিচালিত মুক্তমনা সাইটে রিচার্ড ডকিন্সের একটি চমৎকার প্রবন্ধ আছে 'ধর্মের উপযোগিতা' নামে। প্রবন্ধটিতে অধ্যাপক ডকিন্স একজন বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন[23]।

অধ্যাপক ডকিন্সের লেখাটি থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা যাক। মানব সভ্যতাকে অনেকে শিশুদের মানসজগতের সাথে তুলনা করেন। শিশুদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই একটা সময় পর্যন্ত অভিভাবকদের সমস্ত কথা নির্দ্বিধায় মেনে চলতে হয় – এ আমরা জানি। ধরা যাক একটা শিশু চুলায় হাত দিতে গেল, ওমনি তার মা বলে উঠল – চুলায় হাত দেয় না – ওটা গরম! শিশুটা সেটা শুনে আর হাত দিল না, বরং সাথে সাথে হাত সরিয়ে নিলো। মার কথা শুনতে হবে – এই বিশ্বাস পরম্পরায় আমরা বহন করি – নইলে যে আমরা টিকে থাকতে পারবো না, পারতাম না। এখন কথা হচ্ছে – সেই ভাল মা-ই যখন অসংখ্য ভাল উপদেশের পাশাপাশি আবার কিছু মন্দ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপদেশও দেয় – 'শনিবার ছাগল বলি না দিলে অমঙ্গল হবে', কিংবা 'রসগোল্লা খেয়ে অংক পরীক্ষা দিতে যেও না' গেলে 'গোল্লা পাবে' জাতীয় – তখন শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না সেই মন্দ বিশ্বাসকে অন্য দশটা বিশ্বাস কিংবা ভাল উপদেশ থেকে আলাদা করার। সেই মন্দ-বিশ্বাসও বংশপরম্পরায় সে বহন করতে থাকে অবলীলায়। সব বিশ্বাস খারাপ নয়, কিন্তু অসংখ্য মন্দ বিশ্বাস হয়ত অনেক সময় জন্ম দেয় 'বিশ্বাসের ভাইরাসের'। এগুলো একটা সময় প্রগতিকে থামাতে চায়, সভ্যতাকে ধ্বংস করে। যেমন, ডাইনি পোড়ানো, সতীদাহ, বিধর্মী এবং কাফেরদের প্রতি ঘৃণা, মুরতাদদের হত্যা এগুলোর কথা বলা যায়।

বিশ্বাসের ভাইরাস

'বিশ্বাসের ভাইরাস' ব্যাপারটা এই সুযোগে আর একটু পরিষ্কার করে নেয়া যাক। একটা মজার উদাহরণ দেই ড্যানিয়েল ডেনেটের সাম্প্রতিক 'ব্রেকিং দ্য স্পেল' বইটি থেকে[24]। আপনি নিশ্চয়ই ঘাসের ঝোপে কিংবা পাথরের উপরে কোন কোন পিপড়াকে দেখেছেন – সারাদিন ধরে ঘাসের নীচ থেকে ঘাসের গা বেয়ে কিংবা পাথরের গা বেয়ে উপরে উঠে যায়, তারপর আবার ঝুপ করে পড়ে যায় নিচে, তারপর আবারো গা বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে – এই বেআক্কেলে কলুর বলদের মত পণ্ডশ্রম করে পিপড়াটি কী এমন বাড়তি উপযোগিতা পাচ্ছে, যে এই অভ্যাসটা টিকে আছে? কোন বাড়তি উপযোগিতা না পেলে সারাদিন ধরে সে এই অর্থহীন কাজ করে

[23] Richard Dawkins, What Use is Religion?, Free Inquiry magazine, Volume 24, Number 5. বাংলা - ধর্মের উপযোগিতা, মুক্তমনা

[24] Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Daniel C. Dennett, Viking Adult, 2006

সময় এবং শক্তি ব্যয় করার তো কোন মানে হয় না। আসলে সত্যি বলতে কি – এই কাজের মাধ্যমে পিপড়াটি বাড়তি কোন উপযোগিতা তো পাচ্ছেই না, বরং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উলটো। গবেষণায় দেখা গেছে পিপড়ার মগজে থাকা *ল্যাংসেট ফ্লুক* নামে এক ধরণের প্যারাসাইট এর জন্য দায়ী। এই প্যারাসাইট বংশবৃদ্ধি করতে পারে শুধুমাত্র তখনই যখন কোন গরু বা ছাগল একে ঘাসের সাথে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। ফলে প্যারাসাইট টা নিরাপদে সেই গরুর পেটে গিয়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। পুরো ব্যাপারটাই এখন জলের মত পরিষ্কার – যাতে পিপড়াটা কোনভাবে গরুর পেটে ঢুকতে পারে সেই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ঘাস বেয়ে তার উঠা নামা। আসলে ঘাস বেয়ে উঠা নামা পিঁপড়ের জন্য কোন উপকার করছে না বরং ল্যাংসেট ফ্লুক কাজ করছে এক ধরণের ভাইরাস হিসবে – যার ফলে পিঁপড়ে বুঝে বা না বুঝে তার দ্বারা অজান্তেই চালিত হচ্ছে।

চিত্র : ল্যাংসেট ফ্লুক নামের প্যারাসাইটের কারণে পিঁপড়ের মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন পিঁপড়ে কেবল চোখ বন্ধ করে পাথরের গা বেয়ে উঠা নামা করে। ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোও কি মানুষের জন্য একেকটি প্যারাসাইট?

এ ধরণের আরো কিছু উদাহরণ জীববিজ্ঞান থেকে হাজির করা যায়। *নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম* (বৈজ্ঞানিক নাম Spinochordodes tellinii) নামে এক ফিতাকৃমি সদৃশ প্যারাসাইট আছে যা ঘাস ফড়িং-এর মস্তিষ্ককে সংক্রমিত করে ফেললে ঘাস ফড়িং পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। এর ফলে নেমাটোমর্ফ হেয়ার-ওয়ার্মের প্রজননে সুবিধা হয়। অর্থাৎ নিজের প্রজননগত সুবিধা পেতে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম বেচারা ঘাস ফড়িংকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে[25]। এ ছাড়া জলাতঙ্ক রোগের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। পাগলা কুকুর কামড়ালে আর উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু মস্তিষ্ক অধিকার করে ফেলে। ফলে আক্রান্ত মস্তিষ্কের আচরণও পাগলা কুকুরের মতোই হয়ে উঠে। আক্রান্ত ব্যক্তি অপরকেও কামড়াতে যায়। অর্থাৎ, ভাইরাসের সংক্রমণে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

আমাদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা প্রথাগত বিশ্বাসের 'ভাইরাসগুলোও' কি আমাদের সময় সময় এভাবে আমাদের অজান্তেই বিপথে চালিত করে না কি? আমরা আমাদের বিশ্বাস রক্ষার জন্য প্রাণ দেই, বিধর্মীদের হত্যা করি, টুইন টাওয়ারের উপর হামলে পড়ি, সতী নারীদের পুড়িয়ে আত্মতৃপ্তি পাই, বেগানা মেয়েদের পাথর মারি...। মনোবিজ্ঞানী ডেরেল রে তার 'The God Virus: How religion infects our lives and culture' বইয়ে বলেন, জলাতঙ্কের জীবাণু দেহের ভিতরে ঢুকলে যেমন মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিকল হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোও মানুষের চিন্তা চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তৈরি হয় ভাইরাস আক্রান্ত মননের।

নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম যেমনিভাবে ঘাস ফড়িংকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে, ঠিক তেমনি আমরা মনে করি ধর্মের বিভিন্ন বাণী এবং জিহাদি শিক্ষা মানব সমাজে অনেকসময়ই ভাইরাস কিংবা প্যারাসাইটের মত সংক্রমণ ঘটিয়ে আত্মঘাতী করে তোলে। ফলে আক্রান্ত সন্ত্রাসী মনন বিমান নিয়ে আছড়ে পড়ে টুইন টাওয়ারের উপর। নাইন-ইলেভেনের বিমান হামলায় উনিশ জন ভাইরাস আক্রান্ত মনন 'ঈশ্বরের কাজ করছি' এই প্যারাসাইটিক ধারণা মাথায় নিয়ে হত্যা করেছিলো প্রায় তিন হাজার জন সাধারণ মানুষকে। ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর অধ্যাপক ব্রুস লিংকন, তার বই 'হলি টেররস: থিংকিং এবাউট রিলিজিয়ন আফটার সেপ্টেম্বর ইলেভেন' বইয়ে বিষয়টির উপর আলোকপাত করে বলেন, 'ধর্মই, মুহাম্মদ আতা সহ আঠারজনকে প্ররোচিত করেছিল এই বলে যে, সংগঠিত বিশাল হত্যাযজ্ঞ শুধুমাত্র তাদের কর্তব্য নয়, বরং স্বর্গ থেকে আগত পবিত্র দায়িত্ব'[26]। হিন্দু মৌলবাবাদীরাও একসময় ভারতে রাম-জন্মভূমি

---

[25] Shaoni Bhattacharya, Parasites brainwash grasshoppers into death dive, New Scientists, August 2005

[26] Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11, University Of Chicago Press; 1 edition, 2003

অতিকথনের ভাইরাস বুকে লালন করে ধ্বংস করেছে শতাব্দী প্রাচীন বাবরি মসজিদ। বিগত শতকের আশির দশকে মাইকেল ব্রে নামের কুখ্যাত এক খ্রিস্টান সন্ত্রাসী ওয়াশিংটন ডিসি, মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়ার গর্ভপাত ক্লিনিকগুলোতে উপর বোমা হামলার পর বাইবেলের বাণীকে রক্ষাকবচ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন আদালতে। এ ধরণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইতিহাস থেকে হাজির করা যাবে, ভাইরাস আক্রান্ত মনন কীভাবে কারণ হয়েছিল সভ্যতা ধ্বংসের।

চিত্র : বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম নামে এক প্যারাসাইটের সংক্রমণে ঘাস ফড়িং পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে (বামে), ঠিক একইভাবে বিশ্বাসের ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত আল-কায়দার ১৯ জন সন্ত্রাসী যাত্রীবাহী বিমান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো টুইন টাওয়ারের উপর ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর (ডানে)। বিশ্বাসের ভাইরাসের বাস্তব উদাহরণ।

১১ সেপ্টেম্বরের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পরে অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স ফ্রি ইনকোয়েরি পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'Design for a Faith-Based Missile' নামে। তিনি সেই প্রবন্ধে আত্মঘাতী সন্ত্রাসীদের বিশ্বাস নির্ভর (ভাইরাসাক্রান্ত) মিসাইল হিসেবে অভিহিত করে লেখেন[27]

> 'কোন সন্দেহ নেই যে, পরকাল-আবিষ্ট আত্মঘাতী মস্তিষ্ক আসলেই একটি বিপজ্জনক অস্ত্র এবং সমূহ বিপদের কারণ। এটি তীক্ষ্ণ মিসাইলের সাথে তুলনীয়, এবং বহু ক্ষেত্রে এর পথনির্দেশ-ব্যবস্থা সেই সব পরিশীলিত অত্যাধুনিক এবং ব্যয়বহুল ইলেকট্রনিক ব্রেনের চেয়েও প্রকৃষ্ট। তারপরেও নৈরাশ্যবাদী সরকার, সংগঠন, এবং মোল্লাতন্ত্রের জন্য খুবই খুবই সস্তা।'

---

[27] Richard Dawkins, Design for a Faith-Based Missile, Volume 22, Number 1.

সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে আবারো ফিরে তাকাই। অনেকেই বলেন, ইসলামী সন্ত্রাসবাদ লালন পালনে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার বিশাল অবদান আছে। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য। যেমন, বুশের রাজত্বকালে আমেরিকার ইরাক আক্রমণের ব্যাপারটা কেউ ভুলে যায়নি। জনবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া কিংবা সাদ্দামের সাথে আল-কায়েদার কোন সম্পর্ক না খুঁজে পাওয়া কিংবা জৈব-যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া সত্ত্বেও নির্লজ্জভাবে ইরাকের উপর যে আগ্রাসন চালিয়েছে তা শুধু যে আমেরিকার চিরচেনা সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটাকেই স্পষ্ট করে তুলেছিল তা নয়, ইসলামী বিশ্ব এই আগ্রাসনকে যে কোন কারণেই হোক 'ইসলামের উপর আঘাত' হিসেবে নিয়েছে। সেজন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সে সমস্ত দেশেই ইসলামী আত্মঘাতী বোমা হামলার মাত্রাটা বেশী ছিল যে দেশের সরকার ইরাক যুদ্ধে বুশ-ব্লেয়ারকে নগ্ন-ভাবে সমর্থন করেছে সেসময়।

প্যালেস্টিনীয়দের বঞ্চিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলকে নগ্নভাবে সমর্থন করেছে তাও মুসলিম সমাজকে সংঘাতের পথে ঠেলে দিয়েছে। এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আর প্রতিহিংসার ব্যাপারগুলো ভুলে গেলে কোন আলোচনাই কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু তারপরেও কেবল আমেরিকার দিকে অঙ্গুলি তুলে ধর্মগ্রন্থগুলোকে কখনোই 'ধোয়া তুলসীপাতা' বানানো যায় না। ধর্মগ্রন্থের যে অংশগুলোতে জিহাদের কথা আছে, উদ্ভিন্নযৌবনা হুরীদের কথা আছে, 'মুক্তা সদৃশ' গেলমানদের কথা আছে সে সমস্ত 'পবিত্র বাণী'গুলো ছোটবেলা থেকে মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে কিংবা বছরের পর বছর সৌদি পেট্রোডলারে গড়ে ওঠা মাদ্রাসা নামক আগাছার চাষ করে বিভিন্ন দেশে তরুণ সমাজের কিছু অংশের মধ্যে এক ধরণের 'বিশ্বাসের ভাইরাস' তৈরি করা হয়েছে; ফলে এই ভাইরাস আক্রান্ত জিহাদিরা স্বর্গের ৭২ টা হুর-পরীর আশায় নিজের বুকে বোমা বেঁধে আত্মাহুতি দিতেও আজ দ্বিধা-বোধ করে না। ল্যাংসেট ফ্লুক প্যারাসাইটের মত তাদের মনও কেবল একটি বিশ্বাস দিয়ে চালিত – অমুসলিম কাফেরদের হত্যা করে সারা পৃথিবীতে ইসলাম কায়েম করতে হবে, আর পরকালে পেতে হবে আল্লাহর কাছ থেকে উদ্ভিন্নযৌবনা আয়তলোচনা হুর-পরীর লোভনীয় পুরস্কার। তারা ওই ভাইরাস আক্রান্ত পিঁপড়ে কিংবা ঘাস ফড়িং-এর মত হামলে পড়ছে কখনো টুইন টাওয়ারে, কখনো রমনার বটমূলে, ভারতের তাজ হোটেলে, লন্ডনের পাতাল রেলস্টেশনে, কিংবা নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ভবনে।

চিত্র : হিন্দু মৌলবাবাদীরা একসময় ভারতে রাম-জন্মভূমি মিথ ভাইরাস বুকে লালন করে ধ্বংস করেছে শতাব্দী প্রাচীন বাবরি মসজিদ।

কীভাবে বিশ্বাসের ক্ষতিকর ভাইরাসগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত হয়, তা বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে আধুনিক মিম তত্ত্বকে। মিম নামের পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স ১৯৭৬ সালে, তার বিখ্যাত বই 'দ্য সেলফিশ জিন'-এ[28]। আমরা তো জিন-এর কথা ইদানীং অহরহ শুনি। জিন হচ্ছে মিউটেশন, পুনর্বিন্যাস ও শরীরবৃত্তিক কাজের জন্য আমাদের ক্রোমোজোমের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য একক। সহজ কথায়, জিন জিনিসটা হচ্ছে শারীরবৃত্তীয় তথ্যের অখণ্ড একক যা বংশগতিয় তথ্যকে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে দেয়। জিন যেমন আমাদের শরীরবৃত্তীয় তথ্য বংশ পরম্পরায় বহন করে, ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক তথ্য বংশপরম্পরায় বহন করে নিয়ে যায় 'মিম'। কাজেই 'মিম' হচ্ছে আমাদের 'সাংস্কৃতিক তথ্যের একক', যা ক্রমিক অনুকরণ বা প্রতিলিপির মধ্যমে একজনের মন থেকে মনান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক যেভাবে শারীরবৃত্তীয় তথ্যের একক জিন ছড়িয়ে পড়ে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে। যে ব্যক্তি মিমটি বহন করে তাদের মিমটির 'হোস্ট' বা বাহক বলা যায়। 'মিমপ্লেক্স' হল একসাথে বাহকের মনে অবস্থানকারী

---

[28] The Selfish Gene, Richard Dawkins, Oxford University Press, 1976

পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একদল 'মিম'। কোন বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতি-নীতি, কোন দেশীয় সাংস্কৃতিক বা কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ – এগুলো সবই মিমপ্লেক্সের উদাহরণ। বিখ্যাত গবেষক এবং লেখক সুসান ব্ল্যাকমোর তার 'মিম মেশিন' বইয়ে মিমপ্লেক্সের অনেক আকর্ষণীয় উদাহরণ হাজির করেছেন। সুসান ব্ল্যাকমোর মনে করেন জিন এবং মিমের সুগ্রন্থিত সংশ্লেষই মানুষের আচার ব্যবহার, পরার্থপরায়ণতা, যুদ্ধংদেহী মনোভাব, রীতি-নীতি কিংবা কুসংস্কারের অস্তিত্বকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।
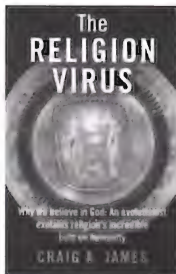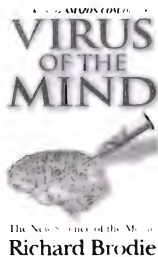
চিত্র : সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু গবেষক, বিজ্ঞানী এবং লেখক উগ্র ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে 'ভাইরাস' এবং 'মেমপ্লেক্স' এর সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন।

কোন সাংস্কৃতিক উপাদান কিংবা কোন বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস কিভাবে মিমের মাধ্যমে জনপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে? মানুষের মস্তিষ্ক এক্ষেত্রে আসলে কাজ করে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার যেভাবে কাজ করে অনেকটা সেরকমভাবে। আর মিমগুলো হচ্ছে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের মধ্যে ইনস্টল করা সফটওয়্যার যেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সফটওয়্যারগুলো ভালমতো চলতে থাকে ততক্ষণ তা নিয়ে আমাদের কোন চিন্তা থাকে

না। কিন্তু কখনো কখনো কোন কোন সফটওয়্যার ভাল মানুষের (নাকি 'ভাল মিমের' বলা উচিৎ) ছদ্মবেশ নিয়ে 'ট্রোজান হর্স' হয়ে ঢুকে পড়ে। এরাই আসলে বিশ্বাসের ক্ষতিকর ভাইরাসগুলো। এরা সূচ হয়ে ঢুকে, আর শেষ পর্যন্ত যেন ফাল হয়ে বেরোয়। যতক্ষণে এই ভাইরাসগুলোকে সনাক্ত করে নির্মূল করার ব্যবস্থা নেয়া হয় – ততক্ষণে আমাদের হার্ডওয়্যারের দফা রফা সারা। এই বিশ্বাসের ভাইরাসের বলি হয়ে প্রাণ হারায় শত সহস্র মানুষ – কখনো নাইন-ইলেভেনে, কখনো বা বাবরি মসজিদ ধ্বংসে কখনো বা তাজ হোটেলে গোলাগুলিতে। বছর কয়েক আগে Viruses of the Mind শীর্ষক একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স দেখিয়েছিলেন কীভাবে কম্পিউটার ভাইরাসগুলোর মতই আপাত মধুর ধর্মীয় শিক্ষাগুলো সমাজের জন্য ট্রোজান হর্স কিংবা ওয়ার্ম ভাইরাস হিসেবে কাজ করে তিলে তিলে এর কাঠামোকে ধ্বংস করে ফেলতে চায়। আরও বিস্তৃতভাবে জানবার জন্য পাঠকেরা পড়তে পারেন সাম্প্রতিক সময়ে রিচার্ড ব্রডির লেখা 'ভাইরাস অব মাইন্ড' কিংবা ডেরেক রে'র 'দ্য গড ভাইরাস' কিংবা ক্রেগ জেমসের 'দ্য রিলিজিয়ন ভাইরাস' শিরোনামের বইগুলো[29]। এ বইগুলো থেকে বোঝা যায় ভাইরাস আক্রান্ত মস্তিষ্ক কি শান্তভাবে রবোটের মত ধর্মের আচার আচরণগুলো নির্দ্বিধায় পালন করে যায় দিনের পর দিন, আর কখনো সখনো বিধর্মী নিধনে উন্মত্ত হয়ে উঠে; একসময় দেখা দেয় আত্মঘাতী হামলা, জিহাদ কিংবা ক্রুসেডের মহামারী।

ভাইরাস আক্রান্ত মনন

কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল আহসান নাফিস নিঃসন্দেহে ভাইরাস আক্রান্ত মননের বাস্তব উদাহরণ। ব্রুকলিন ফেডারেল কোর্টে নাফিসের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় বলা হয়েছে[30], চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে শিক্ষা ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে আসেন নাফিস। আল কায়েদা নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই যুবক সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য বিশ্বস্ত লোক খোঁজা শুরু করার পর গত জুলাইয়ে এফবিআইয়ের নজরে পড়েন তিনি। মামলার

---

[29] I) Richard Brodie, Virus of the Mind: The New Science of the Meme, Hay House, 2009;
II) Darrel W. Ray, The God Virus: How religion infects our lives and culture, IPC Press; First edition, December 5, 2009;
III) Craig A. James, The Religion Virus: Why We Believe in God: An Evolutionist Explains Religion's Incredible Hold on Humanity, John Hunt Publishing, 2010

[30] United States District Court, Eastern District of New York, complaint United States of America vs. Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis, October 17, 2012, http://cbsnewyork.files.wordpress.com/2012/10/nafis-complaint.pdf (accessed October 17, 2012)

এজাহারে বলা হয়েছে, নাফিস এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি তছনছ হয়ে যায়। প্রথমে তিনি চেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করতে। এরপর তিনি রিজার্ভ ব্যাংক, নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ ও বাল্টিমোরে সামরিক স্থাপনায় বোমা হামলার পরিকল্পনা করেন।

তার সন্দেহজনক কাজকর্ম এবং গতিবিধির কারণে তিনি এফবিআইয়ের নজরে পড়েন। ২০১২ সালের জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নাফিস, তার এক সহযোগী ও এফবিআইয়ের ওই সোর্সের (CHS) মধ্যে ফেসবুকে যোগাযোগ হয়। ফেসবুকের ওই কথোপকথন এফবিআইয়ের সোর্স রেকর্ড করেন। অভিযোগে দেখা যায়, ৫ জুলাই নাফিস ঐ সোর্সকে বলে যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে জিহাদ সংঘটিত করতে এসেছেন এবং তার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে তার একজন সহযোগী এবং বাংলাদেশে একজন আদর্শিক 'ভাই' রয়েছে।

পরের দিনও তাদের মধ্যে ইসলামের কয়েকটি নীতি নিয়ে আলোচনা হয় এবং বলা হয়, কোনো ব্যক্তির অন্য কোনো দেশে গিয়ে জিহাদি কার্যক্রম চালানো বৈধ নয়। তখন নাফিস বলেন, তিনি বাংলাদেশের একজনের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছেন এবং তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে, ওই সব নীতি অনুসরণের বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ১১ জুলাই নাফিস জানান, যুক্তরাষ্ট্রের একজন 'High Ranking Official'কে সে হত্যা করতে চান।

ফেসবুকের কথোপকথনে নাফিস পরিষ্কার ইঙ্গিত দেন, যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পরিকল্পনা নিয়ে এগোনোর ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোনো বাধা নেই বলেই তিনি মনে করেন। এতে বলা হয়, নাফিসের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে সহযোগী সেজে এফবিআই কর্মকর্তারাই তাকে ২০ ব্যাগ 'নকল' বিস্ফোরক সরবরাহ করেন, যাতে তাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা যায়। ম্যানহাটনে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের সামনে 'বিস্ফোরক ভর্তি' ভ্যান দাঁড় করিয়ে নাফিস পাশের মিলেনিয়াম হিল্টন হোটেলে যান। সেখান থেকে তিনি ভ্যানে রেখে আসা সেলফোনে বার বার কল দিতে থাকেন এক হাজার পাউন্ড (৪৫৪ কেজি) বিস্ফোরকে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য। কিন্তু ভ্যানে সত্যিকারের বিস্ফোরক না থাকায় সেটি আর ফাটেনি। বুধবার নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ভবনের সামনে থেকে নাফিসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ও এফবিআই।

কিন্তু যেভাবে 'আলকায়দার চর' সেজে নাফিসের কর্মকাণ্ড দিনের পর দিন পর্যবেক্ষণ করেছে এফবিআই, যেভাবে তার আস্থা অর্জন করে তার কর্মকাণ্ডে ইন্ধন যুগিয়ে শেষ মেষ ধরা হয়েছে, তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয়ভাবে একে 'স্টিং অপারেশন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এভাবে টোপ ফেলে নাফিসকে ধরা বৈধ কিনা তা নিয়ে নানা জায়গায় বিতর্ক হতে পারে, এবং হয়েছেও। অনেকেই তখন ভেবে নিয়েছিলেন যে, নাফিসকে 'ফাঁদে ফেলা' হয়েছে। বাংলাদেশে নাফিসের

অভিভাবকেরও একই অভিমত ছিল। এ নিয়ে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করছি। বেশ ক'বছর আগে আমেরিকার এমএসএনবিসি চ্যানেলে একটা প্রোগ্রাম হত 'To Catch a Predator' নামে। যারা অনলাইনে বসে বসে নাবালিকা মেয়েদের সাথে যৌনসম্পর্ক করার জন্য লালায়িত থাকত, তাদের ট্র্যাপে ফেলে জেলে ভরা হত। এমন নয় যে কোন ভাল মানুষকে 'ফাঁদে ফেলে' ব্যাপারগুলো করা হত। বরং অনলাইন চ্যাট ফ্যাট বহু স্তর পার হয়ে (প্রতিটি স্তরেই কিন্তু ইঙ্গিত দেয়া হত যে সম্পর্ক করতে ইচ্ছুক মেয়েটা কিন্তু 'আণ্ডারএজড') যারা খালি বাসায় মেয়ের সাথে দেখা করার লোভনীয় প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে চলে আসত তাদের গলাতেই দড়ি পড়তো। নাফিসের ব্যাপারটাও আমার সেরকমই মনে হয়। এটা এমন নয় যে নিরপরাধ নিষ্পাপ এক হাবা গোবা ছেলেকে 'কায়দা করে' ফাঁসানো হয়েছে। বরং এ ধরণের কেসে যথেষ্ট আলামত পেলেই তারা এগোয়। যে লোক সারাদিন পর্নোসাইটে গিয়ে কেবল 'আণ্ডারএজড মেয়ে' খুঁজে ফেরে, কিংবা যে ছেলে ফেসবুকে বা অন্যত্র আমেরিকাকে ধ্বংসের জন্য জিহাদের ডাক দেয়, কিভাবে বোমা যোগাড় করা যায় তার খোঁজ খবর নেয়, একে ওকে ইমেইল করে, তার ধরার পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। নাফিসের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। যারা মনে করেন একুশ বছরের শান্ত-শিষ্ট বিভ্রান্ত ছেলেকে ফাঁদে ফেলে সন্ত্রাসবাদী বানানো হয়েছে, তাদেরকে ইন্টারনেট থেকে পুরো অভিযোগনামাটি (Complaint United States of America vs. Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis) পড়ে দেখতে বলব। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে কিভাবে তিনি আমেরিকায় জিহাদ করাকে নিজের 'কর্তব্য' মনে করেছেন, আমেরিকাকে 'দার আল-হারব'[31] হিসেবে অভিহিত করেছেন, এবং আমেরিকার মুসলিমদের বলেছেন 'তালাফি'। বিন লাদেনও তাই মনে করতেন। ৯-১১ ঘটার অনেক আগেই – ১১ই জানুয়ারি ১৯৯৯ এর নিউজ উইকের একটি সংখ্যায় ওসামা বিন লাদেনের একটা সাক্ষাতকার ছাপা হয়েছিল। সেই সাক্ষাতকারে লাদেন সাহেব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন তিনি সকল আমেরিকানদের মেরে ফেলাকে 'জায়েজ' মনে করেন, কারণ আমেরিকার অমুসলিমেরা সব কাফের, আর মুসলিমেরা সব 'তালাফি' (অর্থাৎ সত্যিকার মুসলিম নন)। এরা যেহেতু আমেরিকায় ট্যাক্স দিচ্ছে, এবং আমেরিকাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করছে, তাই সব আমেরিকান, সেটা নারী পুরুষ শিশু যেই হোক না কেন – মেরে ফেললে ধর্মসিদ্ধই হবে। জিহাদিরা মনে করেন যতদিন পর্যন্ত আমেরিকার মত কাফির রাষ্ট্রগুলো ইসলামের পতাকা-তলে না আসছে ততদিন এ সমস্ত দেশগুলোকে 'দার আল-হারব' বা

---

[31] জিহাদীরা সারা বিশ্বকে দুভাগে ভাগ করে ফেলেন –'দার আল হারব' (non-Islamic nations) এবং 'দার আল ইসলাম' (Land of Peace)। এবং তারা মনে করেন ইসলামে 'দার আল ইসলাম' এর অধিবাসীদের অনুপ্রাণিত করা হয় যুদ্ধ করে যেতে যতক্ষণ না পুরো দার আল হারবের অধিবাসীরা আত্মসমর্পন করে সবাই ইসলামের অধীনস্থ হয়।

'যুদ্ধক্ষেত্র' হিসেবে দেখতে হবে। শুধু মুসলিমদের নয়, ইসলামে ধর্মান্তরিত কাফিরদের জন্যও এ কথা প্রযোজ্য। এপ্রসঙ্গে বিখ্যাত ইসলামী গবেষক আনোয়ার সাইখ লিখেছেন,

> 'ইসলামে ধর্মান্তরিত সকলেরই এটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, তাদেরকে অবশ্যই আরব সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ তাদের সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হবে আরবিয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীন: যেমন মোহম্মদকে আচরণের আদর্শ রূপে দেখা, ইসলামী আইন প্রবর্তন, আরবি ভাষা, সংস্কৃতি শিক্ষা ইত্যাদি কার্যকর করতে হবে। এর চেয়েও খারাপ কথা হল, তাদের অবশ্যই নিজস্ব সংস্কৃতি ও জন্মভূমিকে (অর্থাৎ কাফির রাষ্ট্রকে) এতোটাই ঘৃণা করতে হবে যে, এটা 'দার উল হারব' বা জীবন্ত-যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়।'

উদ্ধৃতি দেয়া যায় মুসলিম পণ্ডিত এবং ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দিমা' থেকেও[32] –

> 'শক্তি প্রয়োগ অথবা বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রত্যেককে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা ও মুসলিম মিশনে সর্বজনীনতার কারণে (এর প্রসারের জন্য) যুদ্ধে যাওয়া মুসলিমদের ধর্মীয় দায়িত্ব।'

নাফিসের মতো তরুণেরা এই সমস্ত প্যারাসাইটিক ধারনা দিয়ে কিছুটা হলেও সম্মোহিত হচ্ছে, সেটাই আশঙ্কার কথা। তার অভিযোগনামায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে প্রয়াত ওসামা বিন লাদেন নাফিসের প্রাণপ্রিয় নেতা, ইয়েমেনে নিহত আলকায়েদা নেতা আনোয়ার আল আওলাকির ভিডিও লেকচারগুলো তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, আর আলকায়দার মুখপত্র 'ইনস্পায়ার' রয়েছে তার প্রিয় পত্রিকার তালিকায়। নাফিস তার সেলফোনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য সেলফোনে কল দেয়ার আগে যে বিবৃতিগুলো লিখেছিলেন তা আলকায়দার 'ইনস্পায়ার' পত্রিকায় প্রকাশিত হবে বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তিনি আত্মঘাতী হয়ে শহীদ হবার ইচ্ছের কথাও বার কয়েক উল্লেখ করেছিলেন।

বিশ্বাসের ভাইরাসের উদাহরণ আসলে অজস্র

নাফিসের ক্ষেত্রে না হয় এফবিআই এর কারসাজিতে কিংবা সতর্কতায় ফেডারেল রিজার্ভ ভবন উড়িয়ে দেয়া আটকানো গেছে, কিন্তু ভাইরাস আক্রান্ত মননের সফল উদাহরণগুলো হাজির করলে বোঝা যাবে কীভাবে এ ধরণের মানসিকতাগুলো সমাজকে

---

[32] Ibn Khaldun, The Muqaddimah: an Introduction to History, Princeton U. Press, 1969

পঙ্গু করে দেয়, কিংবা কীভাবে সমাজের প্রগতিকে থামিয়ে দেয়। এর অজস্র উদাহরণ সাড়া পৃথিবী জুড়ে পাওয়া যাবে। কিছু প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস থেকে জানা যায়, যখন কোন নতুন প্রাসাদ কিংবা ইমারত তৈরি করা হত, তার আগে সেই জায়গায় শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়া হত – এই ধারণা থেকে যে, এটি প্রাসাদের ভিত্তি মজবুত করবে। অনেক আদিম সমাজেই বন্যা কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুমারী উৎসর্গ করার বিধান ছিল; কেউ কেউ সদ্য জন্মলাভ করা শিশুদের হত্যা করত, এমনকি খেয়েও ফেলত। প্রাচীন মায়া সভ্যতায় নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিলো। অদৃশ্য ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে মাথা কেটে ফেলে, হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলে, অন্ধকূপে ঠেলে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হত। ১৪৪৭ সালে গ্রেট পিরামিড অব টেনোখটিটলান তৈরির সময় চার দিনে প্রায় ৮০,৪০০ বন্দিকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা হয়েছিলো। কোন কোন সংস্কৃতিতে কোন বিখ্যাত মানুষ মারা গেলে অন্য মহিলা এবং পুরুষদেরও তার সাথে জীবন্ত কবর দেওয়া হত, যাতে তারা পরকালে গিয়ে পুরুষটির কাজে আসতে পারে। ফিজিতে 'ভাকাতোকা' নামে এক ধরণের বীভৎস রীতি প্রচলিত ছিল যেখানে একজনের হাত-পা কেটে ফেলে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সেই কর্তিত অঙ্গগুলো খাওয়া হত। আফ্রিকার বহু জাতিতে হত্যার রীতি চালু আছে মৃত-পূর্বপুরুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য। ভারতে সতীদাহের নামে হাজার হাজার মহিলাদের হত্যা করার কথা তো সবারই জানা। এগুলো সবই মানুষ করেছে ধর্মীয় রীতি-নীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে, অদৃশ্য ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে গিয়ে। এ ধরণের 'ধর্মীয় হত্যা' সম্বন্ধে আরো বিস্তৃতভাবে জানবার জন্য ডেভিড নিগেলের 'Human Sacrifice: In History And Today' বইটি পড়া যেতে পারে[33]। এগুলো সবই সমাজে 'বিশ্বাসের ভাইরাস' নামক আগাছার চাষ ছাড়া আর কিছু নয়।

ইতিহাসের পরতে পরতে অজস্র উদাহরণ লুকিয়ে আছে – কিভাবে বিশ্বাসের ভাইরাসগুলো আণবিক বোমার মতই মারণাস্ত্র হিসেবে কাজ করে লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়েছে। ধর্মযুদ্ধগুলোই তো এর বাস্তব প্রমাণ। ১০৯৫ সালে সংগঠিত প্রথম ক্রুসেড এর কথাই ধরা যাক। সে সময় হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয় এবং বাস্তুচ্যুত করা হয়। জেরুজালেমের প্রায় প্রতিটি অধিবাসীকে হত্যা করা হয়েছিল শহর 'পবিত্র' করার নামে। তৃতীয় ক্রুসেডে তিন হাজার জবাই করে হত্যা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ক্রুসেডের সময় সেন্ট বার্ণাড ফতোয়া দিয়েছিলেন – 'প্যাগানদের হত্যার মাধ্যমেই খ্রিষ্টানদের মাহাত্ম্য সূচিত হবে। আর যিশুখ্রিস্ট নিজেও এতে মহিমান্বিত হবেন।' এই ক্রুসেডগুলো কি 'বিশ্বাসের ভাইরাস'-এর উদাহরণ নয়? ১২০৯

---

[33] Nigel Davies, Human Sacrifice--In History and Today, William Morrow & Co; 1981

সালে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট উত্তর ফ্রান্সের আলবেজেনসীয় খ্রিষ্টানদের উপর আক্ষরিক অর্থেই ধর্মীয় গণহত্যা চালিয়েছিলেন। স্রেফ চেহারা দেখে বিশ্বাসী এবং অধার্মিকদের মধ্যে পার্থক্য করতে অসমর্থ হয়ে পোপ তখন আদেশ দিয়েছিলেন – 'সবাইকে হত্যা কর'। পোপের আদেশে প্রায় বিশ হাজার বন্দিকে চোখ বন্ধ করে ঘোড়ার পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। তারপর বার শতকের দিকে সাড়া ইউরোপ জুড়ে আলবেজেনসীয় ধর্মদ্রোহীদের খুঁজে খুঁজে হত্যার রীতি চালু হয়। ধর্মদ্রোহীদের কখনো পুড়িয়ে, কখনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে কখনো বা শিরচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। পোপ চতুর্থ ইনোসেন্ট এই সমস্ত হত্যায় প্রত্যক্ষ ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। কথিত আছে ধর্মবিচরণ সভার সংবীক্ষক (Inquisitor) রবার্ট লী বোর্জে এক সপ্তাহে ১৮৩ জন ধর্মদ্রোহীকে হত্যার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ইতিহাস কুখ্যাত 'ব্ল্যাক ডেথ' এর সময়(১৩৪৮ –১৩৪৯) বহু ইহুদীকে সন্দেহের বশে জবাই করে হত্যা করা হয়। পোড়ানো দেহগুলোকে স্তূপ করে মদের বড় বড় বাক্সে ভরে ফেলা হয় এবং রাইন নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। তারপর ধরা যাক মধ্যযুগে ডাইনি হত্যার নামে নারীদের হত্যার অমানবিক দৃষ্টান্তগুলো। সে সময় (১৪০০ সালের দিকে) চার্চের নির্দেশে হাজার হাজার রমণীকে 'ডাইনি' সাব্যস্ত করে পুড়িয়ে মারা শুরু হয়। এই ডাইনি পোড়ানোর রীতি এক ডজনেরও বেশি দেশে একেবারে গণহিস্টেরিয়ায় রূপ নেয়। সে সময় কতজনকে যে এরকম ডাইনি বানিয়ে পোড়ানো হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। সংখ্যাটা এক লক্ষ থেকে শুরু করে ২০ লক্ষ ছড়িয়ে যেতে পারে। 'ঠগ বাছতে গা উজাড়ের' মতই ডাইনি বাছতে গিয়ে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দেয়া হয়েছে। সতের শতকের প্রথমার্ধে অ্যালজাস (Alsace) নামের ফরাসি প্রদেশেই প্রায় ৫০০০ জন 'ডাইনি'কে হত্যা করা হয়, ব্যাম্বার্গের ব্যাভারিয়ান নগরীতে ৯০০ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়। ডাইনি পোড়ানোকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ধর্মীয় উন্মত্ততা সে সময় অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছিল। শুধু নারীরা নয়, খ্যাতিমান বিজ্ঞানী দার্শনিকেরাও রেহাই পাননি রক্তলোলুপ চার্চের কোপানল থেকে। জিওর্দানো ব্রুনোর মত দার্শনিককে বাইবেল-বিরোধী সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব সমর্থন করার অপরাধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয় সে সময়, গ্যালিলিওকে করা হয় অন্তরিন। আর আমাদের উপমহাদেশে তো ধর্মীয় কুসংস্কার ছিল রীতিমত ভয়াবহ। পনের শতকে ভারতে কালীভক্ত কাপালিকের দল মা কালীকে তুষ্ট করতে গিয়ে ২০ লক্ষ মানুষকে জবাই করে হত্যা করেছিল। আর ছিল সতীদাহ। কেবল ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে ৮১৩৫ নারীকে সতীদাহের নামে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় (প্রতিবছর হত্যা করা হয় গড়পড়তা ৫০৭ থেকে ৫৬৭ জনকে)। মৌলবাদী খ্রিষ্টানরা ইদানীংকালে ডাইনি পোড়ানো বাদ দিলেও অ্যাবরশন ক্লিনিকগুলোর উপর রাগ যায়নি এখনো। ১৯৯৩ থেকে আজ পর্যন্ত 'আর্মি অব গড' সহ অন্যান্য গর্ভপাত বিরোধী খ্রিস্টান মৌলবাদীরা

আট জন ডাক্তারকে হত্যা করেছে। ক'বছর আগেও (২০০৯ সালে) নৃশংসতার সর্বশেষ নিদর্শন হিসেবে খ্রিস্টান মৌলবাদী স্কট রোডার কর্তৃক ডঃ জর্জ ট্রিলারকে হত্যার ব্যাপারটি মিডিয়ায় তুমুল আলোচিত হয়। ন্যাশনাল অ্যাবরশন ফেডারেশনের সরবরাহকৃত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের পর থেকে আমেরিকা এবং ক্যানাডায় গর্ভপাতের সাথে জড়িত চিকিৎসকদের মধ্যে ১৭ জনকে হত্যার প্রচেষ্টা চালানো হয়, ৩৮৩ জনকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়, ১৫৩ জনের উপর চড়াও হওয়ার এবং ৩ জনকে অপহরণের ঘটনা ঘটে। এগুলো সবই 'বিশ্বাসের ভাইরাসের' প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

অন্য ধর্মে যেমন 'বিশ্বাসের আগাছা'র চাষ আছে, আছে ইসলামেও। ইতিহাসবিদেরাই কিন্তু স্বীকার করেন নবী মুহম্মদের জীবনের বছরগুলো অত্যন্ত সংঘাতময় ছিল[34]। তার জীবনের শেষ দশ বছরে তিনি নাখলার যুদ্ধ, বদরের যুদ্ধ, বানু কাইনুকা, বানু নাদির, বানু মুস্তালাক, আহজাব, বানু কোরাইজা, খাইবারের যুদ্ধ সহ প্রায় ৭০ টি থেকে ১০০টি আক্রমণ, লুণ্ঠন অভিযান এবং যুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলেন বলে উল্লেখ আছে[35]। এর মধ্যে ১৭টি থেকে ২৯টিতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষার্থে নয়, বরং আক্রমণাত্মক[36]। নৃশংস ঘটনা এবং গণহত্যার আলামতও আছে ঢের। বানু কাইনুকার ইহুদীদের সাতশ জনকে এক সকালের মধ্যে হত্যা করতে সচেষ্ট হন[37], আর বানু কোরাইজার প্রায় আটশ থেকে নয়শ লোককে হত্যা করেন, এমনকি তারা আত্মসমর্পণ করার পরও[38]। হত্যার ভয়াবহতা এতোই বেশি ছিলো যে, ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর মতো লেখিকা, যিনি মুসলিম সমাজের পছন্দের তালিকায় শীর্ষস্থানীয় হিসবে গণ্য হন, তিনি পর্যন্ত মুহম্মদের কর্মকাণ্ডকে নাৎসি বর্বরতার সাথে তুলনা করেছেন[39]। বহু যুদ্ধক্ষেত্র হতে সাফিয়া,

---

[34] Ali Dashti, Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, Mazda Pub, 1994

[35] এম এ খান, জিহাদ : জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ, সাম্রাজ্যবাদ ও দাসত্বের উত্তরাধিকার, বদ্বীপ প্রকাশন, ২০১০।

[36] ইবনে সাদের প্রথম দিককার জীবনী-সঙ্কলন কিতাব আত তাবাকাত (Kitaab at Tabaqaat al Kabeer) থেকে জানা যায়, মহানবী তার শেষ দশ বছরে অন্ততঃ ৭৪ টি 'হামলা যুদ্ধ' (আরবীতে গাজওয়া) সম্পন্ন করেছিলেন। আল তাবারি নবী মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর জীবনে ঘটা যে ষাটটি যুদ্ধের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার 'তারিক আল রসুল ওয়া আল মুল্লুক' গ্রন্থে, এর মধ্যে উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ ছাড়া সবগুলোই ছিল আক্রমণাত্মক।

[37] Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint, p545

[38] Tabari, Abu Ja'far Muhammad b. Jarir, "The Victory of Islam", vol viii, pp.35-36

[39] K. Armstrong, Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam, Gollanz, 1991, London, p. 207.

রায়হানা, জুয়াইরিয়ার মতো নারীকে যুদ্ধবন্দি এবং 'মাল-এ-গণিমত' হিসেবে মহানবীর জন্য অধিগ্রহণও করা হয়েছিল, ভাগ বাটোয়ারা করা হয়েছিল মুহম্মদের সৈনিকদের মাঝে। এমনকি মহানবীর মৃত্যুর পরও সহিংসতা অব্যাহত ছিল। হজরত আলী আর প্রয়াত নবীর স্ত্রী আয়েশার মধ্যে সংগঠিত 'জামালের যুদ্ধ' কিংবা আলি আর মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘটিত 'সিফিনের যুদ্ধ'ই এর প্রমাণ। জামালের প্রায় দশ হাজার মুসলিম নিহত হয়েছিল। ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, চারজন খলিফার মধ্যে তিনজনই ক্ষমতা দ্বন্দ্বে মুসলিম প্রতিপক্ষের হাতে মারা যান। তবে মারা যাবার আগে তারা ইসলামী ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখতে বহু দেশ আক্রমণ করে সেগুলো অধিগ্রহণ করেন। যেমন খলিফা আবু বকরের সময় (৬৩৩ – ৬৩৪) ওমান, ইয়েমেন, ইয়ামাহ, সিরিয়া, পারস্য, বসরা, দামাস্কাস এবং আজনাদিনের যুদ্ধ, খলিফা ওমরের সময় (৬৩৪ –৬৪৪) নামারাক, সাকাটিয়া, ব্রিজ, বুয়াইব, দামাস্কাস এবং ফাহ্ল, ইয়ারমুক, কাদিসিয়া এবং মাদাইন, জালুলা, জেরুজালেম, জাজিরা, খাজিস্তান এবং মিশর, আজারবাইজান, ফারস এবং খারান বিজয়, খলিফা ওসমানের সময় (৬৪৭ –৬৫৬) সাইপ্রাস, বাইজেন্টাইন এবং উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ, খলিফা আলির সময় নাহরোয়ানের যুদ্ধ এবং মিশরের যুদ্ধ ইত্যাদি উল্লেখ্য। হজরত আলী ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে বিষাক্ত ছুরিকাঘাতে নিহত হলে, খালিফায়ে রাশেদীনের যুগের সমাপ্তি ঘটে এবং এ সময় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন মুয়াবিয়া। তার শাসনামলে বহু যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল, তার জিহাদি সৈনিকদের দ্বারা বহু রাজ্য হয়েছিল অধিকৃত। এর মধ্যে মিশর বিজয় (৬৬২ খ্রিস্টাব্দ), সিসিলি আক্রমণ (৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ), কনস্টানটিপোল আক্রমণ (৬৬৭ খ্রিস্টাব্দ), কুফার যুদ্ধ (৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ), দের-উল-জালিকের যুদ্ধ (৬৯১ খ্রিস্টাব্দ), উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ (৭০০ খ্রিস্টাব্দ), দের-উল-জামিলার যুদ্ধ (৭০২ খ্রিস্টাব্দ), সিন্ধুর লড়াই (৭১২ খ্রিস্টাব্দ), ফ্রান্সের যুদ্ধ (৭৩২ খ্রিস্টাব্দ), আইন আল জারের যুদ্ধ (৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ), রেয়'র যুদ্ধ (৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ), ইশফাহান এবং নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ (৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতির কথা বলা যায়। এর মধ্যে ৭১১ সালে ইসলামের স্পেন বিজয়ের পর যেন বিশৃঙ্খলা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মূলত স্পেন বিজয়ের পর থেকেই ইসলামী সাম্রাজ্যবাদী শাসন বৈশ্বিক অবস্থায় চলে যায় বললে অত্যুক্তি হয় না[40]। শুধু স্পেন বিজয়ই বা বলি কেন, স্পেন বিজয়ের পর নবম শতকের গোড়ার দিকে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলীয় শহর এবং ইতালির বাইরের দ্বীপগুলো দখল, ৮১৩ সালে সেন্টুমসেলি, ইশ্চিয়া, ল্যাম্পেডুসা দখল, ৮৪৮ সালে আনকোনায় ধ্বংসযজ্ঞ, ৮৭৬ সালে ল্যাটিয়াম ও আম্ব্রিয়া আক্রমণ, ৬২৫ –৭২৫ সাল নাগাদ ক্রমাগতভাবে সিসিলি আক্রমণ, ৮২৭ সালে মাযারা ডেল ভ্যালো আক্রমণ, ৮৩১ সালে পালের্মো, ৯৩৫ সালে প্যান্টেলেরিয়া এবং ৮৪৩ সালে মেসিনার পতন, ৮৭৮ সালে সিরাকুসের আদিবাসীদের হত্যা, ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের উপর

---

[40] এম এ খান, জিহাদ, পূর্বোক্ত।

আগ্রাসন প্রমাণ করে সাম্রাজ্যবাদ কেবল পশ্চিমাদেরই একচেটিয়া ছিল না। কনস্টান্টিনোপলের বিখ্যাত বিজয়ের পর মুসলিম জিহাদি সৈনিকেরা তিনদিন ধরে সেখানকার নাগরিকদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল এবং অবশিষ্টদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। ১০১০ থেকে ১০১৩ সালের মধ্যে কর্ডোভার নিকটবর্তী অঞ্চল এবং এবং স্পেনের অন্যান্য অঞ্চলে হাজার হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হয়। অমুসলিমদের সরকারী চাকুরীতে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে ১০৬৬ সালে ব্যাপক দাঙ্গা হয়, এবং গ্রানাডার ইহুদিদের একটা গোটা সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। ইতিহাস থেকেই জানা যায়, ইসলামের জিহাদের নামে গত বার শতক ধরে সাড়া পৃথিবীতে মিলিয়নের ওপর মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। প্রথম বছরগুলোতে মুসলিম বাহিনী খুব দ্রুতগতিতে পূর্ব ভারত থেকে পশ্চিম মরক্কো পর্যন্ত আগ্রাসন চালায়। শুধু বিধর্মীদের হত্যা করেনি, নিজেদের মধ্যেও কোন্দল করে নানা দল উপদল তৈরি করেছিল। কারিজিরা যুদ্ধ শুরু করেছিলো সুন্নিদের বিরুদ্ধে। আজারিকিরা অন্য সকল 'পাপীদের' মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলো। ১৮০৪ সালে সুদানের পবিত্র সত্ত্বা উসমান দান ফোডিও গোবির সুলতানের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরু করে। ১৮৫০ সালে আরেক সুদানীয় সুফি উমর-আল হজ্জ প্যাগান আফ্রিকান গোত্রের উপরে নৃশংস বর্বরতা চালায় – গণহত্যা এবং শিরচ্ছেদ করে ৩০০ জন বন্দির উপর। ১৯৮০ সালে তৃতীয় সুদানীয় 'হলি ম্যান' মুহাম্মদ আহমেদ জিহাদ চালিয়ে ১০,০০০ মিশরীয় লোকজন হত্যা করে। এ ধরণের বহু ঘটনাই অতীতে ঘটেছে, এখনো ঘটছে।

ইসলামী শরিয়া : নারী বিদ্বেষী এক ভয়ঙ্কর ভাইরাসের নাম

ইসলামের শরিয়া আইন যে মেয়েদের ব্যাপারে অনেক কঠোর সেটা সবারই জানা। এর শিকার শুধু সাধারণ নারীরা হয়নি, হয়েছে সম্ভ্রান্ত বংশের নারীরাও। খোদ সৌদি আরবেই ১৯৭৭ সালে কিশোরী প্রিন্সেসকে 'ব্যভিচারের' অপরাধে হত্যার কথা জানা যায়। পাকিস্তানে ১৯৮৭ সালে এক কাঠুরিয়ার মেয়েকে 'জেনা'[41] করার অপরাধে পাথর ছুড়ে হত্যার ফতোয়া দেয়া হয়। ১৯৮৪ সালে আরব আমিরাতে একটি বাড়ির গৃহভৃত্য এবং দাসীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার ফতোয়া দেয়া হয়, অবৈধ মেলামেশার অপরাধে। এ ধরণের বহু ঘটনা এখনো পৃথিবীতে ঘটে চলেছে। পাশাপাশি আছে 'অনার কিলিং' এর উপদ্রব। সাড়া বিশ্বে প্রতি বছর পাঁচ হাজার নারী মারা যায় 'অনার কিলিং'-এর শিকার হয়ে। খোদ পাকিস্তানেই সরকারী হিসেবে বছরে ১,২০০ মত অনার কিলিং এর ঘটনা ঘটে, আর বেসরকারি হিসেবে এই সংখ্যা আসলে ১০ হাজারেরও উপরে।পশ্চিমেও সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিম পরিবারগুলোতে 'অনার কিলিং' এর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে

---

[41] ইসলামি আইনে 'জেনা' হলো, ব্যভিচার, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনমিলন, ধর্ষণ ও পতিতাবৃত্তি। জেনার ব্যাপারে ইসলামিক শাস্তির বিবরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

বৃদ্ধি পেয়েছে। নুর আলমালাকি, তুলায় গোরেন, খাতেরা সাদিকি, ইয়ামিন, সাবরিনা লারবি, আয়মান উদাস, আয়শা হাসান, আমিনা সারাহ সহ বহু নারীকে পরিবারের পক্ষ থেকে হত্যা করা হয়েছে 'অতিরিক্ত' পশ্চিমা ধাঁচে চলে ধর্মকে অপমানিত করার জন্য। এমনকি হ্যারি পটারের ছবিতে পদ্মা পাতিলের ভূমিকায় অভিনয় করা অভিনেত্রী আফসান আজাদ এক হিন্দু ছেলের সাথে সম্পর্ক করায় পরিবার থেকে নিগ্রহের শিকার হয়ে কিছুদিন আগেও সংবাদের শিরোনাম হয়েছিলেন।

আছে হাস্যরসবিরোধী ভাইরাস, আছে মুরতাদবিরোধী ভাইরাস

আমি যেখানে থাকি তার পাশেই আছে বিরাট বার্নস এন্ড নোবেল' এর বিরাট বড় বইয়ের দোকান। লেখালেখির ছুতায় প্রায়ই যাওয়া পড়ে সেখানে। তাদের শেলফে 'হিউমার' নামে একটি সেকশন আছে। সেখানে উঁকি দিলেই দেখতে পাওয়া যায় যীশুকে ব্যঙ্গ করা একগাদা বই। এমনি একটি বই আমি পড়ছিলাম – 'The Year of Living Biblically: One Man's Humble Quest to Follow the Bible as Literally as Possible' নামে। এ ধরণের অনেক বইই শেলফে আছে। কেউ কিন্তু লেখকের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিচ্ছে না,. দিচ্ছে না কেউ গলা কাটার হুমকি। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে ধর্মের সমালোচনা কিংবা যে কোন হাস্যরসকেই যেন নেওয়া হয় গুরুতর অপরাধ হিসেবে। ১৯৮৯ সালে 'স্যাটানিক ভার্সেস' নামের উপন্যাস লেখার দায়ে সালমান রুশদিকে ফতোয়া দেয়া হয় ইরানের ধর্মগুরু আয়াতোল্লা খোমেনীর পক্ষ থেকে। মুসলিম বিশ্বে রাতারাতি শুরু হয় লম্ফ ঝম্প। ইসলামকে অবমাননা করে লেখার দায়ে এর আগেও মনসুর আল হাল্লাজ, আলী দাস্তি, আজিজ নেসিন, উইলিয়াম নেগার্ড, নাগিব মাহফুজ,তসলিমা নাসরিন,ইউনুস শায়িখ, রবার্ট হুসেইন, হুমায়ুন আজাদ, ভ্যানগগ, আয়ান আরসি আলী সহ অনেকেই মৃত্যু পরোয়ানা পেয়েছেন। এদের মধ্যে অনেককেই মেরে ফেলা হয়েছে, কেউ বা হয়েছেন পলাতক। ২০০৫ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর জেলেণ্ডস পোস্টেন নামের একটি ডেনিশ পত্রিকা মহানবী হযরত মুহম্মদকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ১২টি কার্টুন প্রকাশ করলে সাড়া মুসলিম বিশ্বে এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জ্বালাও-পোড়াও তাণ্ডব শুরু হয়। পাকিস্তানের এক ইমাম কার্টুনিস্টের মাথার দাম ধার্য করে এক মিলিয়ন ডলার। সিরিয়া, লেবানন, ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে সহিংসতায় মারা যায় শতাধিক লোক। ব্রিটেনের মুসলিমেরা ব্যানার নিয়ে মিছিল করে – 'Slay those who insult Islam', 'Butcher those who mock Islam' এবং 'Behead those who say Islam is a violent religion' ইত্যাদি। বাংলাদেশে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সামান্য 'মোহাম্মদ বিড়াল' নিয়ে কৌতুকের জের হিসেবে ২১ বছর বয়সী কার্টুনিস্ট আরিফকে জেলে ঢোকানো হয়, বায়তুল মোকারমের খতিবের কাছে গিয়ে প্রথম আলোর সম্পাদকের ক্ষমা প্রার্থনার নাটক প্রদর্শিত হয়।

ইসলামবিরোধী ব্লগ লেখার অপরাধে এই কিছুদিন আগেও বেশ কয়েকজন ব্লগারকে গ্রেফতার করা হল। এগুলো তো চোখের সামনেই দেখা।

ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থের এটা একটা বড় সমস্যা। এর ভাল ভাল বানীগুলো থেকে ভালমানুষ হবার অনুপ্রেরণা পায় কেউ, আবার সন্ত্রাসবাদীরা একই ধর্মগ্রন্থের ভায়োলেন্ট ভার্সগুলো থেকে অনুপ্রেরণা পায় সন্ত্রাসী হবার। সেজন্যই তো ধর্মগ্রন্থগুলো –একেকটি ট্রোজান হর্স – ছদ্মবেশী ভাইরাস! এই জন্যই একই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে ইহুদী নাসারাদের সাথে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে 'বিন লাদেন' হয়ে যায় কেউ, আবার কেউ বা পরিণত হয় সুফি সাধকে। নাফিসের ক্ষেত্রেও যে প্রথমটা হয়নি তা হলফ করে বলা যায় না[42]। কী করে হলফ করে বলা যাবে যে ধর্মগ্রন্থ থেকে পাওয়া 'তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে' ধরণের ভাইরাস রূপী যুদ্ধংদেহী আয়াতগুলো (২:২২১৬, ৪:৮৪, ৫:৫১, ৩:৮৫, ৮:৩৯, ৯:২৯, ৪৭:৪ ৪:৮৯, ২:১৯১, ২:১৯৩, ৯:৫, ৯:৩৯ ইত্যাদি) সত্যই নাফিসের মতো ছেলেদের সন্ত্রাসবাদে উৎসাহিত করছে না? ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীরা জোর গলায় বলেন, কোরআন কখনো সন্ত্রাসবাদে কাউকে উৎসাহিত করে না, কাউকে আত্মঘাতী বোমা হামলায় প্ররোচিত করে না, ইত্যাদি। এটা সত্যি সরাসরি হয়ত কোরআনে বুকে পেটে বোমা বেধে কারো উপরে হামলে পড়ার কথা নেই; কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, কোরআনে পাওয়া যায় যে – যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ্ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না (৪৭:৪), কোরআনে বলা হয়েছে – আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না (৩:১৬৯); কিংবা বলা হয়েছে – যদি আল্লাহর পথে কেউ যুদ্ধ করে মারা যায় তবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত (৯:১১১)।

আর আল্লাহর পথে শহীদদের জন্য জান্নাতের পুরস্কার কেমন হবে? এ প্রসঙ্গে নির্দেশ – তথায় থাকবে আয়তলোচনা রমনীগণ(৫৫:৫৬), সুশুভ্র (৩৭: ৪৬), উদ্যান, আঙ্গুর, পূর্ণযৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পানপাত্র (৭৮: ৩৩ –৩৪), আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায় (৫৬: ২২ –২৩) চিরকুমারী (৫৬:৩৫ –৩) হুরীরা। ব্যবস্থা রেখেছেন গেলমানদেরও, সেই যে সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের খেদমতে ঘুরাফেরা করবে (৫২:২৪), ইত্যাদি।

বেহেস্তে সুরা-সাকী-হুর-পরীর এমন অফুরন্ত ভাণ্ডারের গ্রাফিক বর্ণনা দেখে নাফিসের মতো অনেকেরই হয়তো শহীদ হতে মন চাবে! অনেক বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞানীই মনেই করেন ইসলামী সমাজে বহুগামীত্ব এবং পাশাপাশি মৃত্যুর পরে উদ্ভিন্নযৌবনা এবং চিরকুমারী হুরীদের অফুরন্ত ভাণ্ডারের নিশ্চয়তার কারণেই মুসলিমদের মধ্যে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের এতো আধিক্য চোখে পড়ে[43]।এ যদি বিশ্বাসের ভাইরাসের সার্থক উদাহরণ না হয়, তবে আর 'ভাইরাস' বলব কাকে, বলুন?

---

[42] ভবঘুরে, নাফিস কি একজন বিভ্রান্ত মৌলবাদি সন্ত্রাসী নাকি সাচ্চা মুসলমান?, মুক্তমনা

[43] অবিশ্বাসের দর্শন, প্রাগুক্ত।

কেবল ইসলামের জিহাদি সৈনিকেরাই ভাইরাস আক্রান্ত মননের উদাহরণ ভাবলে ভুল হবে। 'বিশ্বাসের ভাইরাস' নিয়ে আমি ব্লগে একটি আলোচনা করেছিলাম একসময়। সেটি মুক্তমনায় প্রকাশের পর দিগন্ত সরকার নামে আমাদের এক সতীর্থ ব্লগার 'বিশ্বাসের ভাইরাস এবং আনুষঙ্গিক' নামের একটি সম্পূরক প্রবন্ধে ভারতের আর এস এস পরিচালিত স্কুলগুলোর পাঠ্যসূচীর নানা উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন কিভাবে ছেলেপিলেদের মধ্যে শৈশবেই ভাইরাসের বীজ বপন করা হয়[44]। বিদ্যা ভারতী নামের এই স্কুল সারাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে – সংখ্যায় প্রায় ২০,০০০। প্রায় ২৫ লাখ শিক্ষার্থী এতে পড়াশোনা করে – যাদের অধিকাংশই গরিব বা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের। পড়াশোনা চলে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী অবধি। তিস্তা সেতালবাদের প্রবন্ধ In the Name of History Examples from Hindutva-inspired school textbooks in India থেকে[45] অসংখ্য দৃষ্টান্ত হাজির করে দিগন্ত দেখিয়েছেন কিভাবে সত্য-মিথ্যের মিশেল দেওয়া ইতিহাস পড়িয়ে এদের মগজ ধোলাই করা হয় –

- ''হোমার বাল্মীকির রামায়ণের একটা ভাবানুবাদ করেছিলেন – যার নাম ইলিয়াড।''
- ''প্লেটো ও হেরোডোটাসের মতে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা ভারতীয় ভাবধারার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।''
- ''গরু আমাদের সকলের মাতৃস্থানীয়া, গরুর শরীরে ভগবান বিরাজ করেন।''
- একই স্কুলের ভারতের ম্যাপে ভারতকে দেখানো হয় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, তিব্বত এমনকি মায়ানমারের কিছু অংশ নিয়ে। বলা হয় অশোকের অহিংস নীতির ফলে তার সেনাবাহিনী যুদ্ধে উৎসাহ হারিয়েছিল। অ্যালেক্সান্ডার নাকি পুরুর কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন।
- মধ্যযুগের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার উদগ্র রূপ আর বেশি প্রকটিত। সমগ্র ইতিহাস শিক্ষায় মুসলিমদের বিদেশী শক্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে।
- ''ভারতে বিদেশী মুসলিম শাসন''
- ''ভারতে তলোয়ার ধরে ইসলামের প্রচার হয়েছিল। মুসলিমেরা এক হাতে কোরআন আরেক হাতে তরবারি নিয়েই এসেছিল এদেশে ... আমরা তাদের পরে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি, কিন্তু আমাদের যে ভাইয়েরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করতে ব্যর্থ হয়েছি।''

---

[44] বিশ্বাসের ভাইরাস এবং আনুষঙ্গিক, দিগন্ত সরকার, মুক্তমনা, http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=325

[45] In the Name of History Examples from Hindutva-inspired school textbooks in India, Online: http://www.sacw.net/HateEducation/Teesta.html

- ''হিন্দুরা চরম অপমানের সাথে তুর্কী শাসন মেনে নিয়েছিল।''
- ''বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, পর্দাপ্রথা সহ আরো অনেক কুসংস্কার মুসলিম রাজত্বের প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দুসমাজে স্থান করে নিয়েছে।''
- ''শিবাজী আর রাণা প্রতাপ ছিলেন প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামী। তারা মুসলিমদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্যই লড়াই করেছিলেন।''

ভারতের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে বিন কাসিম, ঘৌরী বা গজনীর মাহমুদ বা তৈমুর লঙ্গ কিভাবে হিন্দুদের হত্যা করেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা হাজির করে শিশুদের মাথায় অঙ্কুরেই 'মুসলিম বিদ্বেষ' প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। দেশ বিভাগের জন্য একতরফাভাবে মুসলিমদের দায়ী করে ইতিহাস লেখা হয়। আর.এস এস-এর মত সন্ত্রাসবাদী সাম্প্রদায়িক দলকে প্রকৃত স্বাধীনতাকামী একটি সংগঠন হিসাবে তুলে ধরা হয়। সবথেকে মজার কথা, মহাত্মা গান্ধী যে এই সংগঠনের একজনের হাতেই মারা গিয়েছিলেন, সেকথাও বেমালুম চেপে যাওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে, পাঠক্রম এমনভাবে সাজানো যাতে সবার মধ্যে ভাব সৃষ্টি হয় যে তাদের পূর্বপুরুষেরা মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের হাতে অত্যাচারিত। তাদের ঘাড়ে দায়িত্ব বর্তায় তার প্রতিশোধ নেবার। এ সবকিছুই দিগন্ত তার প্রবন্ধে খুব পরিষ্কারভাবেই উল্লেখ করেছেন।

২০০৮ সালের ২৬ এ নভেম্বর। প্রায় দশ জন ফিদাইন জঙ্গি মুম্বাইয়ের তাজ হোটেলে সন্ত্রাসবাদের তুঘলকি কাণ্ড শুরু করেছিলো; সেদিন এই 'বিশ্বাসের ভাইরাস' নিয়ে আমরা মুক্তমনায় দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। বিশ্বাসের বাইরেও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইস্যু সহ নানা ধরণের আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ উঠে এসেছিলো বিস্তৃত পরিসরে। উঠে এসেছিলো কাশ্মীর প্রসঙ্গ, উঠে এসেছিলো ভারতে মুসলিম মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যের নানা উদাহরণ। এটা ঠিক যে, কাশ্মীরী জনগণের উপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর লাগাতার অত্যাচার, বাবরি মসজিদ ধ্বংস কিংবা গুজরাটে সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিমদের উপর যে ধরণের অত্যাচারের স্টিম রোলার চালানো হয়েছে তা ভুলে যাবার মত বিষয় নয়। মুসলিমরা ভারতের জনগণের প্রায় ১৪ শতাংশ। অথচ তারাই ভারতে সবচেয়ে নিপীড়িত, অত্যাচারিত এবং আর্থসামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া এক জনগোষ্ঠী। এ সমস্ত অনেক কারণ মুসলিমদের ক্ষুব্ধ করেছে বছরের পর বছর ধরে। কিন্তু এটাও ঠিক, পৃথিবীতে সামাজিক অবিচার যেমন আছে, তেমন আছে সামাজিক অবিচারের নামে অন্ধবিশ্বাসের চাষ এবং তার প্রচার। ধর্মগ্রন্থের জিহাদি বানীগুলো কিংবা সুচতুর উপায়ে বিকৃত ইতিহাস তুলে ধরে পরবর্তী প্রজন্মকে মগজ ধোলাইয়ের উদাহরণগুলো এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মুক্তমনা সদস্য অপার্থিব জামান প্রবন্ধটি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে যা বলেছেন তা হয়ত অনেকের মনেই চিন্তার খোরাক যোগাবে। তিনি বলেন –

> 'মানুষের কোন কোন স্বভাব যেমন উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়ায় বিশেষ কোন বংশাণুর পরিস্ফুটনের কারণে সৃষ্ট হয়, তেমনি মৌলবাদী সন্ত্রাসও ঘটতে পারে কোন কোন ধর্মীয় আদেশাবলীর উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়ায় পরিস্ফুটিত হবার কারণে। এই উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করতে পারে অনেক কারণ, যার মধ্যে সামাজিক অনাচার অবশ্যই অন্যতম। কিন্তু 'শুধু' সামাজিক অনাচার থাকলেই যে মৌলবাদী সন্ত্রাস ঘটবে এটা নিশ্চিত না। বংশাণুর মত একটা মূল কারণও থাকতে হবে (মৌলবাদী সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে যা হতে ধর্মগ্রন্থের কোন কোন শ্লোক, কিংবা জাতিবিদ্বেষী বিকৃত ইতিহাস চর্চা)। আর এই ধর্মীয় বংশাণু কেবল সামাজিক অনাচারেই পরিস্ফুটিত হয় – তাও হলফ করে বলা যাবে না। কোন কোন ধর্মের আদেশাবলী এতই শক্তিশালী যে বিভিন্ন পরিস্ফুটক পরিবেশ অতি সহজেই সৃষ্ট হয় আদেশাবলীর জোরাল তাগিদেই। আর ধর্মীয় মূল কারণ না থাকলে সামাজিক অনাচার অন্যরকম সন্ত্রাসের জন্ম দিতে পারে। আবার নাও দিতে পারে। থাইল্যান্ডে অতি গরীব বৌদ্ধরা ভিক্ষা করবে কিন্তু কখন ও হিংসায় লিপ্ত হবে না। অনেক গরীব লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও সততা বিসর্জন দেয় না। তিব্বতিদের ওপর অত্যাচার হয়েছে অনেক বেশী। কিন্তু তিব্বতের লোকেরা হিংসার আশ্রয় নিয়ে সন্ত্রাসবাদী হয় নি। কাজেই এটা কখনই বলা যায় না যে সামাজিক অনাচারই ধর্মীয় সন্ত্রাসের মূল কারণ, বরং বলা যায় অনুঘটক মাত্র।'

কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল আহসান নাফিসের আচরণ প্রত্যক্ষ করলে অপার্থিবের এই অভিমতের সত্যতা হয়তো খুঁজে পাবেন অনেকে। চিন্তা করে দেখুন, নাফিস আমাদের আর দশটা ছেলের মতই মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। তার পিতা নিজেও ব্যাংকার। তাই ভিনদেশে পাড়ি দিয়ে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের মত একটি প্রতিষ্ঠান তার ছেলেকে উড়িয়ে দেবার শিক্ষা তিনি দেননি এটা ধরেই নেয়া যায়। এমন কোন আলামত পাওয়া যায়নি যে পারিবারিক পরিবেশ থেকে নাফিস সন্ত্রাসী হয়ে উঠেছিল। বরং বাবা মা সারা জীবন ধরে সন্তানকে যেভাবে আগলে রাখে সেভাবেই রেখেছিলেন নাফিসকে। আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ২০০৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া এ ছেলেকে একটা সময় দেশের পাঠ চুকিয়ে বিদেশেও পাঠিয়েছিলেন তারা, ছেলের সুশিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার কথা ভেবে। তাহলে কে বা কারা এমন একটি 'সোনার টুকরা' ছেলেকে রাতারাতি সন্ত্রাসবাদীতে পরিণত করে ফেলল? হ্যাঁ, এ কথা এখন পরিষ্কার করেই বলার সময় এসেছে যে, তার মা –বাবা, পরিবার কেউই নাফিসকে ধর্মান্ধ বানায়নি, তার মিউটেশন ঘটেছিল 'ধর্মের ভাইরাস'-এর মাধ্যমে। জিহাদি প্যারাসাইটিক ধারণায় আক্রান্ত নাফিসের ভাইরাস-আক্রান্ত মনন ভেবে নিয়েছিল জিহাদ করে এবং বোমা মেরে ফেডারেল ভবন কিংবা স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন উড়িয়ে দিলেই

আমেরিকার টনক নড়বে, চাইকি হয়তো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও বানচাল হয়ে যেতে পারে, এবং শেষ পর্যন্ত 'মুসলিমদের প্রতি' আমেরিকার দীর্ঘদিনের বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটবে। কিন্তু নাফিস যেটা বোঝেননি তা হল, এ ধরণের প্রতিটি ঘটনাই তৈরি করে আরো দীর্ঘস্থায়ী বৈষম্যের, এবং পরিস্থিতি হয়ে ওঠে তাদের নিজেদের জন্যই আরো নাজুক। এরকম আরো কিছু ঘটনার সাথে আমরা পরিচিত হব পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়
বিশ্বাসের ভাইরাস : থাবা বাবার রক্তবীজ

শাহবাগ আন্দোলন এবং কাদের মোল্লার ফাঁসি

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। কাদের মোল্লা সহ সকল যুদ্ধাপরাধীদের সঠিক বিচারের প্রত্যাশায় শাহবাগ তখন উত্তাল। শুরুটা হয়েছিল কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার রায়কে কেন্দ্র করে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত আব্দুল কাদের মোল্লার রায় ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। শতাধিক হত্যা ও ধর্ষণসহ মানবতাবিরোধী ছয়টি অভিযোগে কাদের মোল্লার জড়িত থাকার বিষয়গুলো 'সন্দেহাতীত'ভাবে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও মাননীয় আদালত ফাঁসি না দিয়ে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন।

কাদের মোল্লার এ রায়ের খবর মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে ফেসবুক ও ব্লগসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ফুঁসে ওঠে অনলাইন ব্লগার এবং অ্যাক্টিভিস্টরা। তাদের মাধ্যমেই সূচনা হয় এক অবিস্মরণীয় মহাজাগরণের।

কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবি নিয়ে 'ব্লগার এন্ড অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক'র ব্যানারে ওইদিন বিকেলেই শাহবাগে জড়ো হয় একদল তরুণ। আর এ খবর ছড়িয়ে পড়লে তাদের দাবির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ একত্রিত হতে শুরু করে শাহবাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে ছাত্ররা দলে দলে যোগ দিতে থাকেন শাহবাগে। আশেপাশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও শিক্ষার্থীরা ছুটে যান শাহবাগে। ছুটে যান নারীরা। ধীরে ধীরে এই আন্দোলনের জোয়ার ঢাকা শহরকে অতিক্রম করে যায়। কাদের মোল্লাসহ সকল যুদ্ধাপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে ছাত্রজনতাসহ সর্বস্তরের মানুষের টানা গণ অবস্থান শুরু হয় সেখানে।

সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে সে খবর ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গায়। দ্রুতই শাহবাগের জনসমাবেশ পরিণত হয় এক বিশাল জনসমুদ্রে। সকল শ্রেণির মানুষের পাশাপাশি এ আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন দেশের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী মহল সহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।

চিত্র : শাহবাগ আন্দোলন : কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ডের দাবীতে অনলাইন ব্লগার এবং অ্যাক্টিভিস্টরা সূচনা করেছিল এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের।

একাত্তরের জীবিত মুক্তিযোদ্ধারা শাহবাগের এ আন্দোলনকে আখ্যায়িত করেন '২য় মুক্তিযুদ্ধ' হিসেবে এবং তরুণদের আখ্যায়িত করেন, '২য় প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে। শাহবাগ নামাঙ্কিত হয় 'প্রজন্ম চত্বর' হিসেবে। ৮ই ফেব্রুয়ারি তরুণদের এ অবস্থানের নাম দেওয়া হয় 'গণজাগরণ মঞ্চ'। দেশীয় মিডিয়াগুলো সহ আন্তর্জাতিক সকল মিডিয়াও ফলাও করে প্রচার করে শাহবাগের এই 'গণজোয়ার'-এর খবর।

এদিকে কয়েক লাখ লোকের এ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় ট্রাইব্যুনালের আইন নিয়ে। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইনে আদালতের দণ্ডাদেশের পর আসামি পক্ষের আপিলের সুযোগ থাকলেও বাদীপক্ষ বা সরকারের আপিলের সুযোগ ছিল না। আইনের এ 'মারাত্মক ত্রুটি' ও 'অসম সুযোগ' পরিবর্তন করার দাবি জানায় গণজাগরণ মঞ্চ।

এ জন্য রাজপথে আন্দোলনের পাশাপাশি তারা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। এরপর সরকারও এ আইন সংশোধনে উদ্যোগী হয়। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সরকারের আপিলের সুযোগ রেখে ১৭ই ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) সংশোধন বিল ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাস হয়। এ আইন পাস হওয়ায় কাদের মোল্লার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে রাষ্ট্রপক্ষ। এর ধারাবাহিকতায় ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রধান বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে সুপ্রিমকোর্টের আপিল

বিভাগের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে (৪:১) আবদুল কাদের মোল্লাকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেন।

তবে ফাঁসির দণ্ডাদেশ হলেও এর বাস্তবায়ন নিয়ে কম নাটক হয়নি। আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর। এই রায়ের অনুলিপি সুপ্রিম কোর্ট থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। গত ৮ই ডিসেম্বর বিকেলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ থেকে কাদের মোল্লার মৃত্যু পরোয়ানা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু ঘোষিত সময়ের দেড় ঘণ্টা আগে হঠাৎ করেই কাদের মোল্লার ফাঁসির কার্যক্রম স্থগিত করেন চেম্বার বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন। তিনি ১১ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ফাঁসির কার্যক্রম স্থগিত করে বিষয়টি আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠান। এভাবে ফাঁসি শেষ মুহূর্তে স্থগিত করে শুনানির জন্য পাঠানোর ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে একেবারেই 'তুলনারহিত' বলা চলে। অনেকের হৃদয়েই বাজছিল দুরাশার অশনি সংকেত।

কিন্তু সেই অশনি সংকেতকে মিথ্যে প্রমাণ করে শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন খারিজ করে দেন। এর ফলে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে আইনগত আর কোনো বাধা থাকলো না।

বৃহস্পতিবার রাত ১০টা এক মিনিটে কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়। শাহবাগ আন্দোলনের সূচনা না হলে কাদের মোল্লার ফাঁসি আমরা দেখতে পেতাম না, এ কথা আজ নির্দ্বিধায় বলা যায়। সেই শাহবাগ আন্দোলনেরই এক উদ্দীপিত তরুণ ছিলেন রাজীব হায়দার, অনলাইনে যার পরিচয় ছিল 'থাবা বাবা' নামে। থাবা বাবাদের মত তরুণদের কারণেই শাহবাগ আন্দোলন সফল হতে পেরেছে এটা বোধ হয় অতিশয়োক্তি নয়।

বিজয়ের এই দিনে, থাবা তোমায় মনে পড়ে

কাদের মোল্লার ফাঁসির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মের যে বিজয় অর্জিত হয়েছে, তা থাবা বাবা দেখে যেতে পারেননি। তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল ১৫ই ফেব্রুয়ারি। আগেই বলেছি, যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে শাহবাগের গণজাগরণ চত্বরের গণআন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন ব্লগার রাজীব হায়দার শোভন। তিনি শুধু একজন ব্লগারই ছিলেন না, পেশাগত জীবনে ছিলেন স্থপতি। তার অপরিসীম মেধার স্বাক্ষর হয়ে থাকবে 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধের নকশা' যা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেয়েছে[46]।

---

[46] রাজীবের নকশায় হবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম।

রাজীবকে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পল্লবী থানার পলাশনগরের বাড়ির অদূরে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

চিত্র : রাজীব হায়দার, যার মত অ্যাক্টিভিস্টদের কারণে শাহবাগ আন্দোলন সফলতার মুখ দেখেছে।

কারা খুন করেছিল রাজীবকে? কেন? রাজীবকে হত্যার চার দিন আগে জামাতি ব্লগ বলে পরিচিত (অধুনা বিলুপ্ত) 'সোনার বাংলা' ব্লগে 'থাবা বাবা' তথা রাজীবের নামে উস্কানিমূলক পোস্ট দেয়া হয়েছিল। এমনকি রাজীব মারা যাবার পরেও শাফিউর রহমান ফারাবী নামে এক হিযবুত তাহরীরের প্রাক্তন সদস্য ফেসবুকে তার স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন এই বলে, 'যেই ইমাম থাবা বাবার (রাজীব) জানাজা পড়াবে, সেই ইমামকেও হত্যা করা হবে।'

আরো পরিষ্কার উত্তর পাওয়া গেল মার্চ মাসের ২ তারিখে যখন রাজীব হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে প্রখ্যাত বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন ছাত্র – ফয়সাল বিন নাঈম ওরফে দ্বীপ, মাকসুদুল হাসান অনিক, এহসান রেজা রুম্মন, নাঈম সিকদার ইরাদ ও নাফিজ ইমতিয়াজকে আটক করা হল। তারা পাঁচজনই এই হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশ নেয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন। নর্থ সাউথের আরেক ছাত্র সাদমান ইয়াছির মাহমুদকে গ্রেফতার করা হয় ১৪ অগাস্ট রাজধানীর ধানমণ্ডি থেকে। তিনিও রাজীব হত্যায় জড়িত ছিলেন বলে পুলিশ দাবী করেছে। আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ব্লগার রাজীবকে হত্যা করেছে বলে পত্রিকায় এসেছে। এদের নির্দেশদাতা

ছিলেন শিবেরের 'বড় ভাই' রেজওয়ানুল আজাদ রানা। তিনি অবশ্য এখনো পলাতক। সম্প্রতি (এ বছরের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে) ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। অভিযোগপত্রে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের প্রধান জসীমউদ্দিন ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাত শিক্ষার্থীসহ মোট আটজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশের অভিযোগে বলা হয়েছে – ''আটক থাকা সাতজনসহ মোট আটজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে চার্জশিটে। এর মধ্যে অভিযুক্ত মুফতি মো: জসিমউদ্দিন রহমানী জঙ্গী এবং উগ্র তৎপরতার সাথে জড়িত ছিলেন। এই জসিমউদ্দিন রহমানী ঢাকার মোহাম্মদপুরে দু'টি মসজিদে জুম্মার নামাজের আগে খুতবা দিতেন এবং তিনি ধর্মবিরোধী ব্লগারদের হত্যার ফতোয়াও দিতেন। অন্য আসামীরা সবাই নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং তারা ঐ খুতবা শুনতে যেতো। এভাবে তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল।''

চিত্র : রাজীব হত্যায় গ্রেফতারকৃত আসামীরা। 'ঈমানী দায়িত্ব পালনের জন্য এই হত্যাকাণ্ড' তারা ঘটিয়েছে বলে তারা স্বীকার করেছিল পত্রিকায়।

রাজীব মারা যাবার পর পরই আমি একটি পত্রিকায় লেখা লিখেছিলাম – 'কেন কেবল তারাই আক্রান্ত হচ্ছেন?' শিরোনামে[47]। সে লেখায় আমি অনুমান করেছিলাম যে মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং মুক্তমত প্রকাশের কারণেই রাজীব ধর্মান্ধ শক্তির উষ্মার কারণ হয়েছেন, তিনি আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে, ঠিক যেমনিভাবে ঘাতকাহত হয়ে প্রলম্বিত মৃত্যুর দিকে চলে যেতে হয়েছিল প্রথাবিরোধী লেখক হুমায়ুন আজাদকে। আমার অনুমান যে মিথ্যা ছিল না তা ধরা পড়ার পর অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণ পাওয়া যায়। অভিযুক্ত আততায়ীদের বিভিন্ন ব্লগের ঠিকানা এবং ব্লগ থেকে ডাউনলোড করে তথ্য দিয়ে প্ররোচিত করেন শিবিরের এক ব্যক্তি। রাজীবের লেখা তাদের 'ধর্মানুভূতি'কে আহত করেছিল, তাই 'ঈমানী দায়িত্ব পালনের জন্য এই হত্যাকাণ্ড' তারা ঘটিয়েছে বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উগ্রবাদী আচরণের নিদর্শন এটাই প্রথম নয়। বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল আহসান নাফিস নামের যে ছেলেটি গত বছরের নভেম্বর মাসে নিউইয়র্কে বোমা হামলা করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, সেই ছেলেটিও বাংলাদেশে থাকাকালীন সময়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো। এখন রাজীবের হত্যাকারীরাও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ায় এ প্রশ্নটি সামনে চলে এসেছে – কেন নর্থ সাউথের মত বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে মূলত উচ্চমধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছেলে মেয়েরা পড়তে যায় বলে সার্বিকভাবে অনুমিত হয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়টি জঙ্গিবাদের প্রজনন-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে? ডাল কুছ মে কালা হ্যায়?[48]

নর্থ সাউথ এর ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর নিতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য পেয়েছিলাম সে সময়। বেশ কিছু পত্রিকার (যেমন ৩ মার্চ, ২০১৩ জনকণ্ঠ দ্রঃ) খবরেই এসেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্রপন্থী দল হিযবুত তাহরীরের আস্তানায় পরিণত হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি[49]। অনেকেই হয়তো জেনে অবাক হতে পারেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীর ও শিবিরের পূর্ণাঙ্গ কমিটি সক্রিয় থাকা দেশের একমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে নর্থ সাউথ। এর পেছনে শক্তি হিসেবে কাজ করছে বিশ্ববিদ্যালয়েরই শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন শিক্ষক-পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তা। বাইরে থেকে একটা 'সুবেশিত এবং আধুনিক' বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেজ তৈরি হলেও

---

[47] অভিজিৎ রায়, কেন কেবল তারাই আক্রান্ত হচ্ছেন?, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

[48] এ নিয়ে আমার একটি বিশ্লেষণ বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম এ – 'নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কি জঙ্গিবাদের অভয়ারণ্য?' দ্রষ্টব্য। এছাড়া দেখুন 'বিশ্বাসের ভাইরাস: নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কি জঙ্গিবাদের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে?', মুক্তমনা, মার্চ ৫, ২০১৩

[49] নর্থ সাউথ ভার্সিটি ফের আলোচনায়- শিবির ও হিযবুত জঙ্গী আস্তানা: রাজীব হত্যায় পাঁচ ছাত্র গ্রেফতারে তোলপাড়, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ মার্চ ২০১৩।

দিনের পর দিন জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ট্রাস্টি বোর্ডের দুই সদস্য ও পাঁচ শিক্ষকের প্রত্যক্ষ মদদে উগ্র মৌলবাদীদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি এমন আলামত বেরিয়ে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পাঠচক্রের আড়ালে নিয়মিতভাবে হয় শিবির ও হিযবুত তাহরীরের 'ঐক্যবদ্ধ বৈঠক'। এর পেছনে শক্তি হিসেবে কাজ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন শিক্ষক-পরিচালনা পরিষদ কর্মকর্তা। একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এই অংশটি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিযবুত তাহরীর লালনকারী হিসেবে পরিচিত একজন শিক্ষককে ২০ লাখ টাকা বেতনে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগের চেষ্টা চালায়[50]। জানা গেছে, হিযবুত তাহরীর নামে জঙ্গিবাদের বিস্তার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশ কিছুদিন ধরেই গোয়েন্দা নজরদারিতে রয়েছে। গোয়েন্দা প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৯২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হিযবুত তাহরীরের বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ভিসি ছিলেন বিএনপি মতাদর্শী অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল আহাদ। উদ্যোক্তা হিসেবে আরও ছিলেন শায়েস্তা আহমদ, ব্যবসায়ী নুরুল এইচ খান, মাহবুব হোসেন ও জামায়াতের নীতিনির্ধারক সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান। এই শাহ আবুল হান্নান ইন্টারনেটে (বিভিন্ন ফোরাম এবং ইয়াহু এবং গুগল গ্রুপে) 'জামাতি প্রোপাগান্ডা' চালানোর কাজে সদা তৎপর। তার সঙ্গে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও সাবেক স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকারসহ অনেক সিনিয়র নেতার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিল। শাহবাগ আন্দোলন চলাকালীন সময় শাহ আব্দুল হান্নান, এমবি আই মুন্সি এবং শমশের মোবিন চৌধুরীর একটি কথোপকথন ইন্টারনেটে ফাঁস হয়ে যায়। BJI International Relations (বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস) এর গ্রুপ ইমেইল চালাচালিতে এই জামাতি মতাদর্শের সৈনিকেরা শাহবাগ আন্দোলনকে 'ফ্যাসিবাদী আন্দোলন' হিসেবে অভিহিত করেন। ব্যাপারটা খুবই তাৎপর্যময় এজন্য যে, 'আমার দেশ' জামাতে ইসলামীর প্রপাগান্ডিস্ট এম বি আই মুন্সি এবং হান্নান শাহ-এর লাইনগুলোই হুবহু টুকে নিয়ে এর পর দিন পত্রিকার শিরোনাম করেছিল 'শাহবাগে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি' শিরোনামে। এ নিয়ে (অধুনা পরলোকগত) নিউ অরলিন্স প্রবাসী গবেষক ড. জাফর উল্লাহ তাঁর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মাধ্যমে এই জামাতি-ত্রয়ীর গুমোর ফাঁস করে দেন মুক্তমনার ইংরেজি ব্লগে[51]। এই শাহ হান্নানের মত মৌলবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী উগ্রপন্থী

---

[50] এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিদিনে ২০১০ সালে প্রকাশিত 'নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিযবুত তাহরীর' শিরোনামের প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য।

[51] Dr. A. H. Jaffor Ullah, Unmasking Jamaat's chief international propagandist, Mukto-Mona, February 13, 2013

মানুষ কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্ব পেতে পারেন তা আমার বোধগম্য নয়।

যা হোক, শায়েস্তা আহমদ, নুরুল এইচ খান, মাহবুব হোসেন ও শাহ আবদুল হান্নানের সুপারিশে এবং প্রভাবে প্রথম থেকেই বিএনপি-জামায়াত মতাদর্শের শিক্ষকেরা নিয়োগ লাভ করে। প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক হাফিজ জিএ সিদ্দিকী রাজনৈতিকভাবে জামায়াত মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন বলে পত্রিকায় এসেছে (পরে গত বছর অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সাত্তার)। জামাত এবং হিযবুত তাহরীর কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার মানসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ড. মঞ্জুরুল হক খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার কথাও শোনা গেছে। মাঝখানে খবর এসেছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী কর্মকর্তারা জামায়াতের সাবেক আমির গোলাম আযমের ভাগ্নে ও সাবেক ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় নেতাকে উপাচার্য বানাতে চাচ্ছিলেন[52]। কিন্তু নাফিসের ঘটনার পর সাধারণ শিক্ষকদের চাপে সেটা তাদের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এর আগে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সে সময়কার উপাচার্য হাফিজ জিএ সিদ্দিকী বিশ্ববিদ্যালয়ে হিযবুত তাহরীরের জঙ্গি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ড. মঞ্জুরুল হক, কতিপয় শিক্ষক ও পরিচালনা পরিষদ সদস্যদের নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছিলেন। পরিচালনা পরিষদের তিন সদস্যের বিরুদ্ধে হিযবুত তাহরীরের কর্মকাণ্ডে ওতপ্রোত জড়িত থাকার বিষয়টি খুব পরিষ্কার বলে জানা যায়। শাহ আবুল হান্নানের মতোই আরেক হান্নান (ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী) রয়েছেন নর্থ সাউথের শিক্ষক হিসেবে; এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিবিএ প্রোগ্রামের পরিচালক' হিসেবে কাজ করছিলেন এবং বর্তমানে 'স্কুল অব বিজনেসের' ডিন হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। তিনি জামায়াতের অন্যতম নীতিনির্ধারক হিসেবে পরিচিত। এছাড়া জামাতি মতাদর্শের আরেক প্রভাবশালী শিক্ষক ড. গোলাম মোহাম্মদের কথাও ২০১০ সালের গোয়েন্দা প্রতিবেদনে এসেছিল যিনি অর্থনীতির শিক্ষক হলেও মূলত ছাত্রছাত্রীদের হিযবুত তাহরীরের আদর্শ প্রচারে তৎপর ছিলেন। এই 'স্বনামধন্য' শিক্ষকের বিরুদ্ধে তার নিজের স্ত্রীই ২০০৪ সালে নারী নির্যাতন মামলা করেছিলেন বলে জানা গেছে (তিনি ২০১১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন)। শেখ তৌফিক নামে আরেক শিক্ষক যিনি অ্যাকশন এইড নামের এনজিওর সাথে জড়িত ছিলেন, এবং বর্তমানে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক কর্মরত আছেন, তিনি হিযবুত তাহরীরের নীতি গবেষণা কেন্দ্রের ট্রাস্টি এবং রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত। এরা সবাই মিলে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি করেছে এক জঙ্গিবাদের অভয়ারণ্য। ২০১৩ সালের মার্চ মাসের

[52] বিভাষ বাড়ৈ, নর্থ সাউথে নাফিসের পর এবার গোলাম আযম কানেকশন!, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ অক্টোবর ২০১২।

তিন তারিখে প্রথম আলো পত্রিকাতেও এইসব গুণধর শিক্ষকদের নাম উহ্য রেখে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে –'কিছু শিক্ষকের ছায়ায় জঙ্গি হচ্ছেন নর্থ সাউথের ছাত্ররা' শিরোনামে[53]।

এ ধরণের অভয়ারণ্য তৈরির খেসারত হিসেবে এখানে নিয়মিতভাবে দেখা গেছে উগ্রপন্থী ছাত্রদের নানামুখী বিচরণ। দৈনিক সমকালে সম্প্রতি প্রকাশিত 'লোমহর্ষক বর্ণনা দিল ঘাতকরা' শিরোনামের লেখাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে রাজীব হত্যার সাথে জড়িত দুইজনের সঙ্গে হিযবুত তাহরীরেরও সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। ওই দু'জনের পরিবারও ডিবিকে জানিয়েছেন, তাদের সন্তান হিযবুতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ওই দু'জনের বাসা থেকেও হিযবুতের মতাদর্শের বিভিন্ন জিহাদি বইপত্র পাওয়া গেছে। বিশেষ একটি গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, জামায়াতের প্রত্যক্ষ মদদে জেএমবি ও হুজি সৃষ্টি হয়েছিল। এ দু'টি দল নিষিদ্ধ হলে জামায়াত আন্তর্জাতিক মানের জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর গঠনে মদদ যোগানো শুরু করে। হিযবুত তাহরীরের নেতাকর্মীদের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই ছাত্রশিবিরের সদস্য বলে জানা গেছে।

এ সময়ই আলোচনায় উঠে আসে 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিম' নামে নতুন উগ্রবাদী সংগঠনের কথা। মূলত ছাত্রশিবির ও হিযবুত মিলে গঠিত এ দলটির সদস্যরা রাজীব হত্যায় ইন্ধন যুগিয়েছে বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে[54]। একটা সময় পর বাংলাদেশ সরকার আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের মূল হোতা মুফতি জসিমউদ্দীনসহ তার ত্রিশ জন অনুসারীকে গ্রেফতার করে। মুফতি জসিমউদ্দীন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে লিপ্ত হতে বাংলাদেশী তরুণদের উস্কানি দিত এবং এই কাজে মসজিদ ও মাদ্রাসার মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময় বিভিন্ন আলোচনায় উঠে আসতে থাকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামাজ ঘরটি নাকি জঙ্গি সদস্য নিয়োগের আখড়া হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পত্রিকাতেই এসেছে রাজীব হত্যাকারীরা একে অপরের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন সেখানেই। শুধু ছেলেদের নামাজ ঘরটিই নয়, একইভাবে জঙ্গি মনন চাষাবাদে ব্যবহৃত হচ্ছিল মেয়েদের নামাজের ঘরটিও। সে সময় সচলায়তন ব্লগে নিয়াজ মোর্শেদ চৌধুরী 'নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি' শিরোনামের একটি লেখা লিখেছিলেন, যেখানে তিনি নিজের স্ত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়কার অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেন এভাবে –

> "মেয়েদের নামাযের ঘরে নিয়মিত বোরকায় আবৃত এক বা একাধিক মেয়ে গোল হয়ে বসে অন্যান্য সাধারণ মেয়ে যারা নামায পড়তে আসে তাদের নিয়ে আলোচনা সভা করে। আপাত দৃষ্টিতে এ ধরণের সভা করা খারাপ কিছু না। কিন্তু বাস্তবতা

---

[53] কিছু শিক্ষকের ছায়ায় জঙ্গি হচ্ছেন নর্থ সাউথের ছাত্ররা, দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ৫, ২০১৩

[54] দেখুন, আনসার উল্লাহ বাংলা টিম :ছাত্রশিবির ও হিযবুত মিলে গঠিত, জনকণ্ঠ রিপোর্ট, ১৫ মার্চ ২০১৩। কিংবা দেশে নতুন উগ্রপন্থী গোষ্ঠী 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিম' সক্রিয়, প্রথম আলো রিপোর্ট।

হচ্ছে এই সভাগুলো একটা সময় সাধারণ ছাত্রীদের ব্রেইন ওয়াশের ক্ষেত্র হয়ে উঠে। আমার স্ত্রী প্রথমে কৌতূহল বশত এবং পরে তাদের আলোচনার ধরন ও প্রকৃতি বোঝার জন্য নামাযের ঘরে নিয়মিত গিয়ে তাদের সাথে মিশে শোনার চেষ্টা করতো তারা কী বলছে। খুব দ্রুতই সে লক্ষ্য করে ঐ নির্দিষ্ট মেয়েদের বক্তব্য এবং দাওয়াত দেয়ার ধরণ জামাত-শিবিরের রাজনীতির সাথে হুবহু মিলে যায়। ঐ মেয়েগুলো সাধারণ ছাত্রীদের সাথে প্রথমে মিষ্টি ভাষায় কথা শুরু করলেও ধীরেধীরে তাদের উগ্র মতবাদ চাপিয়ে দিতে শুরু করে। আমার স্ত্রীর মুখে শুনেছি, মানুষকে কনভিন্স করার ভয়াবহ ক্ষমতা রয়েছে এই মেয়েগুলোর মাঝে। তাদের ধৈর্য অপরিসীম। এভাবে দিনের পর দিন ব্রেইন-ওয়াশের ফলে তারা এক সময় ঠিকই তাদের দল ভারী করতে সক্ষম হচ্ছে। সব কথা উন্মুক্ত ব্লগে লেখা সম্ভব না। শুধু এতটুকু বলবো, আমার স্ত্রীর কিছু বান্ধবী যারা এক সময় আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতই উচ্ছল ছিল, আজ এদের সাথে মিশে পুরোপুরি বদলে গেছে। ফেসবুক থেকে তারা নিয়মিত ছড়াচ্ছে ঘৃণা আর উগ্রবাদ।"

নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ভবন বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনার অভিযোগে নর্থ সাউথের কামেল প্রাক্তন ছাত্র কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল আহসান (যার কথা প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে) কিংবা রাজীব হত্যায় জড়িত নর্থ সাউথের ছাত্রদের মুখগুলোর দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি 'বিশ্বাসের ভাইরাস' কত প্রকটভাবে মস্তিষ্ককে অধিকার করে ফেলতে পারে, যার ফলে একজনকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে খুন করতেও তাদের বাধে না, বরং এটাকে তারা 'ঈমানী দায়িত্ব' বলে মনে করে।

আমরা আগের অধ্যায়ে *ল্যাংসেট ফ্লুক* নামে প্যারাসাইটের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। পিপড়ার মগজে থাকা ল্যাংসেট ফ্লুক নামে এক ধরণের প্যারাসাইটের সংক্রমণে পিপড়ারা কেবল পাথরের গা বেয়ে উঠানামা করতে থাকে কলুর বলদের মতো। সেই একই অধ্যায়ে আমরা জেনেছিলাম *নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্মের* কথাও। এদের প্রভাবে ঘাস ফড়িং পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। আর জলাতঙ্ক রোগের প্রভাবে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার উদাহরণ তো কমবেশি সবারই জানা।

রাজীবকে হত্যার বিবরণ পড়লে হতবাক হতে হয়, কিভাবে তাদের মস্তিষ্ক 'ব্রেন ওয়াশড' হয়েছে প্যারাসাইটিক জিহাদি ধারণা দিয়ে। তারা রাজীবকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে 'ইনটেল গ্রুপ' গঠন করেছিল। এই দলের কাজ ছিল ব্লগ ও ফেসবুক থেকে তাঁর সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করা ও তাঁর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। আর রাজীবকে হত্যার জন্য তারা তৈরি করেছিল 'এক্সিকিউশন গ্রুপ'। প্রায় এক মাস তারা রাজীবকে

অনুসরণ করেছেন। দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইনটেল গ্রুপের সদস্যরা গত ৯ ফেব্রুয়ারি শাহবাগে যায় এবং ব্লগার রাজীবকে খোঁজা শুরু করে। এর এক থেকে দুই দিনের মধ্যে রাজীবের বন্ধুদের চিহ্নিত করার মাধ্যমে তারা রাজীবকে চিনতে পারে। এরপর এই দলের সদস্য এহসান রেজা রুম্মন শাহবাগ থেকে সাইকেলে করে রাজীবকে অনুসরণ করে মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বর পর্যন্ত গিয়ে বাসা চিহ্নিত করে আসে। ১৫ ফেব্রুয়ারি দলের সদস্যরা সাইকেল ও বাসে চড়ে বিকেল চারটার দিকে পলাশনগরে রাজীবদের বাসার গলিতে অবস্থান নেয়। সন্ধ্যার দিকে রাজীব বাসার গেটের কাছাকাছি পৌঁছার পর এক্সিকিউশন গ্রুপের সদস্য মো. ফয়সাল বিন নাঈম দীপ, মো. মাকসুদুল হাসান অনিক চাপাতি ও ছোরা দিয়ে হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয় এবং রাজীবকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে।

চিত্র : এভাবেই পড়ে ছিল রাজীব ওরফে থাবা বাবার লাশ

রাজীবের রক্তাক্ত লাশ মাটিতে পড়ে ছিল বহু সময় ধরে। পলাশনগর এলাকায় রক্তমাখা লাশ দেখে স্থানীয় লোকজন রাত ১০টার কিছু পরে থানা পুলিশকে খবর দেয়। এরপরেই ব্যাপারটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ধর্মের প্যারাসাইটিক ধারণাই কি দায়ী নয়?

রাজীবকে হত্যাকারীরা নিজেদের স্বীকারোক্তিতেই বলেছে যে, 'ঈমানী দায়িত্ব পালনের জন্য' রাজীবকে হত্যা করা হয়েছে। তারা যেভাবে কিংবা যে কারণে রাজীবকে হত্যা করেছে, সেটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়, এর সমর্থন খোদ ধর্মগ্রন্থেই আছে, আছে পয়গম্বরদের বিবিধ কাজকর্মে। বহু গবেষকই দেখিয়েছেন যে, ইসলামের সূচনাকালে মহানবী মুহাম্মদ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যেসব সহিংস পন্থা ব্যবহার করেছিলেন, গুপ্তহত্যা ছিল তার অন্যতম। আবু আফাক, কাব ইবনে আশরাফ, আসমা বিন্তে মারওয়ান, আবু রাফে প্রমুখেরা ছিলেন এর অন্যতম শিকার।

আবু আফাক ছিলেন আরবের এক বিখ্যাত বয়োবৃদ্ধ কবি। নবী মুহম্মদ আল-হারিথ নামে শত্রুপক্ষের একজনকে অন্যায়ভাবে হত্যার পর আবু আফাক এই কাজের সমালোচনা করে একটি কবিতা লিখেছিলেন। তার অন্য কিছু কবিতাতেও ইসলামের এবং নবীর সমালোচনা ছিল। মুহম্মদের অনুসারীরা যে ধর্মের নামে নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে, তা নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করেছিলেন। ব্যাপারটা নবীর কানে গেলে তিনি অতিশয় বিরক্ত হন, এবং এই কবিকে হত্যার দায়িত্ব দেন তার এক শিষ্যকে। সেলিম বিন উমায়ের নামের সেই শিষ্য গিয়ে গভীর রাতে ঘুমন্ত কবি আফাককে হত্যা করে আসে। ইবনে ইসহাকের 'দ্য লাইফ অব মুহম্মদ' বইয়ে এই ঘটনার বিবরণ আছে[55]। বর্ণনা আছে ইবনে সাদের তাবকাতেও[56]।

আসমা বিন্তে মারওয়ান নামের আরেক নারী কবি ছিলেন আরবে সেসময়। আবু আফাককে অন্যায়ভাবে হত্যার পর পাঁচ সন্তানের জননী এই আসমা ভীষণ ক্ষুব্ধ হন এবং এ নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। যথারীতি এটাও মুহম্মদের পছন্দ হয়নি। তিনি উমায়ের বিন আদি আল খাতমি নামের এক শিষ্যকে আদেশ দিলেন আসমাকে হত্যা করার। নবীর নির্দেশে সে রাতেই আসমার বাড়িতে গিয়ে তাকে হত্যা করে আসে উমায়ের। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আসমার ঘরে ঢোকার পর উমায়ের দেখতে পায় যে তার এক শিশুপুত্র তার বুকের উপর ঘুমিয়ে আছে। উমায়ের অতি সতর্কতার সাথে বাচ্চাটিকে আসমার বুকের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে এতো জোরে আসমার বুকে তলোয়ার চালিয়েছিল যে সেটা তার বুক ভেদ করে তার খাটের সাথে আটকে গিয়েছিল। পরদিন সকালে সে আসমার হত্যার কথা মহানবীকে জানালে,

[55] Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, p. 675

[56] ইবনে সাদ, কিতাব আল তাবকাত আল কবির, ভলিউয়ম ২, পৃঃ ৩১

মহানবী উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলেন, 'হে উমায়ের, তুমি আল্লাহ ও তার রসুলকে সাহায্য করেছো।' এই হত্যার জন্য কোন প্রতিফল বহন করতে হবে কিনা এ প্রশ্ন করলে মুহম্মদ উত্তরে বলেছিলেন, 'ঐ মহিলাকে কোন ছাগলেও পুছে দেখবে না'[57]।

কাব ইবনে আশরাফ নামের আরেক তরুণ কবির কথাও জানা যায় ইতিহাস থেকে। কাব ছিলেন একজন ইহুদী কবি ও মহানবীর প্রচারিত ধর্মের এক কঠোর সমালোচনাকারী। বানু নাদির গোত্রের নেতা ছিলেন তিনি। বানু কাইনুকা নামের আরেকটা ইহুদী গোত্রকে মুহম্মদ আক্রমণ করে নির্মমভাবে ধ্বংস করেছিলেন কিছুদিন আগেই। এ দেখে কাব প্রচণ্ডভাবে বিমর্ষ হন,ক্ষুব্ধ হন, এবং কবিতা লিখে মক্কাবাসীকে নবীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে উৎসাহিত করেন[58]। এর পর কি ঘটেছিল সেটা আল-বুখারীর একটি হাদিস থেকে জানা যায়[59]:

> "হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ কাব বিন আশরাফের ব্যাপারে কে আছো? কেননা সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি চান আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বিন মাসলামা আরও বললেন, কাবকে হত্যা করা সম্ভব, কিন্তু তা করার জন্য তাকে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে হবে। নবী কি সেই অনুমতি দেবেন? নবী তাতে অনুমতি দিলেন। তারপর এক রাতে মাসলামা কোন জরুরী বিষয়ে আলোচনার ছুতায় কাবকে তার বাড়ি থেকে বের করে আনার ফন্দি আঁটে। স্ত্রীর বারণ অগ্রাহ্য করে কাব রাস্তায় বেরিয়ে এলে মাসলামার সঙ্গে আসা লুক্কায়িত দুই সহযোগী বেরিয়ে এসে কাবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে।"

আবু রাফে বিন আবি আল হকাইক ছিলেন খাইবারে বসবাসকারী একজন ইহুদী নেতা, এবং বিখ্যাত ব্যবসায়ী। তিনি কবিতা লিখতেন এবং সেগুলোতে নবীর সমালোচনা থাকতো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি নাকি টাকা পয়সা দিয়েও সাহায্য করতেন। এ সমস্ত 'ইসলামবিরোধী' কাজের জন্য খুব সম্ভবত ৫ম হিজরী সনের যুলহজ্জ মাসে মহানবীর আবু রাফেকে হত্যা করা হয়। এই এই অভিযানে পাঁচজন সাহাবীর একটি দল অংশ নিয়েছিল বলে কথিত আছে; তারা হলেন (১) আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক,

---

[57] Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, p. 675-76

[58] Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, p. 665

[59] Sahih Bukhari 5:59:369 দ্রঃ। হাদিসটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত বোখারী শরীফে (ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫২৫) ৩৭৪২ নং হাদিস হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। একই হাদিস শাইখুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক সাহেব অনুদিত বোখারী শরীফে (৩য় খণ্ড, হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ, পৃঃ ২০০-২০১) ১৪৩৭ নং হাদিস হিসেবে সংকলিত হয়েছে।

(২)মাসউদ বিন সিনান, (৩) আব্দুল্লাহ বিন উনায়স, (৪) আবু কাতাদা বিন হারিস, (৫) খুযা'য়ী বিন আল আসওয়াদ (রাঃ)।

সহীহ আল বুখারির একটি হাদিসে আবু রাফেকে হত্যার বিবরণ পাওয়া যায়[60]:

> "হযরত বারা ইবনে আজেব রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের একটি দলকে ইহুদী আবু রাফে'কে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তাদের মধ্য থেকে একজন (আবু আতীক রাঃ) এগিয়ে গিয়ে ইহুদীদের দুর্গে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি গিয়ে তাদের পশুর আস্তাবলে প্রবেশ করলাম আর তারা দুর্গের প্রধান ফটক বন্ধ করে দিল। এদিকে তাদের একজনের একটি গাধা হারিয়ে গিয়েছিলো; তারা গাধাটি খুঁজতে বেরিয়ে পড়লে আমিও গাধা খোঁজার ভান ধরে তাদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। আমি তাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছিলাম যে আমিও তাদের সাথে গাধা খোঁজ করছি। অবশেষে গাধাটি পেয়ে গেলে তারা যখন দুর্গে প্রবেশ করে তখন আমিও তাদের সাথে আবার দুর্গে প্রবেশ করি।
>
> তারপর আমি লক্ষ করলাম যে তারা দুর্গের ফটক বন্ধ করে চাবিটি একটি কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিলো। অতঃপর তারা ঘুমিয়ে পড়লে আমি চাবি নিয়ে ফটক খুলে রেখে (অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে) আবু রাফে'র ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। আমি 'ও আবু রাফে' বলে ডাক দিলে সে আমার ডাকে সাড়া দিলো। আমি তার আওয়াজ দ্বারা তার অবস্থান অনুমান করে তরবারির আঘাত হানলাম, আর অমনি সে চিৎকার করে উঠলো; আর আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। যেন তার সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে এসেছে এমন ভান করে আমি আবার ঘরে প্রবেশ করে গলার স্বর পরিবর্তন করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ও আবু রাফে' (চিৎকার করলে কেন) তোমার কী হয়েছে?'
>
> সে বলল, 'তোমার মা ধ্বংস হোক (তাড়াতাড়ি আসছো না কেন) কি হল তোমার, কে যেন আমার ঘরে ঢুকে আমাকে আঘাত করেছে'। তিনি (আবু আতীক) বলেন, অতঃপর আমি আমার তরবারি তার পেটের উপর রেখে শরীরের সকল শক্তি দিয়ে এমন জোরে চেপে ধরলাম যে তার (মেরুদণ্ডের) হাড্ডি পর্যন্ত গিয়ে ঠেকার

---

[60] Sahih Bukhari 4:52:264 দ্রঃ। বাংলাদেশে মুদ্রিত বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে অনুদিত হাদিস গ্রন্থের হাদিসের ক্রমিক নম্বরে অনেক অমিল রয়েছে। যেমন আধুনিক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বোখারী শরীফে আবু রাফেকে হত্যা সংক্রান্ত এই একই হাদিস ২৮০০ নং হিসেবে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গ্রন্থে (পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৪০-২৪১) হাদিস নং ২৮১৩-২৮১৪ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। একই হাদিস আবার শাইখুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক সাহেব অনুদিত বোখারী শরীফে (৩য় খণ্ড, হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ, পৃঃ ২০১-২০৩) ১৪৩৮ নং হাদিস হিসেবে সংকলিত হয়েছে।

শব্দ হল। (এরপর তার চিৎকারে ও বাচ্চাদের কান্নাকাটির শব্দে অন্যরাও জেগে উঠে দরজা খুলতে লাগলো)।

অতঃপর আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে গিয়ে পড়ে গেলাম এবং এতে আমার পায়ে প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। যাই হোক, কোন মতে আমি বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গীদের সাথে মিলিত হলাম। আমি তাদেরকে বললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি (আবু রাফে'র) মৃত্যু সংবাদ প্রচারকারীর ঘোষণা শুনতে না পাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এ স্থান ত্যাগ করবো না। সত্যিই হিজাযের বিখ্যাত ব্যবসায়ী আবুরাফে'র মৃত্যু সংবাদ না শুনে আমি সে স্থান ত্যাগ করলাম না। মৃত্যু সংবাদ যখন আমি শুনলাম তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং আমার যেন কোন ব্যথাই ছিলো না। অবশেষে আমি আল্লাহর রসূলের কাছে গিয়ে আবু রাফে'কে হত্যার খবর দিলাম"।

মহানবী কেবল এই চার কবিকেই নয়, আরো অনেককেই বিভিন্ন সময় গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন যেগুলো কখনো সফল হয়েছিল, কখনো বা ব্যর্থ। যেমন, ওহুদ যুদ্ধের পর পরই মক্কার নেতা আবু সুফিয়ানকে হত্যার জন্য তিনি কিছু সহযোগী পাঠিয়েছিলেন। যদিও তারা ব্যর্থ হয়েছিল এ কাজে, কিন্তু অন্য তিনজন কোরাইশকে গুপ্ত হত্যা করে এসেছিল সে দিন[61]। নবী তার সমালোচনাকারীদের এভাবে গুপ্তহত্যার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নিয়ম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বলবত রেখেছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় মহানবীর মৃত্যুর এমনকি একদিন আগেও আইহালা ইবনে কাব ('আল-আসওয়াদ' বা 'কালো মানুষ' নামে মুসলিম মধ্যে পরিচিত ছিলেন) নামক এক ইয়েমেনি প্রতিপক্ষকে মুহম্মদের আদেশে হত্যা করা হয়েছিল[62]। উইকিইসলাম সাইটে এমন চল্লিশ জনের একটি তালিকা আছে, যাদেরকে হত্যার জন্য নবী মুহম্মদ কখনো না কখনো নির্দেশ দিয়েছিলেন, নিজের ক্ষমতার মসনদ সুরক্ষিত রাখার জন্য[63]।

মুহম্মদের পরবর্তীকালের অনুসারীরা মুহম্মদের প্রদর্শিত কাজগুলোই ভাইরাসের মত কপি করে করে একনিষ্ঠভাবে পালন করেছেন বিভিন্ন সময়ে। 'স্যাটানিক ভার্সেস' লেখার অপরাধে সালমান রুশদীকে হত্যার ফতোয়া দেয়া হয়েছিল খোমেনির পক্ষ থেকে ১৯৮৯ সালে। কয়েক বছর আগে আগে ডাচ চলচ্চিত্রকার থিও ভ্যানগগকে ও একইভাবে হত্যা করা হয় 'ইসলামকে অপমান' করার অজুহাতে। বাংলাদেশে থাবা বাবার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে বলে আমি মনে করি। এক্ষেত্রে মূল অভিযোগ

---

[61] History of Al-Tabari, Vol. 7, p. 147, Ibn Ishaq, p. 673-674

[62] Syed Amir Ali, The Spirit of Islam, p. 217; Benjamin Walker, p. 319

[63] List of Killings Ordered or Supported by Muhammad, http://wikiislam.net/wiki/List_of_Killings_Ordered_or_Supported_by_Muhammad

ছিল অবশ্যই তার ইসলামবিদ্বেষী লেখালিখির। 'নুরানী চাপা' নামের একটি ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগসাইটকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল রাজীবের ইসলামবিদ্বেষিতার প্রমাণ হিসেবে। যদিও বিতর্ক করা যেতে পারে থাবা বাবার লেখাগুলোর মান নিয়ে, এমনকি এই 'নুরানী চাপা' সত্যই রাজীবের কিনা সেটা নিয়েও বিতর্ক আছে[64], তারপরেও অভিযোগগুলো যদি সত্যি বলেও ধরে নেই, কেবল লেখার কারণে যেভাবে রাজীবকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে, তা বোধ হয় রূপকথাকেও হার মানায়। নবী মুহম্মদের আমলে 'ইসলামবিদ্বেষী' আবু রাফেকে হত্যার জন্য যেভাবে পাঁচজন সাহাবীর একটি দল গুপ্ত হত্যায় অংশ নিয়েছিল মুহম্মদের নির্দেশে, একই কায়দায় মুফতি জসিমের নির্দেশে সাতজনের দল গঠন করে থাবা বাবাকে পল্লবী থানার পলাশনগরের বাড়ির সামনে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল ২০১৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি। যারা এই অভূতপূর্ব সাদৃশ্য দেখেও না দেখার বা বোঝার ভান করেন, তারা হয় 'বোকার স্বর্গে' বাস করছেন, নয়তো নিজেদেরকেই প্রতারিত করে চলেছেন অহর্নিশি।

রাজীবের এই ঘটনা নতুন করে আমাদের কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন করে দিয়েছে। পরিষ্কার করে দিয়েছে এই জিহাদি ভাইরাসের প্রকটতা। আমার মনে আছে, রাজীব হত্যার পর পরই আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের পক্ষ থেকে একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। সে ভিডিওতে খুব স্পষ্ট করেই বলা হয়েছিল, নবী মুহম্মদ যেভাবে কাব ইবনে আশরাফ, আসমা বিন্তে মারওয়ানের মত কবিদের হত্যা করেছিলেন ইসলামের আর নবীর বিষেদগার করার শাস্তি হিসেবে, ঠিক একইভাবে 'কুলাঙ্গার ব্লোগার' (ঠিক এভাবেই উচ্চারিত হয়েছে ভিডিওতে) থাবা বাবাকে মেরে ফেলাও জায়েজ হয়েছে। ভিডিওটি শেষ করা হয়েছিল এই বলে যে রাজীব হত্যায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের সৈনিকেরা অন্য সকল 'নাস্তিক ব্লগার'দেরও হত্যা করুক, এটাই প্রত্যাশিত। বহু মানুষই সেই ভিডিওর লিঙ্ক তখন দেখেছিল। এখনো অনেক জায়গাতেই সেটা বহাল তবিয়তেই আছে। হয়তো সংক্রমিত করছে নাফিস কিংবা রাজীব হত্যার সাথে জড়িত নর্থ সাউথের ছাত্রদের মতোই অন্য কাউকে। এই জিহাদি ভাইরাস জলাতঙ্ক রোগীর মতো মস্তিষ্ককে অধিকার করে ফেলছে ক্রমশ। জিন বা বংশাণুর মতোই কপি করে করে সংক্রমিত করে ফেলছে শতাধিক, সহস্রাধিক মননকে। বহু অসুস্থ ভাইরাসাক্রান্ত মনন এভাবেই শাহবাগ কিংবা বিভিন্ন জায়গায় ওত পেতে বসে আছে গুপ্তহত্যার জন্য। এ ভাইরাস প্রতিরোধ না করতে পারলে এ 'সভ্যতার ক্যান্সারে' রূপ নিয়ে আমাদের সমস্ত অর্জনকে ধ্বংস করবে বলাই বাহুল্য। তাই এই ভাইরাস সম্বন্ধে সচেতন থাকাটা জরুরী।

---

[64] এ প্রসঙ্গে দেখুন বিডিনিউজে প্রকাশিত ২৫শে ফেব্রুয়ারির রিপোর্ট, 'নূরানী চাপা সমগ্র' রাজীবের নয়, এহেছান লেনিন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম; কিছু ধর্মীয় সাইটে আবার এই বক্তব্যের খণ্ডন আছে।

তৃ তী য় অ ধ্যা য়
ব্লগার গ্রেফতার: ভাইরাসাক্রান্ত বাংলাদেশ

উপরের ছবিটির দিকে একবার তাকান। কেমন লাগছে? আপনার যদি মূল ঘটনা জানা না থাকে, অনেকদিন পর এসে কম্পিউটার খুলে পেপারে প্রকাশিত ছবিটি দেখেন, হয়তো ভাববেন কোন চোর ছ্যাঁচোর গুণ্ডা বদমায়েশ কিংবা কোন কুখ্যাত চোরাকারবারি বমাল সমেত ধরা পড়েছে। সীমান্তে চোরাকারবারিরা অবৈধ মাল নিয়ে ধরা পড়লে কিংবা কোন ফেন্সিডিল ব্যবসায়ী শ'খানেক বোতলের চালান সহ 'ধরা খেলে' যেমন ছবি ছাপায়, টেবিলে রাখা থাকে চোরাই মালমসলা আর তার পেছনে গুণধর অপরাধীরা সব লাইন ধরে দাঁড়ানো; আর তার পাশে বীর-দর্পে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো আমাদের গর্বিত পুলিশ বাহিনী। অবিকল সেই ধরণের ছবি।

কিন্তু আপনি অবাক হয়ে যাবেন যদি শোনেন এরা কোন চোরাকারবারি নন। এরা কৃতবিদ্য লেখক। অনলাইন কমিউনিটিতে লেখেন, যাদের আমরা 'ব্লগার' বলি। আর তাদের সামনে টেবিলে যা রাখা সেটা ফেন্সিডিলের বোতলও নয়, নয় কোন মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র, কিংবা কোন চোরাই মাল। টেবিলে রাখা তাদের কম্পিউটার, আর ল্যাপটপগুলো। কি বিশাল প্রাপ্তি পুলিশের! ঘটনাক্রমে দিনটা ছিল ২০১৩ সালের পয়লা এপ্রিল। এদিন বাংলা ব্লগের পরিচিত চারজন ব্লগারকে যেভাবে পাকড়াও করা হয়েছে যেভাবে তাঁদের চোরের মত সাজিয়ে মিডিয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে তা ছিল ভয়াবহ রকমের দুঃস্বপ্ন। সেই দুঃস্বপ্ন কোন 'এপ্রিল ফুল'-এর তামাসা ছিল না, ছিল রূঢ় বাস্তবতা।

অবশ্য এমনি এমনি তাদের গ্রেফতার করা হয়নি। গ্রেফতারের একদিন আগে, বাংলাদেশের সকল সংবাদপত্রে ' ৮৪ ব্লগারের তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যার ভাষ্য ছিল এরকমের:

ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তি

৮৪ ব্লগারের তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নতুন বার্তা ডটকম

ঢাকা: ইসলাম ধর্ম ও মহানবী হজরত মোহাম্মদ সা. সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যকারী ব্লগার ও ফেসবুক ব্যবহারকারীদের মধ্যে নয়টি ব্লগের ৮৪ জনের তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কটূক্তিকারীদের শনাক্তে গঠিত নয় সদস্যের কমিটির সঙ্গে দেশের আলেম সমাজের বৈঠকে এ তালিকা হস্তান্তর করা হয়।

কমিটির সভাপতি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাইনউদ্দিন খন্দকার সাংবাদিকদের জানান, "অভিযোগ জানানোর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি ইমেইল (complainmoha@gmail.com) অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

তিনি জানান, ইসলাম ধর্ম ও মহানবী সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যকারীদের সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ চাওয়া হয়েছে আলেম সমাজের কাছে। ইতিমধ্যে এই কমিটির কাছে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে। এগুলো দ্রুত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে পাঠানো হবে অনুসন্ধানের জন্য। পরবর্তী সময়ে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়া হবে।

তিনি বলেন, "নতুন খোলা ইমেইলে যে কেউ নির্দিষ্ট অভিযোগ জানাতে পারবেন। পাশাপাশি লেখাটিও এখানে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে

১লা এপ্রিল 'আমার দেশ' পত্রিকার রিপোর্টার এম এ নোমান একটি রিপোর্ট লেখেন 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ধর্মবিদ্বেষী ৮৪ ব্লগারের নথি জমা : ব্লগারদের মুখোশ উন্মোচনকারী পত্রিকাগুলোকে ধন্যবাদ' শিরোনামে, যেখানে তিনি উল্লেখ করেন[65]:

'তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামবিদ্বেষী ৮৪ ব্লগারকে চিহ্নিত করে ছবিসহ তাদের নাম-ঠিকানা ও ব্লগের বিবরণ এবং আপত্তিকর মন্তব্যগুলোর প্রিন্ট কপিও আলেমদের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরূপ কপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আইন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেয়া হয়।'

ঘটনাবহুল এ সময়গুলোতে, বিএনপি জামাতের মুখপত্র এবং মৌলবাদী গোষ্ঠীর প্রিয় পত্রিকা 'আমার দেশ' মুক্তমনা সাইটের নামে নতুন করে বিষেদগার শুরু করা শুরু করে। অবশ্য আমার দেশ এটা না করলেই আমি বরং অবাক হতাম। ভাবতাম, মুক্তমনার প্রভাব তাহলে এখনো জনসাধারণের মধ্যে পৌছয়নি। মাহমুদুর রহমানের তুর্কি নাচ দেখে বুঝলাম জায়গা মতোই আঘাত করা হয়েছে। 'সরকার ও দেশবাসীর প্রতি শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফীর খোলা চিঠি' শিরোনামের একটি লেখা

---

[65] এমএ নোমান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ধর্মবিদ্বেষী ৮৪ ব্লগারের নথি জমা : ব্লগারদের মুখোশ উন্মোচনকারী পত্রিকাগুলোকে ধন্যবাদ, আমার দেশ, ১ এপ্রিল ২০১৩

প্রকাশ করে আমার দেশ, যেখানে ভেতরের দিকে 'অন্তরালে ইসলাম অবমাননাকারী অনলাইন চক্র' অনুচ্ছেদ যোগ করে ধর্মান্ধদের খেপিয়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। আধাপাতার দুই প্যারাগ্রাফের প্রতিটি লাইন মুক্তমনার প্রতি নৈবদ্য আকারে খিস্তি আকারে প্রকাশ করে আমার দেশের প্রতিবেদক। যদিও 'নির্ভীক প্রতিবেদক' নিজের নামটি প্রকাশ করেননি সেই প্রতিবেদনে। আমরা ধরে নিতে পারি, নামহীন এই 'গরলামৃত' নীলকণ্ঠী মাহমুদুর রহমানেরই কণ্ঠনির্গত:

আমার দেশ

স্বাধীনতার কথা বলে

সরকার ও দেশবাসীর প্রতি শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফীর খোলা চিঠি

সরকার ও দেশবাসীর প্রতি শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফীর

খোলা চিঠি

শাহবাগে ইসলাম বিদ্বেষের প্রতিবাদে গর্জে উঠুন

সরকার ও দেশবাসীর প্রতি শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফীর খোলা চিঠি

আওয়ামীলীগ সরকার কার্যত তখন 'আমার দেশ' নামক প্রপাগাণ্ডামূলক পত্রিকা থেকে সংক্রমিত ভাইরাসের শিকার হল। ভাইরাস প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করে

'অ্যান্টিভাইরাস'কেই ভাইরাস হিসেবে চিহ্নিত করলো। এর ফলে গ্রেফতার হলেন মননশীল মুক্তচিন্তার ব্লগারেরা।

তবে, 'আমার দেশ' এই ব্লগারদের নিয়ে যত মিথ্যাচার করুক না কেন, ব্লগারেরা কোন অপরাধী ছিলেন না। তারা বরং সমাজ-সচেতন লেখক। তাদের জ্ঞানগর্ভ লেখা বরং আমার মত ছাপোষা পাঠকেরাও মন দিয়ে পড়ে, তাদের যুক্তি-বুদ্ধিতে নিজেকে শানিত করে তুলে। আমি তাদের লেখালিখির মধ্যে খুঁজে পাই জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত। সুব্রত শুভ নামের যে ছেলেটিকে ধরা হয়েছে তার লেখালিখির সাথে আমি খুব ভালভাবেই পরিচিত ছিলাম। কিছুদিন আগে নিজে থেকেই মুক্তমনায় লিখবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। তার প্রথম পোস্টটিই ছিল মুক্তিযোদ্ধা 'শহিদুল হক মামা' কে নিয়ে। সুব্রতের লেখা থেকেই আমি জেনেছি কাদের মোল্লার বিচারের অন্যতম প্রধান সাক্ষী শহিদুল হক মামা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন; গেরিলা বাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন সে সময়। মিরপুরে কাদের মোল্লা ও বিহারীদের নির্মম ধ্বংসলীলা তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। এছাড়াও তিনি ৬৬-তে ছয় দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে সরাসরি জড়িত ছিলেন। লেখাটা পড়ার আগে উনার কাজের সাথে পরিচয়ই ছিল না আমার। সুব্রত আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল জ্ঞানে গুনে কত ক্ষুদ্র আমি, শহিদুল হক মামার নামই আমি আগে শুনিনি। তার লেখা থেকেই জেনেছিলাম, সুইডেন নিবাসী অকুতোভয় এই বীর মুক্তিযোদ্ধা কিভাবে কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে দেশে চলে এসেছিলেন। প্রথম রায়ে উপযুক্ত শাস্তি না হওয়ায় বেদনাহত কণ্ঠে বলেছিলেন – 'বুক ভরা আসা নিয়ে সুইডেন থেকে আসছিলাম। অন্তত আমি ন্যায় বিচার পাব। যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, গণহত্যা করেছে তাদের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার পাব আদালত থেকে। ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। আমার অভিযোগ হচ্ছে রায়ের বিরুদ্ধে।' সুব্রত শুধু শহিদুল হক মামাকে নিয়েই লিখেনি। তার আরো দুটো গুরুত্বপূর্ণ পোস্টের কথা মনে পড়ছে – 'মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধশিশু প্রসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর কিছু কথা।' এবং অন্যটি – '১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ সম্পর্কে দৈনিক সংগ্রাম-এর ভূমিকা।' পোস্টগুলোর শিরোনাম দেখেই নিশ্চয় পাঠকেরা অনুমান করতে পারছেন কি অপরিসীম ভালবাসা ছেলেটি বুকে ধারণ করে দেশের জন্য, মুক্তিযুদ্ধের জন্য। বলতে দ্বিধা নেই এদের মত দৃপ্ত তরুণদের জন্যই শাহবাগের গণজাগরণ সম্ভব হয়েছে। মানুষ পেয়েছে হারানো শক্তি, উদ্যম। নতুন আশায় বুক বেঁধেছে পরবর্তী রায়ের জন্য।

অথচ মুক্তিযুদ্ধের সার্বক্ষণিক কর্মী এ ছেলেটাকে 'নাস্তিক' সাব্যস্ত করে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হল। গ্রেপ্তারের খবর পাবার পর মুক্তমনায় তার পোস্টগুলো আবারো পড়লাম খুঁটিয়ে। দেখলাম তার একটা লেখাও নাস্তিকতার উপরে নয়। একটি লেখা আছে বটে বিখ্যাত এক নাস্তিক বিজ্ঞানীকে নিয়ে। লেখাটির শিরোনাম – 'রিচার্ড

ডকিন্স'এর প্রতি ভালোবাসা'। হ্যাঁ রিচার্ড ডকিন্স ব্যক্তি জীবনে নাস্তিক ঠিকই, কিন্তু নাস্তিকতার চেয়েও বড় যে ব্যাপারটি সেটা হল তিনি পৃথিবীর অন্যতম সেরা জীববিজ্ঞানী। যার লেখার যাদুতে, বৈজ্ঞানিক যুক্তির স্ফুরণে বিমোহিত হননি, এমন পাঠক পাওয়া দুর্লভ। তার 'সেলফিশ জিন' বইটিকে আমি এ শতকের অন্যতম সেরা বইয়ের তালিকায় রাখব চোখ বন্ধ করেই। এহেন ব্যক্তির কাজের জন্য কেউ ভালবাসা প্রকাশ করতেই পারেন। আমিও করেছি বহুবারই। ডকিন্সের শেষ বই 'ম্যাজিক অব রিয়ালিটি' ছিল আমার জন্য অনাবিল এক আনন্দের উৎস। যেভাবে আমি আপ্লুত হই হুমায়ুন আজাদের 'সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে', কিংবা 'বাঙলাদেশের কথা' আবৃত্তি করে, ঠিক তেমনই আপ্লুত হয়ে উঠি রিচার্ড ডকিন্সকে পড়তে পেরে। এই জ্ঞানের আনন্দকে কি আস্তিকতা, নাস্তিকতা দিয়ে মাপা যায়, না উচিৎ? একজন দক্ষ পিয়ানো বাদক যেমন আমাদের আপ্লুত করতে পারেন তার দক্ষ হাতের যাদুতে, একজন কবি যেমন আমাদের আপ্লুত করতে পারেন কাব্যের মূর্ছনায়, তেমনি ডকিন্স আমাদের অভিভূত করেছেন ক্ষুরধার বৈজ্ঞানিক যুক্তি আর লেখনীর মাধ্যমে। এই আনন্দে কেবল আমি আপনি নন, আপ্লুত হতেন স্বয়ং আইনস্টাইনও। ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারনাকে পরিত্যাগ করেও তিনি মহাবিশ্বের রহস্য অনুসন্ধান করে রোমাঞ্চিত হতেন ছোট বাচ্চাদের মতোই। বলতেন, 'আমি ব্যক্তি ঈশ্বরের কল্পনা করতে চাইনা; আমরা আমাদের অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় যে মহাবিশ্বের গড়ন এখন পর্যন্ত সম্যক বুঝতে পেরেছি এতেই শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ভয়ে আমরা আপ্লুত'। কী কাব্যিক একটি লাইন। এই উপমার আঘাতে উতলা হয়ে যাবে আস্তিক-নাস্তিক সবাই। কিন্তু সরকার বাহাদুর সেসময় পণ করেছিলেন জ্ঞানার্জনের এই আনন্দটা মাটি না করে ছাড়বেন না।

শুভর পাশাপাশি রাসেলের সম্বন্ধেও জেনেছিলাম সে সময়। সুলেখক আরিফ জেবতিক একটি পেপারে চমৎকার একটি লেখা লিখেছিলেন একটি পত্রিকায়– 'একমাত্র বিকল্প ভালো মানুষদের সক্রিয়তা' শিরোনামে। সে লেখায় রাসেল পারভেজকে নিয়ে তিনি যা বলেছেন, তা পড়ে যে কারোই মনে হবে, কী দরকার ছিল আমাদের এ পোড়া দেশ নিয়ে চিন্তা করার। আরিফ জেবতিক লিখেছেন, 'রাসেল পারভেজ আর তাঁর স্ত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের এই দুই মেধাবী শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকা গিয়েছিলেন। লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে তাঁরা চাইলেই বিদেশে থেকে যেতে পারতেন, নিশ্চিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আর জীবনযাত্রা উপভোগ করে খুব সহজেই ফেলে আসা স্বদেশকে দুটো গালি দিয়ে আর করুণার চোখে তাকিয়ে তাঁরা জীবন পার করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের হৃদয়ে ছিল বাংলাদেশ। এই দেশটা এমনভাবে তাঁদের হৃদয়ে গেঁথে ছিল যে যখন স্ত্রীর পিএইচডি শেষ হতে দেরি হচ্ছে তখন রাসেল তাঁর নিজের দুই বছরের শিশুকে নিয়ে একাই বাংলাদেশে চলে এসেছেন, স্ত্রীর লেখাপড়া শেষ করতে আরো কয়েক বছর লেগেছে, এই সময় রাসেল তাঁর শিশুপুত্রকে বাংলাদেশ

দেখাবেন বলে ঘাড়ে করে নিয়ে বইমেলায় ঘুরেছেন, শহীদ মিনারে গিয়েছেন, রমনার বটমূলে গান শুনেছেন। কর্পোরেট উচ্চ বেতনের হাতছানি উপেক্ষা করে বাচ্চাদেরকে বিজ্ঞান শেখানোর ব্রত নিয়ে রাসেল পারভেজ স্কুলমাস্টার হয়েছেন। রাসেলের স্ত্রীও দেশে ফিরে এসে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন শিক্ষকতা। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশ, ঘাতক জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে অনলাইন প্রচারণায় রাসেল পারভেজ সবসময়ই উচ্চকণ্ঠ ছিলেন।' আর এ ছেলেটাকে দাগী আসামীর মতো দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তার অপরাধ 'নাস্তিকতা'। একইভাবে দাঁড় করানো হয়েছে মশিউর রহমান বিপ্লবকেও, যার স্ট্যাটাসগুলোতে থাকত অদম্য সাহসের ছাপ।

এর পরদিন ধরা হল আসিফ মহিউদ্দীনকে। ২০১৩ সালটা যেন আসিফের জন্য ছিল বিভীষিকা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে ব্লগ লিখে সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, তাকে ডিবি অফিসে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। করা হয়েছে নানা ধরণের হেনস্থা। এ অবস্থা পার হতে না হতেই কিছুদিন পরে হয়েছেন মৌলবাদীদের আক্রোশের শিকার। ফিরে এসে লেখালিখি শুরু করতে না করতেই তার ব্লগ বিটিআরসির চিঠির মাধ্যমে চাপ দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হল। আর তারপর করা হল ইসলামবিদ্বেষী লেখালিখির দায়ে গ্রেপ্তার। এ ছেলেটাকে যত দেখেছি তত অবাক হয়েছি। শেষ সময় পর্যন্ত রাষ্ট্র শক্তির বিপক্ষে যুদ্ধ করে গেছে শিরদাঁড়া সোজা করে। এমনকি গ্রেপ্তারের আগের দিনও তিনজন ব্লগারকে হেনস্থা করা নিয়ে স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন এভাবে – 'সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের উইচ হান্টের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সে সময়ে খ্রিষ্টান ধর্মীয় মৌলবাদ এবং রাষ্ট্র সমার্থক ছিল; যে সকল নারী সমাজের পুরুষদের চাইতে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, দর্শনে এগিয়ে যেত, তাদেরকে ডাইনি আখ্যা দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতো ধর্মরক্ষক সরকার এবং খ্রিষ্টান মৌলবাদীরা। মৌলবাদের জন্য নারী শিক্ষা এবং নারী প্রগতি সর্বদাই বিপদজনক, তাই সরকার এবং চার্চ মিলে মিশেই প্রগতিশীল নারীদের জীবন্ত জ্বালিয়ে চারপাশে দাঁড়িয়ে আনন্দ করত। ঠিক একই অবস্থা আজ এই স্বাধীন বাংলাদেশে! যে সমস্ত তরুণ জ্ঞানে বিজ্ঞানে দর্শনে প্রগতি চিন্তায় এগিয়ে, যারা প্রচলিত প্রথা এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্বাধীন মত প্রকাশ করছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ-ধর্মনিরপেক্ষতা-সাম্যবাদ-বাক স্বাধীনতার পক্ষে লিখে যাচ্ছিলেন, তাদের এবার উইচ হান্টের মতই পুড়িয়ে মারা হবে। বহুদিন ধরেই সরকারের এই ছদ্মপ্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে কথা বলে সরকার সমর্থক ব্লগারের গালি খেয়েছি আমি। আজকে তারা কে কোথায় তা খুব জানতে ইচ্ছা করছে। তারা ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল সরকারের এহেন ধর্মের রক্ষকের ভূমিকায়, জামাতে ইসলামি এবং হেফাজতে ইসলামির সাথে ধর্মপ্রেমের প্রতিযোগিতায় নামায় কতটা আনন্দিত, তা দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।'

আসিফ মাথা উঁচু করেই জেলে গেছেন, আর করে গেছেন নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্র আর তার সুবিধালেহনকারীদের গালে সজোরে চপেটাঘাত।

আমি একটা লেখা লিখেছিলাম বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম-এ 'ব্লগারদের বাকস্বাধীনতায় চাই না হস্তক্ষেপ' শিরোনামে[66]। ২০১৩ সালের ২৩ শে মার্চ অন লাইন পত্রিকায় প্রকাশিত সেই লেখাটিতে বলেছিলাম –

'ফেসবুকে এখনো বাঁশের কেল্লা আর নিউ বাঁশের কেল্লার মতো সাইট উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের এই সাম্প্রদায়িক উস্কানির বলি হয়ে নির্যাতিত হয়েছেন শত শত সংখ্যালঘু পরিবার। ধর্ষিতা হয়েছেন, গুম খুন হয়েছেন। রেল লাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে, হয়েছে হাজার হাজার বৃক্ষ কর্তন। চাঁদে সাইদীর মিথ্যা ছবি প্রচার করে গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষকে সম্মোহিত করার প্রচেষ্টা করেছে। তাদের সাইট বন্ধ হয়নি, বন্ধ করা যায়নি তাদের কর্মকাণ্ড। আর বাঁশের কেল্লাই বা বলি কেন? বাঁশের কেল্লার চেয়েও উগ্র সাইট বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে যাচ্ছে। মাহমুদুর রহমানের আমার দেশ এবং নয়া দিগন্তের মত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে মিথ্যার কুৎসিত বেসাতি দিনের পর দিন। একে তাকে নাস্তিক আখ্যা দেয়া হয়েছে, মৃত ব্লগারের ব্যক্তিজীবন নিয়ে টানা হ্যাচড়া করা হয়েছে। অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত মোল্লা যাদের ব্লগ সম্বন্ধে কোন ধারনা নেই, তাদের দিয়ে উস্কানি দেয়া হয়েছে, চট্টগ্রামের মহাসমাবেশ পণ্ড করে দেয়া হয়েছে। সরকার সে সব বন্ধ করেনি। করতে পারেননি হিযবুত তাহরীরের মত উগ্রবাদী দলগুলোর প্রচারণাও। এই যে হিযবুত তাহরীরের সাইডকিক – 'আনসারউল্লাহ বাংলা টিম' নামের উগ্রপন্থী গ্রুপ যাদের কয়েকজন সদস্য রাজীব হত্যায় জড়িত ছিল, তাদের সাইটে গেলে যে কেউ দেখবে, বাংলা ভাষায় কিভাবে বোমা বানানোর নির্দেশিকা দেওয়া আছে, আছে নানা ধরণের উস্কানিমূলক বার্তা। 'রান্নাঘরে বসেই কিভাবে বোমা বানানো যায়'– এ ধরণের শিরোনামে নির্দেশিকা আছে; আছে নারীদের আত্মঘাতী হামলায় উদ্বুদ্ধ করার মতো পোস্ট –'ইমানদার বোনেদের দায়িত্ব কর্তব্য' শিরোনামে। রাজীবের হত্যাকারীদের 'বীর' হিসেবে উপাধি দেয়া হয়েছে এগুলো সাইটে। ভিডিও ছাড়া হয়েছে – 'চেরি পিকিং' করে ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্স কিংবা ধর্মপ্রচারকদের কর্মকাণ্ড দিয়েও রাজীব হত্যাকে বৈধতা দিতে চেয়েছেন এই সব উগ্র ধর্মান্ধরা। অথচ মাননীয় সরকারের চোখে এগুলো পড়ছে না। তারা খড়গ বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রগতিশীল কিছু ব্লগারদের যারা কাউকে চাপাতি দিয়ে কোপাননি, কাউকে উস্কানি দেননি, আক্রমণ করেননি; বরং আক্রান্ত হয়েছেন, যারা কুসংস্কার, ধর্মীয় উগ্রতা আর ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। যেখানে সাধারণ মানুষ ছাব্বিশে মার্চের মধ্যে জামাত শিবিরকে নিষিদ্ধ দল হিসেবে দেখতে চেয়েছিল, তাদের নিষিদ্ধ না করে নিষিদ্ধ করছেন ধর্মের প্রভাবমুক্ত প্রগতিশীল ব্লগারদের, যারা মূলত জামাত শিবির সহ সব মৌলবাদী দলগুলোর বিরুদ্ধেই সোচ্চার। 'সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!'

---

[66] অভিজিৎ রায়, ব্লগারদের বাকস্বাধীনতায় চাই না হস্তক্ষেপ, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ২৩ মার্চ, ২০১৩

আর তার চেয়েও বিচিত্র এবং নজিরবিহীন ব্যাপারটি হল – মিডিয়ার সামনে তিনজন ব্লগারকে যেভাবে দাগি আসামীর মত উপস্থাপন করা হল তার অভিনব পরিবেশনা। এর আগে কখনোই এটি দেখা যায়নি। কতটা নির্বোধ এবং নির্লজ্জ হলে এই কাজটি কেউ করাতে পারে, তা বোধগম্য হয় না। যেখানে সরকারের মধ্যেই থাকে শামীম ওসমানের মত ফুলেল চরিত্র, যেখানে সাগর রুনীদের হত্যাকারীদের, ত্বকীর হত্যাকারীদের খুঁজে পেতে গলদঘর্ম হতে হয়ে যায় পুলিশ আর দেশের দুঁদে গোয়েন্দারা, সেই তারাই আবার ক্যামেরার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ান বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাকারী লেখক এবং ব্লগারদের হাতকড়া পরাবার মতো ছবি তুলে বিধ্বংসী পোজ নিয়ে। সহ ব্লগার নিঝুম মজুমদার পরদিন তার স্ট্যাটাসে লিখেছিলেন,

"অপরাধীদের ধরলে যেমন অস্ত্র, গোলাবারুদ এগুলোর সামনে দাঁড় করিয়ে ডিবি ছবি তোলে, ঠিক তেমনি এই তিন ব্লগারকেও কিছু কম্পিউটারের সামনে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলা হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কয়েকজন মানুষ কম্পিউটার চুরি করে বাংলাদেশের দুর্দান্ত নব্য রক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা খেয়েছে। একজন ব্লগার হিসেবে আমি সিম্পলি লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলেছি এই ছবি দেখে।"

আমি নিশ্চিত এই লজ্জা নিঝুমের কেবল একা লাগেনি, লজ্জা আমাদের সবার। লেখালিখির সাথে জড়িত সকল ব্লগারেরই। সেই লজ্জা আর অপমান থেকে সেসময় ব্ল্যাক আউটে চলে গিয়েছিল আমার ব্লগ, সচলায়তন, মুক্তাঙ্গন, মুক্তমনা, নাগরিক ব্লগ, আমরা বন্ধু, চতুর্মাত্রিক, ক্যাডেট কলেজ ব্লগ, ইস্টিশন ব্লগ এবং সরব ব্লগ। সরকারের মৌলবাদ তোষণ এবং ব্লগার গ্রেফতারের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে শুরু হয়েছিল এ ব্ল্যাক আউট। কিন্তু লজ্জাটা যাদের লাগার কথা ছিল তারা শেষ পর্যন্ত বেহায়া আর নির্লজ্জই থেকে গেল। পরিতাপের বিষয় সেটিই।

আমাকে বিজ্ঞান লেখক হিসেবেই সবাই চেনেন, অন্তত যারা আমার লেখালিখির সাথে পরিচিত। কিন্তু ব্লগারদের গ্রেফতারের পর থেকে সে সময় অন্তত দুই মাস আমি একটাও বিজ্ঞানের লেখা লিখতে পারিনি, পারিনি অন্য কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে। যারা সে সময় আমার ফেসবুক স্ট্যাটাস দেখেছেন তারা জানেন সে সমস্ত স্ট্যাটাসে আমি একঘেয়েভাবে কেবল ব্লগারদের মুক্তির দাবীর কথাই বলে গিয়েছিলাম। আমার সব কিছু যেন হঠাৎ করেই কৃষ্ণগহ্বরে হারিয়ে গিয়েছিল, সময় গিয়েছিল থমকে দাঁড়িয়ে। ব্লগারদের মুক্তি না হলে আমি এই আঁধার থেকে বেরুতে পারতাম না।

সেসময় ভাবতাম, বাংলাদেশের অর্ধ-গোলার্ধ দূরে বসে আমি হতাশ্বাস ছাড়া কিই বা ফেলতে পারি। তারপরেই উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকেই বলতাম – বসে বসে হতাশ্বাস ফেলার চেয়ে যতটুকু পারি তো করার চেষ্টা তো করি। মনে পড়ে যায় হেলেন কেলারের বিখ্যাত উক্তিটা –

'I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can

do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do'.

['আমি একা, সর্বক্ষণই একা। আমি সব কিছু একা করতে পারি না। কিন্তু কিছু তো করতে পারি। আমি কখনোই সব কিছু করতে পারব না, কিন্তু তার মানে এই না যে, যা অল্প কিছু আমি করতে পারি, তা করা থেকেও আমি বিরত থাকব']।

বাংলাদেশের এই চারজন ব্লগারকে আন্তর্জাতিকভাবে কেউ চিনত না। আমি উদ্যোগী হয়ে তাদেরকে পরিচিত করার চেষ্টা করলাম। আন্তর্জাতিকভাবে কাউকে পরিচিত করাতে হলে তা ইংরেজিতেই করতে হবে। বাংলা লেখায় আমি যতটা স্বতঃস্ফূর্ত, ইংরেজিতে তা নই। তারপরেও আমি বুঝেছিলাম, আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি করতে হলে এই মুহূর্তে ইংরেজিতে লেখা ছাড়া গতি নেই। আমি নিজে লিখা শুরু করলাম। অন্যান্যদেরও বললাম। বিশেষ করে জার্মানিতে বসবাসরত মুক্তচিন্তক দম্পতি ফারজানা কবীর খান স্নিগ্ধা এবং ওমর ফারুক লুক্স ফেসবুকে এবং অন্যত্র জোরালো ভাষায় যেভাবে লেখালিখি শুরু করলেন, এবং অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করলেন, তা এক কথায় ছিল অনন্য। মুক্তমনা ব্লগার (অধুনা প্রয়াত) ড. জাফর উল্লাহ একটা চমৎকার লেখা লিখেছিলেন সে সময় 'Muzzling the voice of freethinking bloggers: An alarming development in Bangladesh' শিরোনামে[67]। মুক্তমনা থেকেও আমরা একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম – ''Bangladesh government squishing freedom of speech' বলে[68]। আমাদের স্টেটমেন্ট এবং প্রথমদিককার লেখাগুলোই ছিল আন্তর্জাতিক মিডিয়ার জন্য প্রাথমিক সূত্র। সেগুলো টুইটারে এবং ফেসবুকে অসংখ্যবার শেয়ার করা হয়েছিল। মুক্তমনায় আমরা ব্লগারদের মুক্তি চেয়ে ব্যানার করেছিলাম। খুব কম সময়ের মধ্যে চমৎকার কিছু ব্যানার তৈরি করে দিয়েছিলেন আসমা সুলতানা মিতা এবং কাজী মাহবুব হাসান।

আমাদের প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পৌঁছুতে দেরী হল না। 'ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিস্ট এন্ড এথিকাল ইউনিয়ন' (IHEU) আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তচিন্তক এবং মানবতাবাদীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন হিসেবে পরিচিত। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনটি যুক্তিবাদী, সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, নাস্তিক, মানবতাবাদী এবং মুক্তমনাদের জন্য একধরণের 'আম্ব্রেলা অর্গানাইজেশন' হিসেবে কাজ করে। তারা গ্রেফতারকৃত ব্লগারদের জন্য সাহায্যে এগিয়ে এলো। এপ্রিলের চার তারিখে দেওয়া প্রথম বিবৃতিতে

---

[67] A. H. Jaffor Ullah, Muzzling the voice of freethinking bloggers: An alarming development in Bangladesh!, Mukto-Mona, April 2, 2013

[68] A Statement from Mukto-Mona: Bangladesh government squishing freedom of speech by arresting and harassing young bloggers inside the country, Mukto-Mona, April 3, 2013

তারা খুব কঠোরভাবে বাংলাদেশ সরকারের সমালোচনা করলেন[69]। দীর্ঘ বিবৃতিতে তারা সুস্পষ্টভাবে বলেছে বর্তমান সরকার 'নাস্তিক' ব্লগারদের গ্রেপ্তার করে মৌলবাদীদের পাতা ফাঁদে হাঁটছে। আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সেটা তাদের সেই বিবৃতিতে প্রকাশ করেছিল এভাবে :

"Avijit Roy is a Bangladeshi freethinker, founder of Mukto-Mona, an online platform for freethinkers, rationalists, skeptics, atheists, and humanists of mainly Bengali and South Asian descent. The group includes authors, scientists, philosophers, and human rights activists from around the world, as well as at least two of the bloggers arrested in recent days. Roy told IHEU:

"In February and March this year Bangladesh saw a popular movement known as the Shahbag Movement or Protest. This was organized by bloggers and on social networks, demanding justice over crimes against humanity committed during the 1971 Bangladeesh Liberation War, in which Jamaat-e-Islam and its leaders were strongly implicated. A section of Islamists including Jamaat-e- Islam and Hifazat-e-Islam have since waged a disinformation campaign to brand the bloggers 'atheists' and 'blasphemers' and stir up anger and legal proceedings against them on that basis. With these arrests, the government is now trying to appease these Islamists.

"The government has made a list of bloggers and online forum participants who they labeled atheists and defamers of Islam. In an interview given to popular press, a spokesperson for the government has announced that the government will arrest and prosecute these "errant" bloggers. Although there is no law against atheism in Bangladesh, the government is persecuting these bloggers on charges of offending Islam and its Prophet.

Government thinks that if they put several freethinking bloggers in jail, it will keep the fundamentalists happy for time being. The government has taken this easy route to appease a handful of mullahs whose support they need to win the upcoming election".

মৌলবাদীদের বানানো ৮৪ জন ব্লগারের তালিকা সরকারীভাবে গ্রহণ এবং

[69] Arrests of "atheist bloggers" shows Bangladesh authorities are "walking into a trap set by fundamentalists", IHEU, 4 April, 2013

পত্রিকায় প্রকাশেরও সমালোচনা করল তারা। আই.এইচ.ই.ইউর প্রেসিডেন্ট তার বার্তায় উল্লেখ করেছেন, 'এই নাস্তিক ব্লগারদের বিরুদ্ধে সরকারী ধরপাকড় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।' আই.এইচ.ই.ইউ দ্বিতীয় আরেকটি স্টেটমেন্ট প্রদান করে এপ্রিল মাসের নয় তারিখে। 'Call to action: Defend the bloggers of Bangladesh' শিরোনামের এ বিবৃতিতে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের মুক্তচিন্তকদের উপর আগ্রাসন প্রতিরোধ করার আহবান জানিয়েছে সংগঠনের সদস্যদের।

এর পরে বহু বড় ঘটনাই ঘটেছে। এর মধ্যে সেন্টার ফর ইনকোয়েরি (CFI) এর পক্ষ থেকে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরিকে চিঠি লেখা হয়েছে। চিঠি লেখা হয়েছে বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূতকেও। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ জার্নালিস্ট (IFJ) ব্লগারদের মুক্তি চেয়ে বিবৃতি দিয়েছে। 'এথিস্ট অ্যালায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল' (AAI) ব্লগারদের তাৎক্ষণিক মুক্তি দাবী করেছে। এথিস্ট অ্যালায়েন্স-এর প্রেসিডেন্ট কার্লোস ডিয়াজ স্বাক্ষরিত বক্তব্যে তারা ব্লগারদের মুক্তির ব্যাপারে যে কোন সহায়তা করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে। তীব্র প্রতিবাদ এসেছে গ্লোবাল ভয়েস এডভোকেসি গ্রুপ থেকেও। প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং অ্যাক্টিভিস্ট পি জে মায়ার্স তার ব্লগে বাংলাদেশী মুক্তচিন্তকদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। ব্লগে বিবৃতি দিয়েছেন বিখ্যাত লেখিকা তসলিমা নাসরিন, মরিয়ম নামাজী প্রমুখ। সিএনএন, বিবিসি, হাফিংটনপোস্ট, স্লেট সহ বহু মিডিয়ায় মুক্তচিন্তকদের গ্রেফতারের ব্যাপারে সরকারের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ এবং পোস্ট এসেছে। ব্লগারদের মুক্তির দাবীতে পিটিশনও হয়েছে বেশ কিছু ব্যক্তি এবং সংঘের পক্ষ থেকে। এর মধ্যে 'আমেরিকান হিউম্যানিস্ট' আমেরিকার অ্যাম্বাসেডরকে পদক্ষেপ চেয়ার অনুরোধ জানিয়েছে তাদের পিটিশনে। প্রতিবাদ এবং কর্মসূচী এসেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল থেকেও। এই আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর অবদানের কথা উল্লেখ করে আমি ইংরেজি এবং বাংলায় বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখি।

এ সময় মাইকেল শারমার তার পত্রিকায় বাংলাদেশের ব্লগারদের নিয়ে একটি লেখা প্রকাশ করার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। যারা বিজ্ঞানমনস্কতা, সংশয়বাদ, যুক্তিবাদ নিয়ে কাজ করেন তারা সবাই মাইকেল শারমারকে এক নামে চেনেন। এই ভদ্রলোক আজ যুক্তি এবং শিক্ষার প্রসারে সারা বিশ্বের 'আইকন'। 'বিলিভিং ব্রেন', 'হোয়াই ডারউইন ম্যাটারস', 'দ্য সায়েন্স অব গুড এন্ড ইভিল' সহ একগাদা ভাল বই আছে তার, আর পাশাপাশি তিনি প্রকাশ করেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন 'স্কেপ্টিক' (Skeptic) নামে। এ ম্যাগাজিনটি অলৌকিকতা, কুসংস্কার এবং অপবিশ্বাসের বিপরীতে সোচ্চার কণ্ঠ। সেই স্কেপ্টিক ম্যাগাজিনের অনলাইন ভার্সন ইস্কেপ্টিকে আমার 'The Struggle of Bangladeshi Bloggers' প্রবন্ধটি শারমার 'ফিচার আর্টিকেল হিসেবে প্রকাশ করেন[70]। স্কেপ্টিকের মত সাইটে ফিচার আর্টিকেল হিসেবে লেখা প্রকাশিত

[70] The Struggle of Bangladeshi Bloggers, eSkeptic feature article, May 8th, 2013;

হওয়া নিঃসন্দেহে আনন্দের এবং গর্বের। কিন্তু তখনো আমার সহব্লগারেরা অন্যায়ভাবে জেলখানায় আটকে ছিল, তাই আমার মনে ছিল না কোন গর্ব, ছিল না কোন আনন্দ।

বিডিনিউজ পত্রিকায় সে সময় একটি লেখা লিখেছিলাম, 'মুক্তমতের প্রকাশ ও মুক্তবিশ্বের ভাবনা' শিরোনামে, যেখানে আভাস দিয়েছিলাম[71] –

'ধর্মদ্রোহিতার অজুহাতে আটক চারজন ব্লগারের মুক্তির দাবিতে আন্তর্জাতিক চাপ ক্রমশ বাড়ছে। হেফাজতে ইসলামসহ অন্যান্য মৌলবাদী দলের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সুব্রত অধিকারী শুভ, মশিউর রহমান বিপ্লব, রাসেল পারভেজ ও আসিফ মহিউদ্দীনকে যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে মতপ্রকাশের উপর আঘাত হিসেবেই দেখছেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার সংস্থা এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী বিভিন্ন সংগঠন। ...বহির্বিশ্বের মিডিয়া এবং সংবাদপত্রগুলোতেও বাংলাদেশের ব্যাপারে নেতিবাচক সংবাদ এসেছে ব্লগারদের উপর ধরপাকড় চালানোর পর। সিএনএন, বিবিসি, হাফিংটন পোস্ট, স্লেটসহ বহু মিডিয়ায় মুক্তচিন্তকদের গ্রেফতারের ব্যাপারে সরকারের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ এবং পোস্ট এসেছে। ব্লগারদের মুক্তির দাবিতে পিটিশনও হয়েছে বেশ কিছু ব্যক্তি এবং সংঘের পক্ষ থেকে। এর মধ্যে আমেরিকান হিউম্যানিস্ট আমেরিকার অ্যাম্বেসেডরকে পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে তাদের পিটিশনে। বোঝাই যাচ্ছে আন্তর্জাতিক চাপ ক্রমশ বাড়ছে।

অনেকেই ধারণা করছেন সরকার যদি এ ব্যাপারে তাদের অবস্থান পরিবর্তন না করেন,যদি ব্লগারদের বাকস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে তাদের মুক্তি না দেন, তবে তা বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তির জন্য শুভ ফলাফল বয়ে আনবে না।'

বাংলাদেশ থেকেও আমরা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সমর্থন পাচ্ছিলাম, বিশেষতঃ সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীদের তরফ থেকে। যেমন, ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে 'মুক্তচিন্তার পথ রুদ্ধ না করার' আহবান জানিয়েছিলেন দেশের ২০ বিশিষ্ট নাগরিক। তার মধ্যে আছেন, ড. সালাউদ্দিন আহমেদ, ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ড. আকবর আলি খান, অজয় রায়, কাইয়ূম চৌধুরী, রামেন্দু মজুমদার, ডা. সারওয়ার আলী, অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, রাশেদা কে চৌধুরী, খুশী কবীর, সুপ্রিয় চক্রবর্ত্তী, তারেক আলী, ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, এম এম আকাশ, ড. ইয়াসমিন হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান, শাহীন আনাম ও রোবায়েত ফেরদৌস। তারা বলেছেন, 'আপনারা সর্বজনের ধর্মানুভূতি রক্ষা করুন, তবে মুক্তচিন্তার পথ রুদ্ধ করবেন না। এর ফলে দেশে বিদেশে ভুল বার্তা পৌঁছুবে।' দেশের স্বনামখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা গ্রেফতারকৃত চার ব্লগারদের মুক্তি দাবী করেছিলেন সেসময়।

ISSN 1556-5696

[71] অভিজিৎ রায়, মুক্তমতের প্রকাশ ও মুক্তবিশ্বের ভাবনা, মতামত বিশ্লেষণ, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, এপ্রিল ২২, ২০১৩

পরদিন (এপ্রিল ৭, ২০১৩) আরো বলিষ্ঠভাবে ব্লগারদের মুক্তির দাবিতে অনুষ্ঠিত সংহতি সমাবেশে অভিমত দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ। 'মুক্তচিন্তার প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে সরকার' শিরোনামের সংবাদে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উঠে এসেছিল –

'ধর্মান্ধ মৌলবাদী হেফাজতে ইসলামের দাবির মুখে ব্লগারদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু যারা ধর্মের নামে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না সরকার। এর মাধ্যমে সরকার মুক্তচিন্তার প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুব্রত অধিকারী শুভসহ গ্রেপ্তার করা ব্লগারদের মুক্তির দাবিতে অনুষ্ঠিত সংহতি সমাবেশে এসব কথা বলেন বক্তারা।

আজ রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দের ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এ সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান বলেন, 'যারা ব্লগ সম্পর্কে জানে না, তারা ব্লগ নিয়ে কথা বলার অধিকার রাখে না। গ্রেপ্তারকৃতদের ব্লগার বলতে চাই না, তাঁদের লেখক বলতে চাই। প্রধানমন্ত্রী অবিলম্বে এদেরকে মুক্তি দিন।'

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক কাবেরী গায়েন বলেছিলেন, 'ব্যক্তিগত ব্লগ নিয়ে নিয়ে যারা গণমাধ্যমে প্রচার করে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিল, তাদের গ্রেপ্তার করা হলো না। গ্রেপ্তার করা হলো মুক্তচিন্তার মানুষকে। যারা হাজার হাজার মন্দির ভাঙছে, সহিংসতা চালাচ্ছে, বোমা মেরে মানুষ হত্যা করছে, তারা কি অন্য মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করছে না? রাষ্ট্র আসলে কার ধর্মানুভূতি রক্ষা করতে চায়?'

রাষ্ট্র আসলে কার ধর্মানুভূতি রক্ষা করতে চায় – এ প্রশ্নটা তো ছিল আমারো। এ ধরণের প্রশ্ন অনেক আগেই করেছেন হুমায়ুন আজাদ তাঁর বিখ্যাত 'ধর্মানুভূতির উপকথা' শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার অজস্র অনুভূতি দিনরাত আহত হয়; পত্রপত্রিকায় গ্রন্থে গ্রন্থে নিকৃষ্ট শিল্পকলাহীন কবিতার মতো ছোটো বড়ো পঙক্তির প্রাচুর্য দেখে আহত হয় আমার কাব্যানুভূতি, নিকৃষ্ট লঘু অপন্যাসের লোকপ্রিয়তা দেখে আঘাত পায় আমার উপন্যাসানুভূতি; রাজনীতিবিদদের অসততা ভণ্ডামোতে আহত হয় আমার রাজনীতিকানুভূতি; এবং আমার এমন অজস্র অনুভূতি নিরন্তর আহত রক্তাক্ত হয়, আমি ওগুলোর কোনো চিকিৎসা জানি না, ওগুলো নিয়ে আমি কোন জঙ্গলে কোন রাস্তায় চিৎকার করবো, তাও জানি না। রাষ্ট্র এগুলোকে অনাহত রাখার কোনো ব্যবস্থা করে নি, রাষ্ট্রের মনেই পড়ে নি এগুলোর কথা। রাষ্ট্রের কি দায়িত্ব নয় আমার এসব অমূল্য অনুভূতিকে অনাহত রাখার সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেয়া? সবাই বলবে এটা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে তাকে খুলতে হবে একটি বিকট 'অনুভূতি মন্ত্রণালয়', যার কাজ হবে কোটি কোটি মানুষের কোটি কোটি অনুভূতির হিশেব নেয়া, সেগুলোর আহত হওয়ার সূত্র বের করা, এবং সেগুলোকে সব ধরণের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা।

আমার শিল্পানুভূতি, সৌন্দর্যানুভূত্ রাজনীতিকানুভূতি, কাব্যানুভূতি প্রভৃতি পাহারা দেয়া রাষ্ট্রের কাজ নয়; কিন্তু এখন রাষ্ট্র এক উদ্ভট দায়িত্ব নিয়েছে, মনে করছে ধর্মানুভূতি পাহারা দেয়া তার কাজ; তাই রাষ্ট্র দেখে চলছে কোথায় আহত হচ্ছে কার ধর্মানুভূতি।'

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা যখন 'ধর্মানুভূতি' রক্ষায় ব্যস্ত, এ সময় সেন্টার ফর ইনকোয়েরির পাবলিক পলিসি বিভাগের ডিরেক্টর মাইকেল ডি ডোরা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে আসলেন আমার কাছে। তারা সারা বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করতে চান। আর এই প্রতিবাদ সমাবেশে যোগ দেবেন সিএফ আই, আইএইচইউ, অ্যাথিস্ট অ্যালায়েন্স, আমেরিকান এথিস্ট, আমেরিকান হিউম্যানিস্ট সহ সারা বিশ্বের বড় বড় মুক্তচিন্তার সংগঠনগুলো। এই সব মুক্তচিন্তক সংগঠনের সবারই আলাদা আলাদা এজেন্ডা আর আদর্শ থাকলেও বাংলাদেশের ব্লগারদের মুক্তির ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদের একটা কর্মসূচী হাতে নিলেন তারা। শুরু হল 'Worldwide Protests for Free Expression in Bangladesh' ক্যাম্পেইন[72]।

প্রথমে ২৫শে এপ্রিল প্রতিবাদ কর্মসূচীর তারিখ ধার্য হয়, কিন্তু কর্মসূচীর একদিন আগে সাভারে রানা প্লাজা নামের একটি বহুতল ভবন ধসে পড়ে। সহস্রাধিক মানুষ এ দুর্ঘটনায় নিহত হয়, আহত হয় দুই হাজারের বেশি মানুষ। এই মর্মান্তিক সাভার দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে সেটা পিছিয়ে ২রা মে তে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে কিছু সংগঠন পূর্বনির্ধারিত ২৫শে এপ্রিলেই প্রতিবাদ সমাবেশ করে। অন্যরা ২রা মে।

[72] বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন উইকিপেডিয়া থেকে : Worldwide Protests for Free Expression in Bangladesh, From Wikipedia, the free encyclopedia

চিত্র : আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ অ্যাম্বেসির সামনে
আন্তর্জাতিক মুক্তচিন্তার সাথে জড়িত সংগঠনের প্রতিবাদের কিছু ছবি।

এ নিয়ে কিছু স্মৃতিচারণ করার তাগিদ অনুভব করছি। সাড়া বিশ্বে অনেক মুক্তচিন্তক এবং মানবতাবাদী প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদের ডাক দিলেও, ২রা মে বাংলাদেশের কাউকেই এ নিয়ে উদ্যোগ নিতে দেখা যাচ্ছিল না। যে দিনটিতে বাংলাদেশের ব্লগারদের মুক্তির জন্য সাড়া বিশ্বের মুক্তচিন্তার মানুষগুলো সমাবেশ করার উদ্যোগ নিয়েছিল, সেখানে খোদ বাংলাদেশে সে দিনটিতে কোন কর্মসূচী না থাকাটা পীড়াদায়ক ছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু শেষ সময় সবার সাথে যোগাযোগ রলি এবং মানববন্ধন করার মত অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে তুললেন ফারজানা কবীর খান স্নিগ্ধা। স্নিগ্ধার আহবানে সাড়া দিয়ে ইশরাথ রথী, সৈয়দ ইমরান আলী, মিরাজি মিরাজ, মিয়া সাজু, আশরাফুল পিয়াস, পারভেজ আলম, বাকী বিল্লাহ, আকতারুজ্জামান আজাদ, অনন্য আজাদ, ওয়াহিদা হোসেন প্রিয়া, ওয়াশিকুর বাবু, জুয়েল মাহমুদ, সাদাত নিলয়, এবং সাদমান সৌমিক, ইয়াসির জুয়েল সহ আরো অনেক অনলাইন এক্টিভিষ্ট এবং ব্লগাররা মাত্র ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে সকল বাধা, ভয় ভীতিকে দূরে ঠেলে দিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সভা ও মানব বন্ধনে দাড়িয়ে গেলেন তারা।

চিত্র : ২০১৩ সালের ২রা মে ব্লগারদের মুক্তির দাবীতে বাংলাদেশের প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন।

চিত্র : ২০১৩ সালের ২রা মে ব্লগারদের মুক্তির দাবীতে বাংলাদেশের প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন।

সিলেটেও আমাদের মুক্তমনা এবং যুক্তিবাদী বন্ধুরা মিছিল করেছিল ব্লগারদের মুক্তির দাবীতে।

চিত্র : সিলেটে ব্লগারদের মুক্তির দাবীতে বিক্ষোভ

আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম যে 'বিশ্বাসের ভাইরাস' এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠছে ক্রমশ। দেশে বিদেশে গড়ে উঠা আন্তর্জাতিক চাপ সামলাতে সরকারকে রীতিমত হিমসিম খেতে হবে। আমার অনুমান মিথ্যে হয়নি। একটা সময় পর মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে আটককৃত ব্লগার সুব্রত শুভ এবং রাসেল পারভেজকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সরকার। এর পর ব্লগার বিপ্লব এবং সবশেষে আসিফ মহিউদ্দীন মুক্তি পান জুন মাসে।

আসিফের মুক্তির পরপরই আমি ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছিলাম –

গাধা সবসময়ই পানি খায়, কিন্তু একটু ঘোলা করে।

আসিফ মহিউদ্দীনের জামিনের খবরটা শুনে এটাই মনে পড়ল প্রথমে। গত পয়লা এপ্রিল জামাতি আর হেফাজতি মোল্লাদের তোষামোদ করতে গিয়ে যেভাবে সরকারের পক্ষ থেকে প্রগতিশীল ব্লগারদের হাতকড়া পরিয়ে পাকড়াও করা হয়েছিল, তা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এর পর থেকেই আমরা চেষ্টা করেছি ব্লগারদের মুক্ত করতে। শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বব্যাপী। আমাদের সে আহবানে সাড়া দিয়ে সারা বিশ্বের মুক্তচিন্তক আর মানবতাবাদীরা রাস্তায় নেমেছেন প্ল্যাকার্ড হাতে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, সিএফআই, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস সহ বহু সংগঠনই বিবৃতি দিয়েছিল সরকারের বাক স্বাধীনতার উপর এই আগ্রাসনের প্রতিবাদে। আমি নিজেও বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলাম আন্তর্জাতিক মিডিয়ায়। আর বাংলাদেশে ব্লগার এবং অ্যাক্টিভিস্টরা তো কয়েক দফা করে পথে নেমেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই সবাইকে যারা আসিফের এই কঠিন সময়গুলোতে পাশে ছিলেন, আশার খোরাক যুগিয়েছিলেন।

তবে বিপরীত দৃশ্যও যে দেখিনি তা নয়। অনেকে আবার চেয়েছিলেন সারা জীবনই আসিফ জেলে থাকুন। রাস্তায় ফেলে আরেক দফা কোপালে কিংবা ফাঁসি দিয়ে দিলে তো আরো ভাল। কেবল 'কাঁঠাল পাতা চিবানো' ছাগুরা নয়, 'ছাগু তাড়ানো' সেলেব্রিটি ব্লগার, আম্বালিগার, পর্নস্টার সবাই ছিলেন আসিফের এই কল্লা ফেলার মিশনে অগ্রণী শরিক। ছাগুবাহিনী আর মুজিব বাহিনী গ্যাং-ব্যাং গ্রুপ করে মিশনে নেমেছিলেন; আসিফের মুক্তি চেয়ে কেউ স্ট্যাটাস দিলেই মুছে দিতে শুরু করেছিল তারা। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম – এরাই নাকি শাহবাগ আন্দোলনের পুরোধা, এরাই নাকি দেবে জাতিকে মুক্তি!

আমি অনেক দিন ধরেই দাঁতে দাঁত চেপে আজকের এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। জানতাম, এক মাঘে শীত যায় না। আসিফ একদিন মুক্তি পাবেন, লেখালিখি শুরু করবেন, শুধু জামিন নয়, সামগ্রিকভাবে মামলা থেকেও মুক্তি পাবেন তিনি। তিনি এখন স্বনামেই পরিচিত দেশে, বহির্বিশ্বে – হয়তো দেশের বাইরেও চলে আসতে পারবেন, চাইলেই, কিন্তু কারাগারে বন্দি অবস্থায় যে বৈমাত্রেয় সুলভ

আচরণ তিনি পেয়েছেন সেলেব্রিটি নামধারী কিছু সহব্লগারদের কাছ থেকে সেটা ইতিহাসে লেখা থাকবে।

অভিনন্দন আসিফ মহিউদ্দীন। অভিনন্দন মুক্তচিন্তার বিজয়ে। আমরা পাশে আছি।

এই সময় ব্লগারদের মুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে আমি একটা লেখা লিখি *ফ্রি ইনকোয়েরি* (Free Inquiry) নামে আমেরিকার বিখ্যাত একটি ম্যাগাজিনে। 'ফাদার অব সেক্যুলারিজম' হিসেবে পরিচিত বিখ্যাত দার্শনিক পল কার্জ ছিলেন এই ম্যাগাজিনটির প্রতিষ্ঠাতা। ক্রিস্টোফার হিচেন্স, রিচার্ড ডকিন্স, স্যাম হ্যারিস, পিজি মায়ার্স এর মত বিদগ্ধ লেখক এবং চিন্তাবিদেরা এই ম্যাগাজিনটির সাথে জড়িত। বাংলাদেশে ব্লগারদের উপর আগ্রাসনের পর থেকেই তারা এ ব্যাপারে একটি লেখা প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন। আমি আমার বিশ্লেষণ হাজির করেছিলাম অক্টোবর/নভেম্বর সংখ্যায় Freethought Under Attack in Bangladesh নামে[73]।

লেখাটিতে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ ব্লগারদের মুক্তি নিঃসন্দেহে মুক্তচিন্তার বিজয়। তবে, একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে। দেশ এবং দেশের বাইরে মুক্তমনাদের সম্মিলিত চাপের কাছে সরকার নতি স্বীকার করলেও তাদের পরিপূর্ণভাবে মুক্তি দেওয়া হয়নি, মুক্তি দেয়া হয়েছে জামিনে। রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা মাঝে মধ্যে মুক্তবুদ্ধিকে জামিন দেয়, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে মুক্তি দিতে পারেনা। মুক্তবুদ্ধি এবং মুক্তান্বেষণের পরিপূর্ণ মুক্তি রাষ্ট্রের শাসক এবং ভাইরাস-আক্রান্ত মননের প্রজাদের জন্য বিপদজনক।'

আমার অনুমান যে ভুল ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া গেল কিছুদিনের মধ্যেই। ২০০৬ সালের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (সংশোধন) অধ্যাদেশে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা, যেখানে ৫৭ ধারা নামে একটি ধারা সংযুক্ত হয়েছে। এই ধারায় আছে, 'রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরণের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান করা হয়, তা হলে তার এই কার্য হবে একটি অপরাধ'।

এই আইন আজ পরিচিতি পেয়েছে 'নতুন কালাকানুন' হিসেবে[74]। ইতোমধ্যেই এই কালাকানুনের শিকার হয়ে কারাবরণ করেছেন মুক্তচিন্তার দুই তরুণ মাহমুদর রহমান রায়হান (রায়হান রাহী) এবং উল্লাস দাশ। ফেসবুকে ধর্মবিরোধী মন্তব্য করার অজুহাতে এই দুই কিশোরকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়, এবং শেষ পর্যন্ত তুলে দেয়া হয় পুলিশের হাতে। আর পুরো ঘটনাটিতে উস্কানি দিয়েছিল রাজীব হায়দার

---

[73] Trisha Ahmed and Avijit Roy, OP-ED: Freethought Under Attack in Bangladesh, Free Inquiry Magazine, October/November 2013 Volume 33, Number 6.

[74] তানজিম আল ইসলাম, নতুন একটি কালাকানুন?, প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ০৯, ২০১৩

শোভনের জানাজার ইমামকে হত্যার ফতোয়া দেয়া উগ্র-জিহাদি তরুণ শাফিউর রহমান ফারাবী[75]। 'মানুষিকতা' গ্রন্থের লেখক রায়হান আবীর বিডিনিউজ পত্রিকায় ঘটনাটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন[76] –

ঘটনার সূত্রপাত ৩০ মার্চ, ২০১৪। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য রাহী ও উল্লাস যখন কলেজে যাচ্ছিল বেলা এগারোটার দিকে, তখন স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দল ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংঘ ইসলামী ছাত্র শিবিরের পঞ্চাশ থেকে ষাটজন ক্যাডার তাদের উপর হামলা চালায়। অবশ্যই ধর্মানুভূতির জুজু পুঁজি করে।

হামলাকারীরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, প্রস্তুত ছিল তাদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা-সম্বলিত উস্কানিমূলক পাঁচ পাতার ছাপানো লিফলেট। প্রথমে রাহী ও উল্লাসকে স্থানীয় মসজিদে নিয়ে মারধর করা হয় এবং পরে রাস্তায় নামিয়ে লিফলেট দেখিয়ে ও অন্য অনেকভাবে আশেপাশের মানুষদের উত্তেজিত করে নির্মম গণধোলাইয়ের আয়োজন করা হয়।

ব্লগ ও পত্রিকা মারফত জানতে পেরেছি, জনতার ধর্মীয় জোশ উজ্জীবিত করতে কৈশোর-অতিক্রান্ত ছেলে দুটোকে 'নারায়ে তাকবির' শ্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে পিটিয়ে মুমূর্ষু করা হয়। শাহবাগ আন্দোলনের পর থেকে আমরা দেখেছি, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখা মানুষের জোয়ার প্রতিহত করতে স্বাধীনতাবিরোধী, সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে তাদের সরকারও যেন একাট্টা।

রাহী-উল্লাসের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। উত্তেজিত জনতা যখন শিবিরের ক্যাডারদের সঙ্গে মিলেমিশে এই ছেলেগুলোকে হত্যা-চেষ্টায় মগ্ন, সে সময় আগমন ঘটে স্থানীয় চকবাজার থানার পুলিশের। জনতার হাত থেকে ছাড়িয়ে এবার তাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। যারা রাহী ও উল্লাসকে হত্যা-চেষ্টায় লিপ্ত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার পরিবর্তে, তাদেরই চাপে পড়ে পুলিশ উল্টো ছেলে দুটোর নামে মামলা করে।

বাংলাদেশের সংবিধান পরিপন্থী কালাকানুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০১৩)-এর ৫৭ ধারায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে আটক রাখা হয়। ... মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে–

'...দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছাইয়া দেখিতে পাই যে, দুই জন লোককে ৫০/৬০ জন

---

[75] জঙ্গিবাদ প্রচারকারীর উস্কানিতে চট্টগ্রামে দুই কিশোর গ্রেপ্তার, বিডিনিউজ২৪, এপ্রিল ২, ২০১৪, http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article767003.bdnews

[76] রায়হান আবীর, উল্লাস ও রাহী বৃত্তান্ত: এখনও গেল না আঁধার, বিডিনিউজ২৪, মতামত বিশ্লেষণ, এপ্রিল ১৬, ২০১৪

উত্তেজিত জনতা মারধর করিতেছে। তাৎক্ষণিকভাবে ধৃত আসামীদ্বয়কে উত্তেজিত জনতার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া উপস্থিত জনসাধারণকে জিজ্ঞেস করিয়া জানিতে পারি যে, উক্ত আসামিদ্বয় ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম ও মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন অবমাননাকর ও মানহানিকর ধর্মীয় উস্কানিমূলক বক্তব্য পোস্ট করিয়াছে। এই সময় ঘটনার বিষয়ে ধৃত আসামিদ্বয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তাহারা উপস্থিত লোকজনের সামনে নাম-ঠিকানা প্রকাশ করে ফেসবুকে প্রকাশিত কটূক্তির বিষয় স্বীকার করে' ।

পাঠক লক্ষ্য করুন, এজাহারে কেমন করে নির্দোষ ছেলে দুটোকে 'আসামি' এবং যারা হত্যা-চেষ্টায় লিপ্ত তাদের 'উপস্থিত জনসাধারণ' তকমা প্রদান করে 'সাধু' সাব্যস্ত করা হয়েছে। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, আসামিরা নাকি ফারাবী শফিউর রহমান নামে একজনের ফেসবুক দেওয়ালে গিয়ে ইসলাম ধর্মকে কটাক্ষ করা বক্তব্য দিয়েছেন। ঠিক একই ধরণের অভিযোগ উল্লাসের বিরুদ্ধেও।

প্রতিদিন একজন করে মানুষকে 'নাস্তিক' প্রমাণ শেষে তাকে হত্যা করার আহবান জানিয়ে ফারাবী আজ ইন্টারনেটের পরিচিত মুখ। 'অপরাজেয় সংঘ' নামক জামায়াত-মনস্ক এক সন্ত্রাসী সংগঠনের আড়ালে থেকে ফারাবী গংই রাহী ও উল্লাসের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে।

বোঝা যাচ্ছে ৫৭ ধারা তৈরি এবং এটি প্রয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে তথাকথিত 'ধর্মানুভূতি' রক্ষার নাজুক প্রক্রিয়া হিসেবেই। আর এই কালাকানুন নির্দ্বিধায় প্রযুক্ত হবে যখন রাষ্ট্র মনে করবে কোন লেখক 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত' করছে। এই আইনের অপপ্রয়োগের ফলে সবচে' বেশী ক্ষতি হবে অনলাইনের মুক্তমনা এবং প্রথাবিরোধী লেখকেরা। কারণ, কিছু লিখতে গেলেই 'অনুভূতির বাণিজ্য' টেনে এনে লেখককে গারদে পোরার বন্দোবস্ত করা হবে! এমনকি লেখকের নিজেকে দোষী কিংবা নির্দোষ প্রমাণের আগেই জেলে থাকতে হবে দিনের পর দিন, যেটা মানবিক এবং নাগরিক অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

বোঝাই যাচ্ছে, 'বিশ্বাসের ভাইরাস' থেকে মুক্তি এত সহজ নয়!

চ তু র্থ অ ধ্যা য়
ধর্ম কেন ভাইরাসের সমতুল্য?

ধর্মকে ভাইরাসের সাথে তুলনা করলে অনেক পাঠকই হয়তো গোস্বা করবেন। যারা আরেকটু আবেগপ্রবণ তারা হয়ত শুনেই কুৎসিত কুৎসিত কিছু গালি দিয়ে বসবেন। গালি দেয়ারই তো কথা। এত কোটি কোটি মানুষ যে ধর্মে বিশ্বাস করে, তারা কি সবাই ভাইরাস আক্রান্ত? আর সুস্থ কেবল আপনার মতো নাস্তিক নামধারী গুটিকয় কাঠবলদেরা?

প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমার কাছে এর অনেকগুলো উত্তর আছে। প্রথম উত্তর হচ্ছে, সংখ্যাধিক্যের উপরে কোন বৈজ্ঞানিক সত্যতা নির্ভর করে না। একটা সময় পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করতো যে পৃথিবীটা সমতল, কিংবা সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করেছে বলেই সেটা সত্য হয়ে যায়নি। আজকের দিনেও অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বর, জ্বিন, ভুত, পরকাল, স্বর্গ নরক, ফেরেশতা, ইবলিস প্রভৃতি কেচ্ছাকাহিনিতে বিশ্বাস করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে বলেই সেগুলো সত্য নয়, বরং বোঝা যায় পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এখনো যুক্তি দিয়ে, বিজ্ঞানমনস্ক মানসিকতা দিয়ে বিশ্লেষণ করতে অক্ষম। সংখ্যাধিক্যের উপমা হাজির করে বিতর্কে জয়লাভের চেষ্টা আসলে একধরণের ফ্যালাসি। এর একটা কেতাবি নাম আছে – 'Argumentum ad populum'।

আর তাছাড়া অধিকাংশ মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করে বলেই সেটা ভাইরাস হতে পারবে না তা তো নয়। বহু সময়ই আমরা ইতিহাস বইয়ে পড়েছি – প্লেগে, গুটি বসন্তে কিংবা কলেরায় গ্রামকে গ্রাম চোখের সামনে উজাড় হয়ে যেত। দেখা যেত, ভাইরাস বা জীবাণুর মহামারীতে একটি গ্রামের সকল মানুষ মারা গেছে, বেঁচে আছে স্বল্প সংখ্যক সৌভাগ্যবানেরা, যাদের মধ্যে জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠেছিল। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ মারা গেছে বলেই ভাইরাসটি মিথ্যে হয়ে যায় না। কিংবা দু'চার জন বেঁচে থাকা গ্রামবাসীও কাঠবলদ হয়ে যায় না। যারা ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের সাথে পরিচিত এবং বোঝেন বিবর্তন কীভাবে কাজ করে, তারা জানেন, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে শতকরা নিরানব্বই ভাগ প্রজাতিই বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে তুলনায় টিকে থাকে গুটি কয়েক। অধিকাংশ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায় বলেই বিবর্তন মিথ্যে হয়ে যায় না।

কাজেই, রাগ করুন আর যাই করুন, ধর্মের বিস্তার আর টিকে থাকার ব্যাপারগুলো

ভাইরাসের মত করেই কাজ করে অনেকটা। একটি ভাইরাসের যেমন একগাদা 'হোস্ট' দরকার হয় বংশবৃদ্ধির জন্য, নিজেকে ছড়িয়ে দেবার জন্য, ধর্মেরও টিকে থাকার জন্য দরকার হয় এক গাদা অনুগত বান্দা এবং সেবকের, যাদের বুকে আশ্রয় করে ধর্ম টিকে থাকে। শুধু তাই নয়, জীবাণু যেমন নিজেকে রক্ষার জন্য অন্য জীবাণুর সাথে প্রতিযোগিতা করে, ঠিক তেমনি এক বিশ্বাসও প্রতিযোগিতা করে অন্য বিশ্বাসের সাথে। নিজেকে অন্য বিশ্বাসের হাত থেকে রক্ষা করতে চায়। বিশ্বাসী বান্দাদের মনে ঢুকিয়ে দেয়া হয় – 'অবিশ্বাসীদের কিংবা বিধর্মীদের কথা বেশি শুনতে যেয়ো না, ঈমান আমান নষ্ট হয়ে যাবে।' ভাইরাস যেমন চোখ বন্ধ করে নিজের কপি করে করে জীবাণু ছড়িয়ে যায়, প্রতিটি ধর্মীয় বিশ্বাস অন্য বিশ্বাসগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে কেবল নিজের বিশ্বাসের কপি করে যেতে থাকে। বিস্তার ঘটাতে থাকে বিশ্বাস নির্ভর সাম্রাজ্যের।

জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'জিন' বংশগতির ক্ষুদ্রতম একক। জিনের মধ্যে থাকে সংরক্ষিত তথ্য। জীববিজ্ঞানের বইয়ে জিনের যে ছবি দেয়া থাকে, তা থেকে দেখা যায় জিন ডিএনএ'র নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। ডিএনএ তা হলে কি? সোজা কথায় ডিএনএ হচ্ছে চারটি ভিন্ন প্রকৃতির নিউক্লিওটাইডে তৈরি অণু, যাদের বিন্যাস জীবের জিনগত বৈশিষ্ট্যের নিয়ামক। আমার মাথায় কোঁকড়া চুল থাকবে না টাক থাকবে, গায়ের রঙ কালো হবে না সাদা, সেটা জেনেটিক বৈশিষ্ট্যগুলোই নির্ধারণ করে দেয়। এখন, ডিএনএর ক্ষেত্রে আমরা তথ্য বলতে যেটাকে বুঝি সেটা আসলে 'রাসায়নিক নির্দেশাবলী'। এই নির্দেশাবলী থেকেই কিন্তু কোষ বুঝতে পারে কিভাবে কিছু বিশেষ ধরণের প্রোটিন তৈরি করা যাবে, যার ফলে দেহের উপাদানগুলো টিকে থাকতে পারে। এই নির্দেশাবলীকেই চলতি ভাষায় 'ব্লুপ্রিন্ট' বা নীলনকশা বলা হয়, যদিও কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন 'রেসিপি' শব্দটাই বরং এক্ষেত্রে অধিকতর সঠিক[77]। তবে এর বাইরে

---

[77] Richard Dawkins expounds the recipe analogy in The Blind Watchmaker (1986, pp. 295-296):

"A recipe in a cookery book is not, in any sense, a blueprint for the cake that will finally emerge from the oven.... a recipe is not a scale model, not a description of a finished cake, not in any sense a point-for-point representation. It is a set of instructions which, if obeyed in the right order, will result in a cake.

Now, we don't yet understand everything, or even most things, about how animals develop from fertilized eggs. Nevertheless, the indications are very strong that the genes are much more like a recipe than like a blueprint. Indeed, the recipe analogy is really rather a good one, while the blueprint analogy, although it is often unthinkingly used in elementary textbooks, especially recent ones, is wrong in almost every particular. Embryonic development is a process. It is an orderly sequence of events, like the procedure for making a cake...

আরেকটি ব্যাপার থাকে যেটা ছাড়া পুনরাবৃত্তি বা কপির ব্যাপারটা ঘটবে না। মোটিভেশন বা প্রেষণা। এটা এক ধরণের প্রোগ্রামের মত, উপযুক্ত পরিবেশ পেলে নিজেকে পুনরাবৃত্তির জন্য পরিচালিত করে।

জিনের সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসের তুলনা করলে দেখা যায়, সেটাও কাজ করে অনেকটা একই রকমভাবেই। ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার আচরণের মধ্যেও নানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আর থাকে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী, যে নির্দেশাবলীকে ঐশ্বরিক মনে করে পালন করে যায় এর অনুগত সেবকেরা। সেবকদের সেই বিশ্বাসগুলো ছড়িয়ে দেবার পেছনেও থাকে মোটিভেশন বা প্রেষণা।
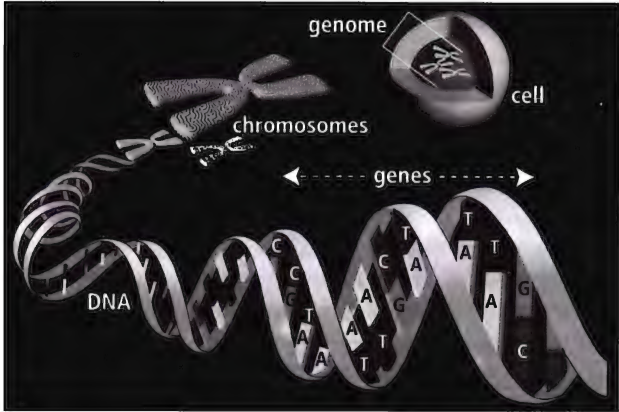
চিত্র : বর্ধিত স্কেলে দেহকোষ, ক্রোমোজোম, ডিএনএ এবং জিন

বিশ্বাস বা ধ্যান ধারণা ছড়ানো এবং জিনের প্রতিলিপির মাঝে যে দারুণ একটা সাদৃশ্য আছে, সেটা প্রথম নজরে পড়ে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের, যার কথা আমরা প্রথম অধ্যায়ে জেনেছি। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান যে, বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি অনেকটা জিনের পুনরাবৃত্তির মতোই। তিনি এর নামকরণ করেন, 'mnemonic gene' বা

The genes, taken together, can be seen as a set of instructions for carrying out a process, just as the words of a recipe, taken together, are a set of instructions for carrying out a process".

সংক্ষেপে meme (মিম)[78]। বস্তুত ডারউইনের বিবর্তনবাদের উপর ভিত্তি করেই এই মিমের ধারণা দাঁড় করিয়েছিলেন ডকিন্স, যদিও এর বিস্তার ডারউইনীয় পদ্ধতির বদলে বহুলাংশেই ল্যামার্কিয়ান বলে আজকের দিনের গবেষকেরা মনে করেন।

ডারউইনের বহু আগে থেকেই অবশ্য বিজ্ঞানীরা জানতেন, বিশ্বজগতের অনেক কিছুকে আমরা আলাদা আলাদা নামে জানলেও এরা আসলে একই অবস্থার রকমফের। যেমন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তার বিখ্যাত $E=mc^2$ সমীকরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন, ভর এবং শক্তিকে আমরা আলাদা মনে করলেও এরা আসলে একই জিনিস। আইনস্টাইনের আগে বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে এবং জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বুঝেছিলেন যে তড়িৎ এবং চুম্বকত্ব আসলে মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ ছাড়া কিছু নয়। ষাটের দশকে আব্দুস সালাম, স্টিভেন ওয়েনবার্গ, এবং শেলডন গ্লাসোও আমাদের দেখিয়েছিলেন 'তাড়িতচৌম্বক' বল এবং 'দুর্বল নিউক্লিয়' বলকেও একই সুতায় গাঁথা যায়। এদেরকে এখন অভিহিত করা হয় 'তাড়িত দুর্বল' বল নামে। এমনকি এদের অনেক আগে রেনে ডেকার্ট এবং পিয়েরে দ্য ফার্মা আমাদের জানিয়েছিলেন, বীজগণিত এবং জ্যামিতি – জ্ঞানান্বেষণের দুটি শাখা হিসেবে বিবেচিত হলেও তারা আসলে একই কথাই বলছে, যদি তাদের সমাধানগুলো পরখ করে দেখা হয় অভিনিবেশ সহকারে। কাজেই উপরের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুটি ধারণা কিংবা বিষয়কে আলাদা ভাবা হলেও কোন না কোন চিন্তাশীল মনন এসে আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছেন বিষয়গুলো আসলে ভিন্ন নয়।

রিচার্ড ডকিন্সও জিন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অনুধাবন করলেন যে, জিনের মধ্যে যে তথ্যের রূপান্তর এবং পুনরাবৃত্তি ঘটে, সেরকমটি ঘটে মানব সমাজের সংস্কৃতির মধ্যেও। দেহ থেকে দেহান্তরে যেমন জিনের প্রতিলিপি ঘটে, ঠিক তেমনি মন থেকে মনান্তরে প্রতিলিপি ঘটে চলে মিমের। ঘটে সংস্কৃতির বিবর্তন।

এই ফাঁকে একটু বিবর্তন নিয়ে আলোচনা সেরে নেয়া যাক। বিবর্তন ব্যাপারটা আসলে কী? সাদামাটাভাবে বিবর্তন বলতে আমরা বুঝি পরিবর্তনকে। আমরা নানারকম পরিবর্তনের সাথে এমনিতেই পরিচিত। প্রকৃতির নানা রকম পরিবর্তন আমরা হর-হামেশাই দেখি। ভূত্বকের পরিবর্তন হয়, নদী নালা, খাল বিল শুকিয়ে যায়, অগ্নুৎপাতে শহর ধ্বংস হয়, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এ এন্টার্কটিকার বরফ গলে যায়, কিংবা সুপারনোভা বিস্ফোরণে গ্রহাণুপুঞ্জ ধ্বংস হয় – এসব উদাহরণের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। কিন্তু এগুলো সবই জড়জগতে পরিবর্তনের উদাহরণ। জীবজগতকে অনেকদিন ধরেই রাখা হয়েছিলো

---

[78] Richard Dawkins, The Selfish Gene: 30th Anniversary Edition--with a new Introduction by the Author, Oxford University Press, USA; 30th Anniversary edition, May 25, 2006

সমস্ত পরিবর্তনের উর্ধ্বে। কারণ মনে করা হত ঈশ্বরের সৃষ্টি জীবজগৎ সর্বাঙ্গীণ সুন্দর, আর নিখুঁত। তাই এদের কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। সকল জীব, সকল প্রজাতি সুস্থির, আবহমান কাল ধরে অপরিবর্তিত আছে এবং থাকবে। ডারউইন এবং ওয়ালেসের প্রস্তাবিত বিবর্তনতত্ত্ব মূলতঃ জীবজগতের অপরিবর্তনীয়তার এই মিথটিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তাদের তত্ত্বই প্রথমবারের মত বৈজ্ঞানিকভাবে দেখিয়েছে যে জীবজগতও আসলে স্থির নয়, জড়জগতের মত জীবেরও পরিবর্তন হয়, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনের হার খুবই ধীর। জীববিজ্ঞানে একে অভিহিত করা হয় জৈব বিবর্তন নামে।

কীভাবে বিবর্তন কাজ করে? এটা বলতে গেলেই কিন্তু ডারউইনের অবদানের কথা সামনে এসে পড়বে। ১৯৫৯ সালে চার্লস ডারউইন 'অরিজিন অব স্পিশিজ' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাতে তিনি প্রথমবারের মত ব্যাখ্যা করেন বিবর্তনের পিছনে চালিকা শক্তি হল প্রাকৃতিক নির্বাচন' বা ন্যাচারাল সিলেকশন বলে একটা ব্যাপার। প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যাপারটা কিন্তু ভারি মজার। রোমান্টিক ব্যক্তিরা হয়ত এতে রোমান্সের গন্ধ পাবেন। জীব জগতে স্ত্রীই হোক আর পুরুষই হোক কেউ হেলা ফেলা করে মেশে না। মন-মানসিকতায় না বনলে, প্রকৃতি পাত্তা দেবে না মোটেই। প্রকৃতির চোখে আসলে লড়াকু স্ত্রী-পুরুষের কদর বেশী। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃতি যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেছে নেয় আর অযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাতিল করে দেয়, ফলে একটি বিশেষ পথে ধীর গতিতে জীবজন্তুর পরিবর্তন ঘটতে থাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। ডারউইন বুঝেছিলেন, রেপ্লিকেশন, মিউটেশন এবং ভ্যারিয়েশনের সমন্বয়ে যে সিলেকশন প্রক্রিয়া চলমান – সেটি জীবজগতের জনপুঞ্জে পরিবর্তনের জন্য দায়ী। তিনি একে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার ফলে প্রজাতির উদ্ভব এবং বিবর্তন ঘটতে থাকে।

ডকিন্স এবং পরবর্তী বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখলেন, মানব সংস্কৃতির বিবর্তনও ঘটে অনেকটা এরকম ডারউইনের দেখানো পথেই। মানব জাতির উন্মেষের পর থেকেই বিভিন্ন ধ্যান ধারণার মধ্যে সংঘাত হয়েছে, প্রতিযোগিতা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অনেক ধ্যান ধারণা হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির আড়ালে, অনেক ধ্যান ধারণা আবার সফলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। অর্থাৎ সোজা কথায় ধারণার বিস্তারের মধ্যেও জীববিজ্ঞানের মতো রেপ্লিকেশন, মিউটেশন, কম্পিটিশন, সিলেকশন, অ্যাকিউমুলেশন প্রক্রিয়া কাজ করে। ব্যাপারটা এতোটাই চমকপ্রদ যে, বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান লেখক ম্যাট রিডলী এটাকে যৌনসঙ্গমের মাধ্যমের প্রজাতির বিস্তারের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি তার সাম্প্রতিক 'The Rational Optimist' বইটার প্রথম অধ্যায়টার নামই রেখেছেন 'When Ideas Have Sex'। সেখানে তিনি সংস্কৃতির বিবর্তনের উদ্ভবের কথা বলতে

গিয়ে বলেছেন[79] – 'The answer, I believe, is that at some point in human history, ideas began to meet and mate, to have sex with each other'. যৌনতার ব্যাপারটা 'মেটাফোরিক সেন্সে' হলেও ধ্যান ধারণাগুলো কিভাবে বিস্তার করে এবং স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে ফেলে সেটা কিছুটা হলেও বোঝা যায়।

একটা হাতীর আকার একটা ব্যাকটেরিয়ার থেকে প্রায় ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ($১০^{১৮}$ গুন) বড়। কিন্তু তারপরেও তারা দুজনেই একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিনিময় করে। দুজনেরই ডিএনএ আছে, এবং তারা নিজেদের প্রতিলিপি করে। ডিএনএ কপি করে করে বংশবৃদ্ধি করে। ধ্যান ধারণাগুলো সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারগুলোও তেমনি। কীভাবে ধ্যান ধারণাগুলো জনপুঞ্জে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তার কিছু ব্যবহারিক উদাহরণ দেখা যাক। কৌতুক বা joke ছড়ানোর ব্যাপারটি একটি চমৎকার উদাহরণ।

কৌতুক যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে

একটা জোক বলা যাক। জোকটা এরকমের :

ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী প্রফেসর রিচার্ড ডকিন্স সুদূর আফ্রিকান এক আদিম ট্রাইবে প্রকৃতি বিবর্তন এবং সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েছেন, সেখানে তিনি একবছর থাকবেন আর তার নতুন বই লিখবেন 'আউট অফ আফ্রিকা' নিয়ে। তিনি আফ্রিকান ট্রাইবের মধ্যে বাস করে তাঁদের সংস্কৃতির অনেক কিছু শিখছেন, আবার তাঁদেরও শেখাচ্ছেন অনেক কিছু – বিশেষত: পশ্চিমা জগতের বিজ্ঞান, কারিগরি, প্রযুক্তির কিছু দিক। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল ট্রাইবের নেতার স্ত্রীর এক সন্তান হয়েছে, কিন্তু গায়ের রঙ ধবধবে সাদা! ট্রাইবের সবাই হতবাক। প্রফেসরকে আলাদা কয়রে ডেকে নিয়ে ট্রাইবের সর্দার বললেন – 'হুনেন প্রফেসর সাব, এইখানে আপনেই আছেন একমাত্র এইরকম সাদা। আমরা এর আগে কোন সাদা চেহারার মানুষই দেখি নাই। কোইথিকা কী হইছে, এইডা বুঝতে জিনিয়াস হওন লাগে না।'

প্রফেসর একটু ভেবে বললেন, 'না, না চিফ। আপনি ভুল বুঝছেন। প্রকৃতিতে এরকম ঘটনা মাঝে মধ্যেই দেখা যায়। বিজ্ঞানে আমরা এটাকে বলি Albinism। এই যে আপনার উঠানে দেখেন সবগুলা ভেড়া সাদা, খালি একটা ভেড়া কালো রঙের। প্রকৃতিতে এরকম হয় মাঝে সাঝে, আপনি শান্ত হন।

ট্রাইবের সর্দার বেশ কিছুক্ষণ ধরে চুপ থেকে ডকিন্সকে বললেন, 'শোনেন, আপনের লগে একটা ডিলে আসি। আপনে ভেড়া নিয়ে আর কাউরে কিছু কইয়েন না, আমিও সাদা শিশু লইয়া আপনেরে কিছু কমু না!'

---

[79] Matt Ridley, The Rational Optimist: How Prosperity Evolves, Harper Perennial, 2011

কেমন লাগলো এ কৌতুকটা? আমি নিশ্চিত কৌতুকটা যদি আপনি পড়েন, এবং যদি আপনার ভাল লাগে, হয়তো আপনি সেটা আপনার অন্য কোন বন্ধুকে গিয়ে বলবেন। এভাবেই কৌতুক ছড়ায়। আমি আসলে আপনার মস্তিষ্ককে এই জোকের হোস্ট হিসেবে ব্যবহার করছি। অনেকটা ভাইরাসের মতোই কিন্তু। এই বইয়ের পাঠক যত বাড়বে, বাড়বে হোস্টের সংখ্যাও। এবং সেই সাথে এটা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও।

আধুনিক প্রযুক্তি এসে আমাদের এই কৌতুক ছড়ানোর কাজ খুব সহজ করে দিয়েছে। এই কৌতুকটা ফেসবুকে দেওয়ার মিনিট খানেকের মধ্যে শ খানেক লাইক আর গণ্ডা খানেক শেয়ারের বন্যায় ভেসে যায়। ফেসবুক খুব ভাল ক্রাইটেরিইয়া বোঝার জন্য কোন কৌতুক 'লাইকেবল' আর কোনটা নয়। কোনটা টিকে থাকবে, আর কোনটা হারিয়ে যাবে বিস্তৃতির আড়ালে। একটা কৌতুক প্রচণ্ড রকম শেয়ার হয়েছিল ফেসবুকে একসময়, জোকটা এরকমের:

জুকার্নায়েকের বড় আশা ছিল তিনি মৃত্যুর পর বেহেস্ত-বাসী হইবেন। তা আশা করবেনই বা না কেন? এতদিন ধরে আল্লাহর পথে জিহাদ করছিলেন, নানাভাবে বিবর্তনের বিরুদ্ধে গীবত গাইছেন, বিভিন্ন লেকচারে আল্লা আল্লা আর ইসলাম ইসলাম কইরা ফ্যানা তুইলা ফেলাইলেন, কোরআনের মইধ্যে বিজ্ঞান পাইলেন, পৃথিবীর আকার পাইলেন উটের ডিমের লাহান, উনি বেহেস্তবাসী না হইলে হইবো কে?

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর ঈশ্বর আরেক। কোন এক অজ্ঞাত কারণে ঈশ্বরের শেষ বিচারে জুকার্নায়েকের বেহেস্তে স্থান হইলো না। স্থান হইলো দোজখে। তবে হাজার হলেও তিনি স্বনামখ্যাত জুকার্নায়েক। ঈশ্বর তাকে ডেকে নিয়ে দয়াপরাবশতঃ বললেন, তোমাকে দোজখের বিভিন্ন প্রকৃতি ঘুরাইয়া দেখানো হবে। তোমার যেটা পছন্দ বেছে নেওয়ার তৌফিক দেয়া হইল, জুকার্নায়েকজী!

মন্দের ভাল, কি আর করা। জুকার্নায়েককে প্রথম একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হইল। সেখানে এক পাপিষ্ঠকে উলঙ্গ করে চাবুক কষা হচ্ছে। আর চাবুকের বাড়ি খেয়ে পাপিষ্ঠ ব্যাটা তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে। জুকার্নায়েক দেখে বললেন, কতক্ষণ এ ব্যাটাকে চাবুক মারা হবে? উত্তর আসলো এক হাজার বছর। এর পর এক ঘণ্টা বিরতি। তারপর আবার ... জুকার্নায়েক শুনে বললেন, নাহ এটা আমার জন্য নয়, চলুন অন্য ঘরে যাই।

দ্বিতীয় ঘরে গিয়ে জুকার্নায়েক দেখলেন, সেখানেও এক ব্যক্তিকে ধরে গরম কড়াইয়ে বসিয়ে পোড়ানো হচ্ছে, আর ব্যথার চোটে উহ আহ করছে। জুকার্নায়েক সে ঘর থেকেও বিদায় নিয়ে বললেন, আরো অপশন কী আছে দেখা যাক।

তৃতীয় ঘরে গিয়ে দেখেন এক লোককে উলঙ্গ করে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, আর এক সুন্দরী তন্বী হাঁটু গেড়ে বসে ভদ্রলোকের 'উহা' মুখে নিয়ে মনিকা

লিউনস্কির মতন মুখমেহন করে চলেছেন। কিছুক্ষণ টেরা চোখে অবলোকন করে জুকার্নায়েক ভাবলেন, এটা তো মন্দ নয়। নিজেকে চেনবাধা ভদ্রলোকের জায়গায় কল্পনা করে আমোদিত ভাব নিয়ে ঈশ্বরকে বললেন, এই দোজখই আমার পছন্দের। ঈশ্বর ঘুরে সুন্দরী তন্বীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কাজ শেষ। এখন থেকে জুকার্নায়েক পরবর্তী এক হাজার বছর ধরে এই সার্ভিস দেবেন।

একটি সার্থক কৌতুক আসলে একটি সার্থক মিমের উদাহরণ। চিন্তা করে দেখুন – একটা জোক আসলে কিছুই নয়, কেবল কতগুলো তথ্যের সমাহার। অথচ সেটাই পুনরাবৃত্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আমার আপনার মস্তিষ্ক তথা হোস্টের প্রেষণার মাধ্যমে।

একটি কৌতুক, তা যত সরলই হোক না কেন, মিমের কাজ বোঝার জন্য খুব ভাল একটা উদাহরণ। তবে কৌতুককে মিম হলেও ঠিক সেভাবে 'ভাইরাস' বলা যাবে না। কারণ এর মধ্যে ভীতিকর কোন নির্দেশনা নেই, নেই কোন অনিষ্টের আলামত। সেগুলো যদি যুক্ত হয় তবে মিমের অবস্থা কী দাঁড়ায় সেটা আমরা দেখব পরের অনুচ্ছেদে।

ভয়াল নির্দেশিকা

যারা প্রথম প্রথম ইমেইল ব্যবহার শুরু করেন, তাদের প্রায় সবাইকেই একটা বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে ধাতস্থ হতে হয়। স্প্যাম এবং চেইন ইমেইল। আমি যখন প্রথম প্রথম হটমেইল এবং ইয়াহু মেইল ব্যবহার করা শুরু করা শুরু করেছিলাম, তখন প্রায় প্রতিদিনই গাদা খানেক ইমেইল পেতাম, যেগুলোর নীচে লেখা থাকতো 'দয়া করে অন্তত ৫ জনকে মেইলটি ফরওয়ার্ড করুন, নইলে সমূহ বিপদ। এক ভদ্রলোক এই ইমেইল পেয়েও চুপ করে বসে ছিলে। তাকে দুই দিনের মাথায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে...' ইত্যাদি। আমার বন্ধুদের অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সেটা তার অন্য বন্ধুদের কাছে ফরওয়ার্ড করে দিতেন। যারা আমার মতো একটু সংশয়বাদী ধাঁচের তারা হয়তো মুচকি হেসে ট্র্যাশে চালান করে দিতেন। তবে 'বিশ্বাসী মস্তিষ্কের' কাছে এই চেইন ইমেইলগুলো একেকটি সার্থক ভাইরাস। দেদারসে তারা সেগুলো তাদের বন্ধু তালিকার সবাইকে চালান করে দিতেন। এমনও হত যে, সেই একই ইমেইল আবার ঘুরে ঘুরে আমার কাছে চলে আসতো মাস খানেক পর চেইনের আকার কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়ে।

তো এই যে আমি নিজেকে এত সংশয়বাদী হিসেবে নিজেকে দাঁড় করাচ্ছি, সেই আমিও একবার 'রাম ধরা' খেয়ে গিয়েছিলাম। তবে চেইন ইমেইলের ক্ষেত্রে নয়, আরেকটি ক্ষেত্রে। সেই গল্প বলি।

তখন সবে মাত্র চাকরিতে ঢুকেছি আটলান্টার একটা ছোট কোম্পানিতে। একদিন সকালে অফিসে গিয়ে ইমেইল খুলেই দেখি একটা ইমেইল। ইংরেজিতে লেখা ইমেইলের বাংলা করলে দাঁড়াবে এরকমের:

প্রিয় প্রাপক,
খুব জরুরী। এইমাত্র পেলাম। আপনি আপনার সহকর্মীদের মধ্যে বিলি করুন।
নতুন ড্রাইভিং জরিমানা প্রবর্তন করা হয়েছে জর্জিয়ায় ২০০৮ থেকে।
১। কারপুল লেন – ১ম বার ১০৬৮.৫০ ডলার জরিমানা, প্রযুক্ত হবে ৭/১/০৮ তারিখ থেকে। যে হাইওয়েতে টিকেট খাচ্ছেন, সেই হাইওয়েতে পুনর্বার যাবেন না। কারণ, ২য়বার সেটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ৩য় বার তিনগুণ জরিমানা দিতে হবে। চতুর্থ-বার লাইসেন্স সাসপেন্ড।
২। ভুল লেন বদল – জরিমানা ৩৮০ ডলার। সলিড লেন কিংবা ইন্টারসেকশন ক্রস করবেন না।
৩। ইন্টারসেকশন ব্লক করলে – ৪৮৫ ডলার।
৪। রাস্তার শোল্ডারে ড্রাইভ করলে – ৪৫০ ডলার।
৫। কনস্ট্রাকশন এলাকায় সেলফোন ব্যবহার করলে জরিমানা করা হবে। ৭/১/০৮ তারিখ থেকে দ্বিগুণ হবে।
৬। গাড়িতে সিট বেল্ট ছাড়া কোন প্যাসেঞ্জার থাকলে ড্রাইভার এবং প্যাসেঞ্জার উভয়েই পুলিশের তরফ থেকে টিকেট পাবেন।
৭। রাস্তায় স্পিড লিমিটের মাত্র ৩ মাইল উপরে গেলেই টিকেট দেয়া হবে।
৮। ডিইউআই = জেল। দশ বছরের জন্য ড্রাইভিং রেকর্ডে এর উল্লেখ থাকবে।
৯। ৭/১/০৮ তারিখ থেকে সেলফোন 'হ্যান্ডস ফ্রি' থাকতে হবে। টিকেট ২৮৫ ডলার।

যথার্থ ভয়াল নির্দেশিকা, তাই না? আমার মত মানুষও ভীত হয়ে পড়ল। দেখলাম সহকর্মীদের সবাই ব্যাপারটা নিয়ে দারুণ উদ্বিগ্ন। আমি খুব সতর্কতার সাথে গাড়ি চালিয়ে অফিসে যেতাম। কারণ যে জরিমানার কথা ইমেইলে লেখা আছে, সেটা দিতে হলে পাকস্থলী আমার গলা দিয়ে বের হয়ে আসবে। আমিও আমার কাছের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের সেটা ফরওয়ার্ড করে দিলাম। অযাচিত ফাইনের গ্যাঁড়াকলে পরিচিতরা পড়ুক – কেই বা চায়!

কিন্তু তিন চার দিনের মধ্যেই একটা নির্ভরযোগ্য ওয়েব সাইট থেকে জানলাম পুরো ব্যাপারটাই বোগাস! ভুয়া ইমেইল। কিন্তু এর মধ্যেই এটা কয়েকশ লক্ষ বারের উপরে বিনিময় করা হয়েছে। চারিদিকে যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি, সবাই এই ইমেইল পেয়েছেন, এবং তারাও আমার মতো এতদিন আতঙ্কিত ছিলেন।

এই ইমেইলটা নিঃসন্দেহে একটা সফল মিম, যা আমাদের মস্তিষ্কের আবেগ এবং যুক্তিকে ব্যবহার করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ভাইরাসের মতো। ছড়িয়ে পড়ার জন্য যা যা বৈশিষ্ট্য দরকার সবই ছিল ইমেইলটায় –

- এটি ছিল *বিশ্বাসযোগ্য*।

- এটি ছিল *প্রাসঙ্গিক*।
- এটি বহন করেছিল *ভয়াল* বার্তা।
- সহজেই অন্যের মধ্যে *সঞ্চালনযোগ্য*।

এ ধরণের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে ধ্যান ধারণা ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে কেন – এটা বুঝলে ধর্ম যে একটা ভাইরাস সেটাও বোধগম্য হবে আশা করি। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী থাকে, যেগুলো না মানলে নরকের ভয়, শাস্তির ভয় দেখানো হয়, সেই নির্দেশাবলীগুলোকে যতদূর সম্ভব প্রাসঙ্গিক এবং বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, এবং বিভিন্ন উপায়ে মানুষের মধ্যে সঞ্চালন করার প্রয়াস নেয়া হয়। এভাবেই সংক্রমিত হয় বিশ্বাসের ভাইরাস, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

প্যারাসাইটিক সংক্রমণ

ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো কিভাবে প্যারাসাইটের মতো মানব মস্তিষ্ককে অধিগ্রহণ করে ফেলে, তার ধরণটা বুঝতে হলে আমাদের জীববিজ্ঞানের দিকে তাকাতে হবে। কিছু উদাহরণ আমরা প্রথম অধ্যায়ে পেয়েছি। এখানে আমরা আরেকটু বিস্তৃতভাবে উদাহরণগুলোর সাথে পরিচিত হব। কিছু উদাহরণ আছে হাতের সামনেই –

- নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম নামে এক ফিতাকৃমি সদৃশ প্যারাসাইট (বৈজ্ঞানিক নাম *Spinochordodes tellinii*) ঘাসফড়িং-এর মস্তিষ্ককে সংক্রমিত করে ফেললে ঘাসফড়িং পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, যার ফলে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্মের প্রজননে সুবিধা হয়। অর্থাৎ নিজের প্রজননগত সুবিধা পেতে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম বেচারা ঘাসফড়িংকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে[80]।
- জলাতঙ্ক রোগের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। পাগলা কুকুর কামড়ালে আর উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু মস্তিষ্ক অধিকার করে ফেলে। ফলে আক্রান্ত মস্তিষ্কের আচরণও পাগলা কুকুরের মতোই হয়ে ওঠে। আক্রান্ত ব্যক্তি অপরকেও কামড়াতে যায়। অর্থাৎ, ভাইরাসের সংক্রমণে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।
- ল্যাংসেট ফ্লুক নামে এক ধরণের প্যারাসাইটের সংক্রমণের ফলে পিঁপড়া কেবল ঘাস বা পাথরের গা বেয়ে উঠা নামা করে। কারণ এই প্যারাসাইটগুলো বংশবৃদ্ধি করতে পারে শুধুমাত্র তখনই যখন কোনো গরু বা ছাগল একে ঘাসের সাথে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। ফলে প্যারাসাইট নিরাপদে সেই গরুর পেটে গিয়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

---

[80] Shaoni Bhattacharya, Parasites brainwash grasshoppers into death dive, New Scientists, August 2005

নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম যেমনিভাবে ঘাসফড়িংকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে, ঠিক তেমনি ধর্মের বিভিন্ন বাণী এবং জিহাদি শিক্ষা মানুষকে অনেকসময়ই ভাইরাস কিংবা প্যারাসাইটের মতো সংক্রমিত করে আত্মঘাতী করে তুলে। ফলে আক্রান্ত সন্ত্রাসী মনন বিমান নিয়ে আছড়ে পড়ে টুইন টাওয়ারের উপর কখনো বা উন্মত্ত হয়ে উঠে 'থাবা বাবা'র মতো কোন নাস্তিকদের খুঁজে খুঁজে হত্যার জন্য।

ভাইরাস আক্রান্ত মনন

ইতিহাসের পরতে পরতে অজস্র উদাহরণ লুকিয়ে আছে – কীভাবে বিশ্বাসের ভাইরাসগুলো আণবিক বোমার মতোই মারণাস্ত্র হিসেবে কাজ করে লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়েছে। ধর্মযুদ্ধগুলোই তো এর বাস্তব প্রমাণ। কিছু নমুনা আমরা হাজির করেছিলাম 'অবিশ্বাসের দর্শন' বইয়ে[৪১]। রায়হান আবীরের সাথে লেখা এই বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ২০১১ সালে। এক বছরের মধ্যে বইটির সকল কপি নিঃশেষিত হয়ে গেলে, এর পরের বছর অর্থাৎ ২০১২ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেই সংস্করণও এখন নিঃশেষের পথে। বইটিতে ২০১২ সাল পর্যন্ত ভাইরাস আক্রান্ত মননের তালিকা ছিল, কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোও ঘটনাবহুল। সে সব বছরের নতুন কিছু ঘটনা সন্নিবেশিত হল তালিকায় –

- ইতিহাসের প্রথম ক্রুসেড সংগঠিত হয়েছিল ১০৯৫ সালে। সেসময় 'Deus Vult' (ঈশ্বরের ইচ্ছা) ধ্বনি দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে জার্মানির রাইন ভ্যালিতে হত্যা করা হয় এবং বাস্তুচ্যুত করা হয়। জেরুজালেমের প্রায় প্রতিটি অধিবাসীকে হত্যা করা হয় শহর 'পবিত্র' করার নামে।
- দ্বিতীয় ক্রুসেড পরিচালনার সময় সেন্ট বার্নার্ড ফতোয়া দেন, 'প্যাগানদের হত্যার মাধ্যমেই খ্রিস্টানদের গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব।'
- প্রাচীন আরবে 'জামালের যুদ্ধে' প্রায় দশ হাজার মুসলিম নিহত হয়েছিল, তাদের আপন জ্ঞাতিভাই মুসলিমদের দ্বারাই। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ নিজেও বনি কুরাইজার ৭০০ বন্দিকে একসাথে হত্যা করেছিলেন বলে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।
- বাইবেল থেকে (নাম্বারস ৩১:১৬-১৮) জানা যায়, মুসা প্রায় এক লক্ষ লোক এবং আটষট্টি হাজার অসহায় রমণীকে হত্যা করেছিলেন।
- রামায়ণে রাম তার তথাকথিত 'রাম রাজ্যে' শম্বুককে হত্যা করেছিলেন বেদ পাঠ করার অপরাধে।
- প্রাচীন মায়া সভ্যতায় নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। অদৃশ্য ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে মাথা কেটে ফেলে, হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলে, অন্ধকূপে ঠেলে ফেলে দিয়ে

---

[৪১] অভিজিৎ রায় এবং রায়হান আবীর, অবিশ্বাসের দর্শন, জাগৃতি, ২০১৫

হত্যা করা হতো। ১৪৪৭ সালে গ্রেট পিরামিড অফ টেনোখটিটলান তৈরির সময় চার দিনে প্রায় ৮০,৪০০ বন্দিকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা হয়েছিল। শুধু মায়া সভ্যতাতে নয় – সারা পৃথিবীতেই এ ধরণের উদাহরণ আছে। পেরুতে প্রি-ইনকা উপজাতিরা 'হাউজ অব দ্য মুন' মন্দিরে শিশুদের হত্যা করতো। তিব্বতে বন শাহমানেরা ধর্মীয় রীতির কারণে মানুষ হত্যা করতো। বোর্নিওতে বাড়ির ইমারত বানানোর আগে প্রথম গাঁথুনিটা এক কুমারীর দেহ দিয়ে প্রবেশ করানো হতো – 'ভূমিদেবতা' কে তুষ্ট করার খাতিরে। প্রাচীন ভারতে দ্রাবিড়রা গ্রামের ঈশ্বরের নামে মানুষ উৎসর্গ করতো। কালীভক্তরা প্রতি শুক্রবারে শিশুবলি দিত।

- তৃতীয় ক্রুসেডে রিচার্ডের আদেশে তিন হাজার বন্দিকে – যাদের অধিকাংশই ছিলেন নারী এবং শিশু – জবাই করে হত্যা করা হয়। ইসমাইলি শিয়া মুসলিমদের একটি অংশ এক সময় লুকিয়ে ছাপিয়ে বিধর্মী প্রতিপক্ষদের হত্যা করতো। এগারো থেকে তের শতক পর্যন্ত আধুনিক ইরান, ইরাক এবং সিরিয়ায় বহু নেতা তাদের হাতে প্রাণ হারায়। শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের আরেক দস্যুদল মোঙ্গলদের হাতে তাদের উচ্ছেদ ঘটে – কিন্তু তাদের বীভৎস কীর্তি আজও অম্লান।
- কথিত আছে, এগারো শতকের শুরুর দিকে ইহুদিরা খ্রিস্টান শিশুদের ধরে নিয়ে যেত, তারপর উৎসর্গ করে তাদের রক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতো। এই 'রক্তের মহাকাব্য' রচিত হয়েছে এমনি ধরণের শত সহস্র অমানবিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে।
- ১২০৯ সালে পোপ তৃতীয় ইনসেন্ট উত্তর ফ্রান্সের আলবিজেনসীয় খ্রিস্টানদের উপর আক্ষরিক অর্থেই ক্রুসেড চালিয়েছিলেন। শহর দখল করার পর যখন সৈন্যরা ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছিল কীভাবে বন্দিদের মধ্যে থেকে বিশ্বাসী এবং অধার্মিকদের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। পোপ তখন আদেশ দিয়েছিলেন – 'সবাইকে হত্যা করো।' পোপের আদেশে প্রায় বিশ হাজার বন্দিকে চোখ বন্ধ করে ঘোড়ার পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়।
- মুসলিমদের পবিত্র যুদ্ধ 'জিহাদ' উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে স্পেন পর্যন্ত রক্তাক্ত করে তোলে। তারপর এই জিহাদের মড়ক প্রবেশ করে ভারতে। তারপর চলে যায় বলকান (ক্যাথলিক ক্রোয়েশিয়ান, অর্থোডক্স সার্ব এবং মুসলিম বসনিয়ান এবং কসোভা) থেকে অস্ট্রিয়া পর্যন্ত।
- বারো শতকের দিকে ইনকারা পেরুতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, যে সাম্রাজ্যের পুরোধা ছিলেন একদল পুরোহিত। তারা ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ২০০ শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।
- ১২১৫ সালের দিকে চতুর্থ ল্যাটেরিয়ান কাউন্সিল ঘোষণা করে তাদের বিস্কুটগুলো (host wafer) নাকি অলৌকিকভাবে যিশুর দেহে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এরপর একটি গুজব রটিয়ে দেয়া হয় যে, ইহুদিরা নাকি সেসব পবিত্র বিস্কুট চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এই গুজবের উপর ভিত্তি করে ১২৪৩ সালের দিকে অসংখ্য ইহুদিকে জার্মানিতে হত্যা করা হয়। একটি রিপোর্টে দেখা যায় ছয় মাসে ১৪৬ জন ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল। এই

'পবিত্র হত্যাযজ্ঞ' চলতে থাকে প্রায় ১৮ শতক পর্যন্ত।

- বারো শতকের দিকে সারা ইউরোপ জুড়ে আলবেজেনসীয় ধর্মদ্রোহীদের খুঁজে খুঁজে হত্যার রীতি চালু হয়। ধর্মদ্রোহীদের কখনো পুড়িয়ে, কখনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে, কখনোবা শিরচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। পোপ চতুর্থ ইনোসেন্ট এই সমস্ত হত্যায় প্রত্যক্ষ ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। কথিত আছে ধর্মবিচরণ সভার সংবীক্ষক (Inquisitor) রবার্ট লি বোর্জে এক সপ্তাহে ১৮৩ জন ধর্মদ্রোহীকে হত্যার জন্য পাঠিয়েছিলেন।
- বহু লোক সেসময় নিপীড়ন থেকে বাঁচতে ধর্মত্যাগ করেন, কিন্তু সেসমস্ত ধর্মত্যাগীদের পুরনো ধর্মের অবমাননার অজুহাতে হত্যার আদেশ দেয়া হয়। স্পেনে প্রায় ২০০০ ধর্মত্যাগীকে পুড়িয়ে মারা হয়। কেউ কেউ ধর্মত্যাগ না করলেও ধর্মের অবমাননার অজুহাতে পোড়ানো হয়। জিওর্দানো ব্রুনোর মতো দার্শনিককে বাইবেল-বিরোধী কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব সমর্থন করার অপরাধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয় সেসময়।
- ইতিহাস খ্যাত 'ব্ল্যাক ডেথ' যখন সারা ইউরোপে ১৩৪৮- ১৩৪৯ এ ছড়িয়ে পড়েছিল, গুজব ছড়ানো হয়েছিল এই বলে যে, ইহুদিরা কুয়ার জল কিছু মিশিয়ে বিষাক্ত করে দেয়ায় এমনটি ঘটছে। বহু ইহুদিকে এ সময় সন্দেহের বশে জবাই করে হত্যা করা হয়। জার্মানিতে পোড়ানো দেহগুলোকে স্তূপ করে মদের বড় বড় বাক্সে ভরে ফেলা হয় এবং রাইন নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। উত্তর জার্মানিতে ইহুদিদের ছোট্ট কুঠুরিতে গাদাগাদি করে রাখা হয় যেন তারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়, কখনোবা তাদের পিঠে চাবুক কষা হয়। থারিঞ্জিয়ার যুবরাজ জনসমক্ষে ঘোষণা করেন যে, তিনি তার ইহুদি ভৃত্যকে ঈশ্বরের নামে হত্যা করেছেন; অন্যদেরকেও তিনি একই কাজে উৎসাহিত করেন।
- তের শতকে অ্যাজটেক সভ্যতা যখন বিস্তার লাভ করেছিল, নরবলি প্রথার বীভৎসতার তখন স্বর্ণযুগ। প্রতি বছর প্রায় বিশ হাজার লোককে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করা হতো। তাদের সূর্যদেবের নাকি দৈনিক 'পুষ্টি'র জন্য মানব রক্তের খুব দরকার পড়তো। বন্দিদের কখনো শিরচ্ছেদ করা হতো, এমন কি কোনো কোনো অনুষ্ঠানে তাদের দেহ টুকরো টুকরো করে ভক্ষণ করা হতো। কখনোবা পুড়িয়ে মারা হতো, কিংবা উঁচু জায়গা থেকে ফেলে দেয়া হতো। বর্ণিত আছে, তাদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এক অক্ষতযোনি কুমারীকে দিয়ে ২৪ ঘণ্টা ধরে নাচানো হয়, তারপর তার গায়ের চামড়া তুলে ফেলে পুরোহিত তা পরিধান করেন, তারপর আরো ২৪ ঘণ্টা ধরে নাচতে থাকেন। রাজা আহুইতজোলের রাজ্যাভিষেকে আশি হাজার বন্দিকে শিরচ্ছেদ করে ঈশ্বরকে তুষ্ট করা হয়।
- ১৪০০ সালের দিকে ধর্মদ্রোহীদের থেকে চার্চের দৃষ্টি চলে যায় উইচক্র্যাফটের দিকে। চার্চের নির্দেশে হাজার হাজার রমণীকে 'ডাইনি' সাব্যস্ত করে পুড়িয়ে মারা শুরু হয়। এই ডাইনি পোড়ানোর রীতি এক ডজনেরও বেশি দেশে একেবারে গণহিস্টেরিয়ায় রূপ নেয়। সেসময় কতজনকে এরকম ডাইনি বানিয়ে পোড়ানো হয়েছে? সংখ্যাটা এক লক্ষ থেকে শুরু করে ২০ লক্ষ ছড়িয়ে যেতে পারে। ঠগ বাছতে গা উজাড়ের মতোই ডাইনি বাছতে গিয়ে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দেয়া হয়েছে। সতের শতকের প্রথমার্ধে অ্যালজাস (Alsace) নামের ফরাসি প্রদেশে ৫০০০ ডাইনিকে হত্যা করা হয়, ব্যাম্বার্গের ব্যাভারিয়ান

নগরীতে ৯০০ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়। ডাইনি পোড়ানোকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ধর্মীয় উন্মত্ততা সেসময় অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দেয়।

- সংখ্যালঘু প্রটেস্টান্ট হুগেনটস ১৫০০ সালের দিকে ফ্রান্সের ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের দ্বারা নির্মম নিপীড়নের শিকার হয়। ১৫৭২ সালে সেন্ট বার্থোলোমিও দিবসে ক্যাথরিন দ্য মেদিসিস গোপনে তাদের ক্যাথলিক সৈন্য হুগেনটসের বসতিতে প্রেরণ করে আক্ষরিক অর্থেই তাদের কচুকাটা করে। প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে এই হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে আর এতে প্রাণ হারায় অন্তত দশ হাজার হুগেনটস। হুগেনটসদের উপর সংখ্যাগুরু খ্রিস্টানদের আক্রোশ পরবর্তী দুই শতক ধরে অব্যাহত থাকে। ১৫৬৫ সালের দিকে একটি ঘটনায় হুগেনটসের একটি দল ফ্লোরিডা পালিয়ে যাবার সময় স্প্যানিশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে – তাদের এলাকার সবাইকে ধরে ধরে হত্যা করা হয়।
- আবার ওদিকে পনেরো শতকে ভারতে কালীভক্ত কাপালিকের দল মা কালীকে তুষ্ট করতে গিয়ে বহু মানুষকে শ্বাসরোধ আর জবাই করে হত্যা করতো। এই কুৎসিত রীতির বলি হয়ে প্রাণ হারায় প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ। এখনও কিছু মন্দিরে বলি দেওয়ার রীতি চালু আছে – তবে আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের গ্যাঁড়াকলে পড়ে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা আর আগের মতো মানুষকে বলি দিতে পারে না – সেই ঝাল ঝাড়া হয় নিরীহ পাঁঠার উপর দিয়ে। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েই আধুনিক যুগে এভাবে রক্তলোলুপ মা কালীকে তুষ্ট রাখা হয়।
- ১৫৮৩ সালে ভিয়েনায় ১৬ বছরের একটা মেয়ের পেট ব্যথা শুরু হলে যিশুভক্তের দল তার উপর আট সপ্তাহ ধরে এক্সরসিজম বা ওঝাগিরি শুরু করে। এই যিশুভক্ত পাদ্রির দল ঘোষণা করেন যে, তারা মেয়েটির দেহ থেকে ১২,৬৫২ টা শয়তান তাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। পাদ্রির দল ঘোষণা করে যে, মেয়েটির দাদী কাচের জারে মাছির অবয়বে শয়তান পুষতেন। সেই শয়তানের কারণেই মেয়েটার পেটে ব্যথা হতো। দাদীকে ধরে নির্যাতন করতে করতে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় যে দাদী আসলে ডাইনি, শয়তানের সাথে নিয়মিত 'সেক্স' করেন তিনি। অতঃপর দাদীকে ডাইনি হিসেবে সাব্যস্ত করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। এটি তিন শতক ধরে ডাইনি পোড়ানোর নামে যে লক্ষ লক্ষ মহিলাকে পোড়ানো হয়েছিল, তার সামান্য একটি নমুনা মাত্র।
- এনাব্যাপ্টিস্টরা এক সময় ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টান্ট অথোরিটিদের দ্বারা স্রেফ কচুকাটা হয়েছিলেন। জার্মানির মুন্সটারে এনাব্যাপ্টিস্টরা এক সময় শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় আর 'নতুন জিয়ন' প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। ওদিকে আবার পাদ্রি মোল্লারা এনাব্যাপ্টিস্টদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলে এবং শহরেরে পতনের পর এনাব্যাপ্টিস্ট নেতাদের হত্যা করে চার্চের চূড়ায় লটকে রাখা হয়।
- প্রটেস্টান্ট এবং ক্যাথলিকদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ১৬১৮ সালে শুরু হয়ে ত্রিশ বছর যাবত চলে। এ সময় পুরো মধ্য ইউরোপ পরিণত হয়েছিল বধ্য ভূমিতে। জার্মানির জনসংখ্যা ১৮ মিলিয়ন থেকে ৪ মিলিয়নে নেমে আসে। আরেকটি হিসাব মতে, জনসংখ্যার প্রায় ত্রিশ ভাগ (এবং পুরুষদের পঞ্চাশ ভাগ) এ সময় নিহত হয়েছিল।
- ইসলামের জিহাদের নামে গত বারো শতক ধরে সারা পৃথিবীতে মিলিয়নের উপর মানুষকে

হত্যা করা হয়েছে। প্রথম বছরগুলোতে মুসলিম বাহিনী খুব দ্রুতগতিতে পূর্বে ভারত থেকে পশ্চিমে মরক্কো পর্যন্ত আগ্রাসন চালায়। শুধু বিধর্মীদেরই হত্যা করে নি, নিজেদের মধ্যেও কোন্দল করে নানা দল উপদল তৈরি করেছিল। কারিজিরা যুদ্ধ শুরু করেছিল সুন্নিদের বিরুদ্ধে। আজারিকিরা অন্য 'পাপীদের' মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। ১৮০৪ সালে উসমান দান ফোডিও, সুদানের পবিত্র সত্তা, গোবির সুলতানের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরু করে। ১৮৫০ সালে আরেক সুদানীয় সুফি উমর-আল হজ্জ্ব প্যাগান আফ্রিকান গোত্রের উপরে নৃশংস বর্বরতা চালায় – গণহত্যা এবং শিরচ্ছেদ করে ৩০০ জন বন্দির উপর। ১৯৮০ সালে তৃতীয় সুদানীয় 'হলি ম্যান' মুহাম্মদ আহমেদ জিহাদ চালিয়ে ১০,০০০ মিশরীয় হত্যা করে।

- ১৮০১ সালে রোমানিয়ার পাদ্রিরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে ১২৮ জন ইহুদিকে হত্যা করে।
- ভারতে ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে ৮১৩৫ নারীকে সতীদাহের নামে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় (প্রতিবছর হত্যা করা হয় গড়পড়তা ৫০৭ থেকে ৫৬৭ জনকে)।
- ১৮৪৪ সালে পার্সিয়ায় বাহাই ধর্মপ্রচার শুরু হলে কট্টরপন্থী ইসলামিস্টরা এদের উপর চড়াও হয়। বাহাই ধর্মের প্রবর্তককে বন্দি এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হয়। দুই বছরের মধ্যে সেখানকার মৌলবাদী সরকার ২০,০০০ বাহাইকে হত্যা করে। তেহরানের রাস্তাঘাট আক্ষরিক অর্থেই রক্তের বন্যায় ভেসে যায়।
- বার্মায় ১৮৫০ সাল পর্যন্ত মানুষকে বলি দেয়ার রেওয়াজ ছিল। যখন রাজধানী মান্দালায় সরিয়ে নেয়া হয়, তখন নগর রক্ষা করার জন্য ৫৬ জন 'নিষ্কলুষ' লোককে প্রাচীরের নিচে পুঁতে ফেলা হয়। রাজ জ্যোতিষীরা ফতোয়া দেয় যে নগর বাঁচাতে হলে আরো ৫০০ জন নারী, পুরুষ এবং শিশু বলি দিতে হবে। সেই ফতোয়া অনুযায়ী বলি দেয়া শুরু হয় এবং ১০০ জনকে বলি দেয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপে সেই বলিপ্রথা রদ করা হয়।
- ১৮৫৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে এনফিল্ড রাইফেলের কার্ট্রিজ, যেটাতে শুয়োর আর গরুর চর্বি লাগানো ছিল বলে গুজব রটানো হয়, তাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা শুরু হয় এবং নির্বিচারে বহু লোককে হত্যা করা হয়।
- ১৯০০ সালে তুর্কি মুসলিমেরা খ্রিস্টান আর্মেনিয়ানদের উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়।
- ১৯২০ সালে ক্রিস্টেরো যুদ্ধে ৯০ হাজার মেক্সিকান মৃত্যুবরণ করে।
- ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগকে কেন্দ্র করে দাঙ্গায় প্রায় ১ মিলিয়ন লোক মারা যায়। এমন কি 'মহাত্মা' গান্ধীও দাঙ্গা রোধ করতে সফল হন নি, এবং তাকেও বেঘোরে হিন্দু ফ্যানাটিক নথুরাম গডসের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়।
- ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে খ্রিস্টান, এনিমিস্ট এবং মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ৫০০,০০০ লোক মারা যায়।
- ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের উপর গণহত্যা চালায়, নয় মাসে তারা প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যা করে, ধর্ষণ করে ২ লক্ষ নারীকে। যদিও এই যুদ্ধের পেছনে মদদ ছিল রাজনৈতিক, তারপরেও ধর্মীয় ব্যাপারটিও উপেক্ষণীয় নয়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের বরাবরই অভিযোগ ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানিরা 'ভালো মুসলমান' নয়, এবং

তারা ভারতের দালাল।

- ১৯৭৮ সালে গায়ানার জোন্সটাউনে রেভারেন্ড জিম জোন্স সেখানে ভ্রমণরত কংগ্রেসম্যান এবং তিনজন সাংবাদিককে হত্যার পর ৯০০ জনকে নিয়ে আত্মহত্যা করে, যা সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দেয়।
- ইসলামি আইন মোতাবেক চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কেটে ফেলার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। সুদানে ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে প্রায় ৬৬ জনকে ধরে প্রকাশ্যে হাত কেটে ফেলা হয়। মডারেট মুসলিম নেতা মোহাম্মদ তাহাকে ফাঁসিতে লটকে মেরা ফেলা হয় – কারণ তিনি হাত কেটে ফেলার মতো বর্বরতার প্রতিবাদ করেছিলেন।
- সৌদি আরবে ১৯৭৭ সালে কিশোরী প্রিন্সেস এবং তার প্রেমিককে 'ব্যাভিচারের' অপরাধে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানে ১৯৮৭ সালে এক কাঠুরিয়ার মেয়েকে 'জেনা' করার অপরাধে পাথর ছুঁড়ে হত্যার ফতোয়া দেয়া হয়। ১৯৮৪ সালে আরব আমিরাতে একটি বাড়ির গৃহভৃত্য এবং দাসীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার ফতোয়া দেয়া হয়, অবৈধ মেলামেশার অপরাধে।
- নাইজেরিয়ায় ১৯৮২ সালে মাল্লাম মারোয়ার ফ্যানাটিক অনুসারীরা প্রতিপক্ষের শতাধিক লোকজনকে 'কাফের' আখ্যা দিয়ে হত্যা করে, আর তাদের রক্তপান করে।
- ১৯৮৩ সালে উত্তর আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক সন্ত্রাসীরা প্রটেস্টান্ট চার্চে ঢুকে গোলাগুলি করে প্রটেস্টান্ট অনুসারীদের হত্যা করে। দাঙ্গায় প্রায় ২৬০০ লোক মারা যায়।
- হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা ভারতে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ১৯৮৩ সালে আসামে এরকম একটি দাঙ্গায় ৩,০০০ জন মানুষ মারা যায়। ১৯৮৪ সালে এক হিন্দু নেতার ছবিতে কোনো এক মুসলিম জুতার মালা পরিয়ে দিলে এ নিয়ে পুনরায় দাঙ্গা শুরু হয়, সেই দাঙ্গায় ২১৬ জন মারা যায়, ৭৫৬ জন আহত হয়, আর ১৩,০০০ জন উদ্বাস্তু হয়। কারাবন্দি হয় ৪১০০ জন।
- লেবাননে ১৯৭৫ সালের পর থেকে সুইসাইড বোম্বিংসহ নানা সন্ত্রাসবাদী ঘটনায় ১৩০,০০০ জন লোক মারা গেছে।
- ইরানের মৌলবাদী শিয়া সরকার ঘোষণা করে যে সমস্ত বাহাই ধর্মান্তরিত না হবে, তাদের হত্যা করা হবে। ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে প্রায় ২০০ জন 'গোঁয়ার' বাহাইকে হত্যা করা হয়, প্রায় ৪০,০০০ বাহাই দেশ ছেড়ে পালায়।
- শ্রীলঙ্কা বিগত শতকের আশি আর নব্বইয়ের দশকে বৌদ্ধ সিংহলী আর হিন্দু তামিলদের লড়াইয়ে আক্ষরিক অর্থেই নরকে পরিণত হয়।
- ১৯৮৩ সালে জেরুজালেমের ধর্মীয় নেতা মুফতি শেখ সাদ ই-দীন এল আলামী ফতোয়া দেন এই বলে যে, কেউ যদি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আজাদকে হত্যা করতে পারে, তবে তার বেহেস্ত নিশ্চিত।
- ভারতে আশির দশকে শিখ জনগোষ্ঠী নিজেদের জন্য পাঞ্জাব এলাকায় আলাদা ধর্মীয় রাজ্য 'খালিস্তান' (Land of the Pure) তৈরির পায়তারা করে আর এর নেতৃত্ব দেয় শিখ চরমপন্থি নেতা জারনাইন ভিন্দ্রানওয়ালা, যিনি তার অনুসারীদের শিখিয়েছিলেন যে, প্রতিপক্ষকে 'নরকে পাঠানো' তাদের পবিত্র দায়িত্ব। চোরাগোপ্তাভাবে পুরো আশির দশক

জুড়েই বহু হিন্দুকে হত্যা করা হয়।

- ১৯৮৪ সালে শিখ দেহরক্ষীদের হাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিহত হলে সারা ভারত জুড়ে শিখদের উপর বীভৎস তাণ্ডবলীলা চালানো হয়। তিন দিনের মধ্যে ৫০০০ শিখকে হত্যা করা হয়। শিখদের বাসা থেকে উঠিয়ে, বাস থেকে নামিয়ে, দোকান থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়, কখনো জীবন্ত পুড়িয়ে দেয়া হয়।
- ১৯৮৯ সালে 'স্যাটানিক ভার্সেস' নামের উপন্যাস লেখার দায়ে সালমান রুশদিকে ফতোয়া দেয়া হয় ইরানের ধর্মগুরু আয়াতোল্লা খোমেনির পক্ষ থেকে। বইটি না পড়েই মুসলিম বিশ্বে রাতারাতি শুরু হয় জ্বালাও পোড়াও তাণ্ডব। ইসলামকে অবমাননা করে লেখার দায়ে এর আগেও মনসুর আল হাল্লাজ, আলী দাস্তি, আজিজ নেসিন, উইলিয়াম নেগার্ড, নাগিব মাহফুজ, তসলিমা নাসরিন, ডঃ ইউনুস শায়িখ, রবার্ট হুসেইন, হুমায়ুন আজাদ, আয়ান হারসি আলীসহ অনেকেই মৃত্যু পরোয়ানা পেয়েছেন। এদের মধ্যে অনেককেই মেরে ফেলা হয়েছে, কেউবা হয়েছেন পলাতক।
- ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর রামজন্মভূমি মিথকে কেন্দ্র করে হিন্দু উগ্রপন্থীরা শত বছরের পুরনো বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে। এর ফলে দাঙ্গায় ২০০০ মানুষ মারা যায়, এর প্রভাব পড়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও।
- ১৯৯৭ সালে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বর্গের দ্বার (Heaven's Gate) নামে এক 'ইউএফও' ধর্মীয় সংগঠনের ৩৯ জন সদস্য একযোগে আত্মহত্যা করে, জীবনের 'পরবর্তী' স্তরে যাবার লক্ষ্যে।
- বাংলাদেশে ১৯৪১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল শতকরা ২৮ ভাগ। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের অব্যবহিত পরে তা শতকরা ২২ ভাগে এসে দাঁড়ায়। এরপর থেকেই সংখ্যালঘুদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার এবং নিপীড়নের ধারাবাহিকতায় দেশটিতে ক্রমশ হিন্দুদের সংখ্যা কমতে থাকে। ১৯৬১ সালে ১৮.৫%, ১৯৭৪ সালে কমে দাঁড়ায় ১৩.৫%, ১৯৮১ সালে ১২.১%, এবং ১৯৯১ সালে ১০% এ এসে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে হিন্দুদের শতকরা হার কমে ৮ ভগের নিচে নেমে এসেছে বলে অনুমিত হয়।
- ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন টাওয়ারের উপর আল কায়দা আত্মঘাতী বিমান হামলা চালায়, এই হামলায় টুইন টাওয়ার ধ্বসে পড়ে, মারা যায় ৩০০০ আমেরিকান নাগরিক। এ ভয়াবহ ঘটনা সারা বিশ্বের গতি-প্রকৃতিকে বদলে দেয়।
- ২০০২ সালে ভারতের গুজরাটে দাঙ্গায় ২০০০ মানুষ মারা যায়, উদ্বাস্তু হয় প্রায় ১৫০,০০০ মানুষ। নারী নির্যাতন প্রকট আকার ধারণ করে। বহু মুসলিম কিশোরী এবং নারীকে উপর্যুপরি ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়।
- ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বাংলাদেশে বিএনপি-জামাত বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বেছে বেছে হিন্দুবাড়িগুলোতে আক্রমণ চালানো হয়। পূর্ণিমা রানীর মতো বহু কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার প্রথম ৯২ দিনের মধ্যে ২২৮টি ধর্ষণের ঘটনা, এবং পরবর্তী তিনমাসে প্রায় ১০০০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে শতকরা ৯৮ ভাগ ছিল হিন্দু কিংবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

- বিএনপি জামাত কোয়ালিশন সরকারের সময় বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে জাগ্রত মুসলিম জনতার (জে.এম.জে.) উত্থান ঘটে। তারা পুলিশের ছত্রছায়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। একটি ঘটনায় একজন গ্রামবাসীকে হত্যা করে গাছের সাথে উল্টো করে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে 'বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি' বলে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়।
- ২০০৪ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রথা-বিরোধী লেখক হুমায়ুন আজাদের উপর হামলা চালায় মৌলবাদী জে.এম.বি। চাপাতি দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলা হয় তার দেহ, যা পরে তাকে প্রলম্বিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।
- ২০০৪ সালের ২রা নভেম্বর চিত্র পরিচালক থিও ভ্যান গগকে প্রকাশ্যে রাস্তায় গুলি এবং ছুরিকাহত করে হত্যা করে সন্ত্রাসী মোহাম্মদ রোয়েরি। সাবমিশন নামের দশ মিনিটের একটি 'ইসলাম বিরোধী' চলচ্চিত্র বানানোর দায়ে তাকে নেদারল্যান্ডসের রাস্তায় প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। একই ছবির সাথে জড়িত থাকার কারণে নারীবাদী লেখিকা আয়ান হারসি আলীকেও মৃত্যু পরোয়ানা দেয়া হয়।
- ২০০৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর জেলেন্ডস পোস্টেন নামের একটি ড্যানিশ পত্রিকা মহানবী হযরত মুহাম্মদকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ১২টি কার্টুন প্রকাশ করলে সারা মুসলিম বিশ্বে এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জ্বালাও-পোড়াও শুরু হয়। পাকিস্তানের এক ইমাম কার্টুনিস্টের মাথার দাম ধার্য করে এক মিলিয়ন ডলার। সিরিয়া, লেবানন, ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে সহিংসতায় মারা যায় শতাধিক লোক। ব্রিটেনের মুসলিমেরা ব্যানার নিয়ে মিছিল করে – 'Behead those who say Islam is a violent religion'।
- ১৯৯৩ থেকে আজ পর্যন্ত 'আর্মি অব গড' সহ অন্যান্য গর্ভপাত বিরোধী খ্রিস্টান মৌলবাদীরা আট জন ডাক্তারকে হত্যা করেছে। এই ধরণের নৃশংসতার সর্বশেষ নিদর্শন ২০০৯ সালে খ্রিস্টান মৌলবাদী স্কট রোডার কর্তৃক ডঃ জর্জ ট্রিলারকে হত্যা। ন্যাশনাল অ্যাবরশন ফেডারেশনের সরবরাহকৃত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের পর থেকে আমেরিকা এবং কানাডায় গর্ভপাতের সাথে জড়িত চিকিৎসকদের মধ্যে ১৭ জনকে হত্যার প্রচেষ্টা চলানো হয়, ৩৮৩ জনকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়, ১৫৩ জনের উপর চড়াও হওয়ার এবং ৩ জনকে অপহরণের ঘটনা ঘটে।
- বাংলাদেশে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সামান্য 'মোহাম্মদ বিড়াল' নিয়ে কৌতুকের জের হিসেবে ২১ বছর বয়সী কার্টুনিস্ট আরিফকে জেলে ঢোকানো হয়, বায়তুল মোকারমের খতিবের কাছে গিয়ে প্রথম আলোর সম্পাদকের ক্ষমা প্রার্থনার নাটক প্রদর্শিত হয়।
- আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগার অজুহাতে ফেসবুক এবং পরে ইউটিউব বন্ধ করে দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়। পরে গণদাবীর প্রেক্ষিতে আবার সেগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।
- ধর্মবিরোধী লেখালিখির কারণে ব্লগার আসিফ মহিউদ্দীনকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে মৌলবাদীরা। সামহোয়্যার ইন থেকে তার ব্লগ সাইট মুছে দেয়া হয় জোর খাটিয়ে।

- ২০১৩ সালে শাহবাগ আন্দোলনের উত্তাল সময়ে রাজীব হায়দার শোভন, যিনি থাবা বাবা নামে ব্লগিং করতেন, তাকে জবাই করে হত্যা করা হয়। ধৃত অপরাধীরা স্বীকার করে 'ঈমানী দায়িত্ব' পালনের জন্য ইসলামবিদ্বেষী এই ব্লগারকে তারা হত্যা করেছে।
- সেসময় সানিউর নামে আরেক নাস্তিক ব্লগারকে ছুরিকাহত করে হত্যার চেষ্টা করা হয়।
- ধর্মবাদী দল হেফাজতে ইসলামের চাপে মুক্তচিন্তার ব্লগারদের গ্রেফতার করে বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালের পয়লা এপ্রিল। সুব্রত শুভ, মশিউর রহমান বিপ্লব এবং রাসেল পারভেজকে দাগী অপরাধীর মতো হাতকড়া পরিয়ে হাজির করা হয়। এর পর দিন আসিফ মহিউদ্দীনকে আটক করা হয়। দীর্ঘ কয়েকমাস কারাগারে আটকে রেখে তাদের জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।
- রাইফ বাদাওয়ি নামের এক ব্লগারকে ধর্মের প্রতি ক্রিটিকাল একটি লিবারেল সৌদি ওয়েব সাইট প্রতিষ্ঠা এবং লেখার দায়ে গ্রেফতার করা হয়। তাকে সাত বছরের জেল এবং ৬০০ চাবুকের বিধান দেয়া হয়েছে।
- ২০১৪ সালের মে মাসে নাইজেরিয়ার বোর্নো এলাকা থেকে ২২৩ জন স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে মুসলিম জঙ্গি দল বোকো হারাম। বিবৃতিতে তারা বলে, 'মেয়েদের স্কুলে যাওয়া উচিৎ না। বরং তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া উচিৎ। আল্লাহ তাদেরকে বিক্রি করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন'।

বলা নিষ্প্রয়োজন, উপরের তালিকাটি কেবল বিগত কয়েক শতকের কতিপয় ধর্মীয় সহিংসতার আলোকচ্ছটামাত্র, সিন্ধুর বুকে বিন্দুসম। ধর্মীয় সহিংসতার পুরো ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গেলে তা নিঃসন্দেহে মহাভারতকেও ছাড়িয়ে যাবে। অন্ধবিশ্বাস নামক ভাইরাসগুলো কীভাবে সন্ত্রাসবাদী তৈরির কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয় – তার কিছু উদাহরণ আমরা আগেই রেখেছি এই বইয়ের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। সেখানে দেখিয়েছিলাম, ধর্মগ্রন্থের ভালো ভালো বাণীগুলো থেকে ভালোমানুষ হবার অনুপ্রেরণা পায় কেউ, আবার সন্ত্রাসবাদীরা একই ধর্মগ্রন্থের ভায়োলেন্ট ভার্সগুলো থেকে অনুপ্রেরণা পায় সন্ত্রাসী হবার। সেজন্যই তো ধর্মগ্রন্থগুলো – একেকটি ট্রোজান হর্স – ছদ্মবেশী ভাইরাস!

বিশ্বাস এবং বুদ্ধিমত্তা

লন্ডন স্কুল অভ ইকনোমিকসের এক বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীর চালানো সাম্প্রতিক গবেষণা (Social Psychology Quarterly, Vol. 73, No. 1, 33 –57) থেকে জানা গেছে নাস্তিক (Atheist) এবং উদারপন্থীরা (Liberal) সাধারণত ধার্মিক (theist) এবং রক্ষণশীলদের (Conservative) চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। সোশাল সাইকোলজি কোয়ার্টারলি জার্নালে ২০১০ সালে প্রকাশিত 'Why Liberals and Atheists Are More Intelligent' শীর্ষক গবেষণাপত্রে গবেষকেরা দেখিয়েছেন যে,

ধার্মিক হিসেবে দাবিদার ব্যক্তিদের চেয়ে নাস্তিকদের আইকিউ গড়পড়তা অন্তত ৬ পয়েন্ট বেশি থাকে, আর রক্ষণশীল গ্রুপের চেয়ে উদারপন্থী বা প্রগতিশীল গ্রুপের আইকিউ বেশি থাকে অন্তত ১২ পয়েন্ট[82]।
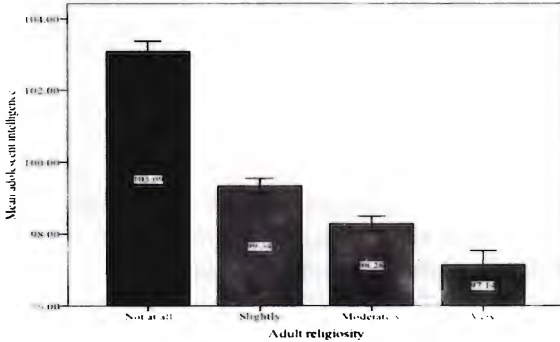
চিত্র : ধার্মিকতার প্রকোপ যত বাড়ে পাল্লা দিয়ে কমে আইকিউ। যেমন চরম নাস্তিকদের গড়পড়তা আইকিউ পাওয়া গেছে ১০৩.০৯। আর চরম ধার্মিকদের আইকিউ ৯৭.১৪। কাজেই নাস্তিক হিসেবে দাবিদার ব্যক্তিদের চেয়ে আস্তিকদের আইকিউ গড়পড়তা অন্তত ৬ পয়েন্ট কম থাকে।
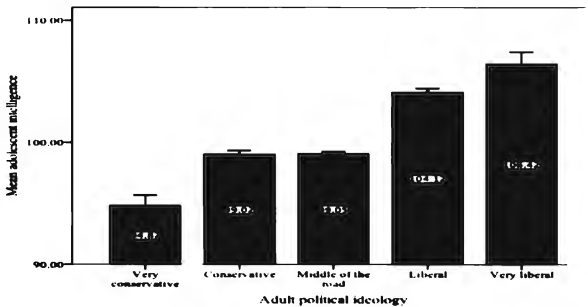
চিত্র : রক্ষণশীল গ্রুপের চেয়ে উদারপন্থী বা প্রগতিশীল গ্রুপের আইকিউ অন্তত ১২ পয়েন্ট বেশি থাকে।

[82] Satoshi Kanazawa, Why Liberals And Atheists Are More Intelligent.

ব্যাপারটি গবেষকেরা বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন [83,84]। বিশ্বাস ব্যাপারটা একসময় টিকে থাকার ক্ষেত্রে বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল, সেজন্য যেকোনো সংস্কৃতিতেই ধর্ম এবং বিশ্বাসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, এবং যেকোনো সমাজেই ধার্মিকদের সংখ্যাও নাস্তিকদের চেয়ে সাধারণত বেশি (যদিও নাস্তিকদের সংখ্যা আধুনিক বিশ্বে ক্রমবর্ধমান)। আর আদিম ট্রাইবগুলোতে খুঁজলে দেখা যাবে সেখানে জাদু টোনা থেকে শুরু করে নরবলি, কুমারী নিধনসহ হাজারো অপবিশ্বাসের সমাহার। সে দিক থেকে চিন্তা করলে নাস্তিকতা, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, লিবারেলিজম প্রভৃতি উপাদানগুলো বিবর্তনীয় প্রেক্ষাপটে মানব সমাজের জন্য অপেক্ষাকৃত নতুন সংযোজন (evolutionarily novel)। এবং যাদের মস্তিষ্ক এই নতুন নতুন পরিবর্তনগুলো ধারণ করার জন্য বেশি নমনীয়, তারাই বুদ্ধিদীপ্ত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সেজন্যই নাস্তিকেরা আস্তিকদের থেকে বেশি স্মার্ট হিসেবে প্রতিভাত হয়, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের 'সাভানা অনুকল্প' অনুযায়ী এটা ঘটে বলে গবেষণাপত্রে দাবি করা হয়েছে। সেজন্যই একজন বিশ্বাসী সারা প্যালিন কিংবা 'উইচ' খ্যাত ক্রিস্টিন ওডেনেলের চেয়ে বৌদ্ধিক মননে একজন রিচার্ড ডকিন্স কিংবা একজন বিল মার অনেক এগিয়ে থাকেন আজকের দুনিয়ায়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ফলাফলটি এসেছে ইউসিএসডি এবং হার্ভাডের সাম্প্রতিক একটা যৌথ গবেষণা থেকে যেখানে ডোপামিন নির্ভর DRD_4 জিনটিকে চিহ্নিত করা গেছে বলে দাবি করা হয়েছে, এবং যার একটা বিশেষ ভ্যারিয়ান্ট উদারপন্থীদের মাঝে দেখা যায়[85]। এ জিনটিকে বহুল প্রচারিতভাবে 'অভিনবত্ব অনুসন্ধানী' জিন (novelty seeking gene) হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। যাদের মধ্যে এ জিনটির অস্তিত্ব আছে, তার একটা বড় অংশ পরিণত বয়সে উদারপন্থী মতাদর্শের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।

এ ব্যাপারে একটা মজার বিষয় মনে পড়লো। আমেরিকার প্রচণ্ড রক্ষণশীল ফক্স চ্যানেলের নিউজ হোস্ট শন হ্যানিটি আর বিল ও রাইলি প্রতিদিনই মার্কিন জনগণকে মনে করিয়ে দেন যে কীভাবে 'লিবারেল মিডিয়া' সবকিছু অধিকার করে মগজ ধোলাই করছে! কথাটা যে খুব বেশি মিথ্যা তা অবশ্য নয়। হলিউড সিনেমা থেকে শুরু করে (ফক্স বাদে) প্রায় প্রতিটি নিউজ চ্যানেলই মোটামুটি লিবারেলদের দখলে বলা যায়।

---

[83] Satoshi Kanazawa, Why Liberals Are More Intelligent Than Conservatives, Psychology Today, March 21, 2010

[84] Satoshi Kanazawa, Why Atheists Are More Intelligent than the Religious, Psychology Today, April 11, 2010

[85] Jaime E. Settle, Christopher T. Dawes, Nicholas A. Christakis, James H. Fowler. Friendships Moderate an Association between a Dopamine Gene Variant and Political Ideology. The Journal of Politics, 2010; 72 (04): 1189

পাশাপাশি শো বিজনেস, ক্রিয়েটিভ রাইটিং, অ্যাক্টিভিজম থেকে শুরু করে অ্যাকাডেমিয়াও মোটামুটি লিবারেলরাই রাজত্ব করছে। আসলে এর কারণ খুব সহজ। মিডিয়া লিবারেলদের হাতে চলে যাচ্ছে কারণ রক্ষণশীলদের চেয়ে তারা বেশি চৌকস, বুদ্ধিদীপ্ত এবং অধিকতর বেশি উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। বাংলাদেশেও কবি সাহিত্যিকসহ যারা শিল্পকলা এবং সংস্কৃতির সাথে জড়িত থাকেন তাদের মধ্যে উদারপন্থী লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে, এবং তাদের মধ্যেই অবিশ্বাসী মুরতাদদের সংখ্যা বেশি পাওয়া যায়।

অবিশ্বাসীরা শুধু স্মার্ট নয়, গবেষণায় দেখা গেছে নৈতিক দিক দিয়েও অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী। নাস্তিক এবং প্রগতিশীল পরিবারে শিশু নির্যাতন কম হয়, তারা নারী নির্যাতন কম করে থাকে, তাদের পরিবারে বিবাহ বিচ্ছেদের হার কম, তারা একগামী সম্পর্কে আস্থাশীল থাকে, তারা পরিবেশ সচেতন থাকে ধার্মিকদের চেয়ে ঢের বেশি। সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি সচেতনতাও বিশ্বাসীদের তুলনায় নাস্তিকদের মধ্যে অনেক বেশি দেখা যায়[86]। এর কারণ, অবিশ্বাসীরা সাধারণত যুক্তি, মানবতা এবং বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিষয়গুলো বিবেচনা করেন, অন্ধবিশ্বাসের বলে নয়।

---

[86] আমেরিকায় বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে নাস্তিকদের চাইতে পুনরুজ্জীবিত খ্রিস্টানদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার বেশি (Barna Research Group, 1999 study দ্রঃ); এও দেখা গিয়েছে যে, যে পরিবারের পরিবেশ ধর্মীয়ভাবে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল সে সমস্ত পরিবারেই বরং শিশুদের উপর পরিবারের অন্য কোনো সদস্যদের দ্বারা বেশি যৌন নিপীড়ন হয়। ১৯৩৪ সালে আব্রাহাম ফ্রান্সব্লাউ তার গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, ধার্মিকতা এবং সততার মধ্যে বরং বৈরি সম্পর্কই বিদ্যমান। ১৯৫০ সালে মুরে রসের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, ধার্মিকদের তুলনায় নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরাই বরং সমাজ এবং মানুষের প্রতি সংবেদনশীল থাকেন, তাদের উন্নয়নের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ১৯৮৮ সালে ভারতের জেলখানায় দাগী আসামীদের মধ্যে একটি জরিপ চালিয়েছিল। জরিপের যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল অবাক করার মতো। দেখা গিয়েছে, আসামীদের শতকরা ১০০ জনই ঈশ্বর এবং কোনো না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী। আমেরিকায়ও এরকম একটি জরিপ চালানো হয়েছিল ৫ই মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে। সে জরিপে দেখা গেছে যে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (৮-১০%) ধর্মহীন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কম (মাত্র ০.২১%), সে তুলনায় ধার্মিকদের মধ্যে শতকরা হিসেবে অপরাধপ্রবণতা অনেক বেশি। ডেভিড উলফের মনোবিজ্ঞান এবং ধর্ম বিষয়ক গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত ধর্মপ্রবণতা এবং ধর্মের আসক্তির কারণে মানুষ অধিকতর বেশিমাত্রায় মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, অসামাজিক, অনমনীয় এবং কর্তৃত্বপরায়ণ হিসেবে গড়ে উঠে। এ সংক্রান্ত বেশ কিছু পরিসংখ্যান আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং এ ধরনের আরো পরিসংখ্যানের সাথে পরিচিত হতে চাইলে দেখা যেতে পারে ড. মাইকেল শারমারের The Science of Good and Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule (Times Books; 1st edition (February 2, 2004) গ্রন্থটি।

বিশ্বাস ও দারিদ্র্য

বিশ্বাস শুধু মানসিকভাবেই ব্যক্তিকে পঙ্গু এবং ভাইরাস আক্রান্ত করে ফেলে না, পাশাপাশি এর সার্বিক প্রভাব পড়ে একটি দেশের অর্থনীতিতেও। সাম্প্রতিক বহু গবেষণায়ই বেরিয়ে এসেছে যে দারিদ্রের সাথে ধর্মবিশ্বাসের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। সম্প্রতি প্রকাশিত (অগাস্ট, ২০১০) গ্যালোপ জরিপ থেকে দেখা গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে হতদরিদ্র দেশগুলোর মধ্যেই ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব সর্বাধিক[87]। আপনার বিশ্বাস প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় কোনো প্রভাব ফেলে কিনা, এর ভিত্তিতে ২০০৯ সালে যে জরিপ চালানো হয়, তাতে দেখা যায় পৃথিবীর সর্বাধিক দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশগুলো থেকেই 'হ্যাঁ বাচক' উত্তর উঠে এসেছে। আর তালিকাতে প্রথমেই আছে বাংলাদেশের নাম।

Is religion an important part of your daily life?

	Yes
Bangladesh	99%+
Niger	99%+
Yemen	99%
Indonesia	99%
Malawi	99%
Sri Lanka	99%
Somaliland region	98%
Djibouti	98%
Mauritania	98%
Burundi	98%

2009

GALLUP'

চিত্র : গ্যালোপ জরিপ থেকে দেখা গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে হতদরিদ্র দেশগুলোর মধ্যেই ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব সর্বাধিক

[87] Religiosity Highest in World's Poorest Nations, Gallup's global reports, August 31, 2010

সম্প্রতি উপরের এই গ্যালোপ জরিপের উপর ভিত্তি করে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বিশ্লেষণমূলক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে[৪৪]। কলামিস্ট চার্লস ব্লো সম্পাদকীয়টিতে বলেন –

একশতটি দেশের মধ্যে ২০০৯ সালে গ্যালোপ জরিপ চালানো হয়েছে এবং দেখা গেছে দারিদ্রের সাথে ধর্মবিশ্বাসের একটি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। ধনী দেশগুলো কম ধর্মপ্রবণ, আর দরিদ্র দেশগুলোতেই ধর্মান্মোদনা বেশি দৃশ্যমান।

নিউইয়র্ক টাইমসের উক্ত প্রবন্ধটিতে চমৎকার একটি গ্রাফও সংযুক্ত হয়েছে, যেটি নিজেই দারিদ্রের সাথে ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট –
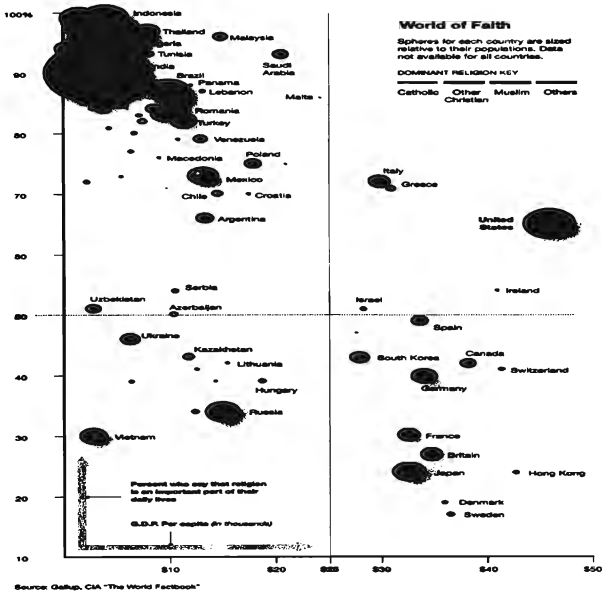
চিত্র : গ্যালোপ জরিপের উপর ভিত্তি করে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বিশ্লেষণমূলক একটি সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত

[৪৪] Charles M. Blow, Religious Outlier, The Newyork Times, Published: September 3, 2010

উপরের গ্রাফের গড়পড়তা পয়েন্টগুলোর ট্রেন্ড বিশ্লেষণে আনা যেতে পারে। যদি কেউ কোনো দেশের ধর্মীয় প্রভাব এবং পার ক্যাপিটা গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্টের প্লট একটি বক্ররেখার মাধ্যমে তুলে ধরেন তবে রেখচিত্রটি দাঁড়াবে অনেকটা এরকম –
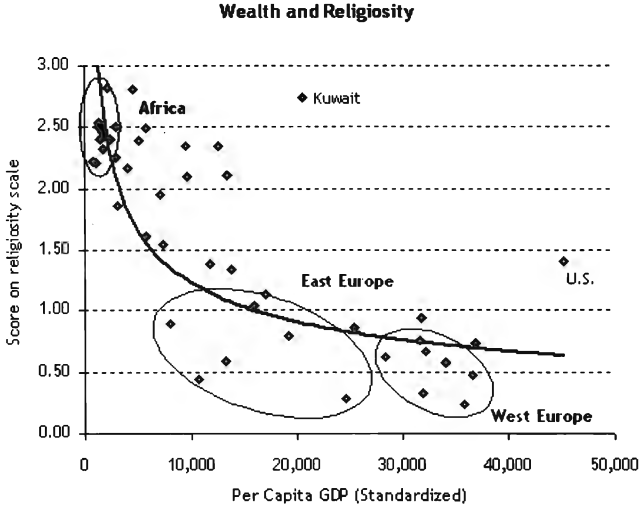
চিত্র : দেশের ধর্মীয় প্রভাব বনাম পার ক্যাপিটা জিডিপির প্লট

এই গ্রাফটি নিয়ে আমরা মুক্তমনা ব্লগে অনেক আলোচনা করেছি। এটি অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গরের 'নিউ এথিজম' বইয়ে আছে। ইন্টারনেটেও অনেক সাইটে গ্রাফটি পাওয়া যাবে[89]।

গ্রাফটি লক্ষ্য করলেই পাঠকেরা দেখবেন যে, আমেরিকা এবং কুয়েতের মতো দুয়েকটি দেশ ছাড়া বাকি সব কমবেশি দেশই এই গ্রাফের কোরিলেশন সমর্থন করে। আমেরিকা অন্যতম সচ্ছল দেশ (গড়পড়তা জিডিপি $৪৬,০০০) হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের প্রভাব বেশি। ধনসম্পদে শীর্ষস্থানীয় দেশ হওয়া সত্ত্বেও দেশটির ধর্মীয় প্রভাবের পরিমাপ

[89] World Publics Welcome Global Trade — But Not Immigration, Summary of Findings, http://pewglobal.org/2007/10/04/world-publics-welcome-global-trade-but-not-immigration/

দারিদ্র্যক্লিষ্ট মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা কিংবা চিলির সারিতে রয়ে গেছে। কেন এই ব্যতিক্রম তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একটি কারণ তো অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী চেতনার বিকাশ। একটি দেশ যখন ক্ষমতার শীর্ষে উঠে যায়, সামরিকভাবে আগ্রাসী হয়ে উঠে, তখন আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্যগুলো হারাতে থাকে। গ্রিক এবং রোমান সভ্যতার শেষদিকেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। এর বাইরে, আরেকটি বড় কারণ, আমেরিকার পুঁজিবাদ ধর্ম জিনিসটাকেও আভ্যন্তরীণভাবে ‘ব্যবসা’র পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। এখানে চার্চকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়, তা আসলে ধর্মীয় পরিবৃত্তির বাইরে গিয়েও সাধারণ জনগণকে আকৃষ্ট করে। সধারণ বসন্ত উৎসব (ফল ফেস্টিভাল) থেকে শুরু করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্লাসিক্যাল পিয়ানো বাজনার বেশিরভাগই এখানে চার্চকেন্দ্রিক। এই ‘আমেরিকান অ্যানোমালি’ আর অস্বাভাবিক উপায়ে অর্জিত তেল চুকচুকে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের কথা বাদ দিলে ধর্ম এবং দারিদ্র্যের একটা স্পষ্ট সম্পর্কই পাওয়া যায়। নবায়নযোগ্য শক্তির বিকাশ এবং এ সংক্রান্ত প্রযুক্তির উত্থানের ফলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে তেলের দাম পড়ে গেলে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোও এভাবে ব্যতিক্রম হিসেবে থাকবে না বলাই বাহুল্য।

এই দুই একটি অ্যানোমালি তথা ‘অস্বাভাবিকতা’ বাদ দিলে গ্রাফ থেকে ধর্ম এবং দারিদ্র্যের একটা স্পষ্ট সম্পর্কই পাওয়া যায়। গ্রাফ দেখলে যে কেউ বুঝবে – যে দেশে ধর্মীয় প্রভাব যত বাড়ছে, সেইসাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দারিদ্র্য, আর ধর্মীয় প্রভাব যেখানে কম মানুষের সচ্ছলতাও বেশি। ব্যাপার কী?

ব্যাপার তো সাদা চোখেই বোঝা যাবার কথা। যে সমস্ত দেশ যত দারিদ্র্যক্লিষ্ট, সেসব দেশেই ধর্ম নিয়ে বেশি নাচানাচি হয়, আর শাসকেরাও সেসব দেশে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সেজন্যই দারিদ্র্যক্লিষ্ট তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ধর্ম খুব বড় একটা নিয়ামক হয়ে কাজ করে সবসময়েই। কিংবা ব্যাপারটা উল্টোভাবেও দেখা যেতে পারে – ধর্মকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয়া, কিংবা লম্ফঝম্ফ করা, কিংবা জাগতিক বিষয় আশয়ের চেয়ে ধর্মকে মাত্রাতিরিক্ত বেশি গুরুত্ব দেয়ার কারণেই সেসমস্ত দেশগুলো প্রযুক্তি, জ্ঞান বিজ্ঞানে পিছিয়ে, এবং সর্বোপরি দরিদ্র। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সরকার মোল্লাদের তোয়াজ করতে ফেসবুক এবং ইউটিউব বন্ধ করে দিয়েছিল। যে দেশ জাগতিক বিষয়ের চেয়ে ঠুনকো বিশ্বাস নিয়েই মত্ত থাকে, সে দেশ অর্থ-বৈভব জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে যাবে – এটা কি আশা করা যায়? ধর্মের রশি আমাদের পেছনে টেনে রেখেছে অনেকটাই। বিশ্বাসের ভাইরাসের এরচেয়ে বড় কুফল আর কী হতে পারে! তাই ‘বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর’ বলে কথিত বিশ্বাসীদের তোতা পাখির মতো আউড়ানো বহুল প্রচারিত উক্তিটিকে সামান্য বদলে দিয়ে আমরা বলতে পারি –

বিশ্বাসে মিলায় দারিদ্র্য, অবিশ্বাসে বহুদূর!

ধর্ম আসলেই একটি ভাইরাস

যখন ভাইরাসের কথা বলা হয়, তখন হয়তো অনেকেই ভেবে নেন এটা স্রেফ তুলনা, এর বেশি কিছু নয়। আসলে তা নয়। আমি যখন ধর্মকে 'ভাইরাস' হিসেবে উদ্ধৃত করি, তখন আসলেই সেটাকে আক্ষরিক অর্থে ভাইরাসের মতোই মনে করি। হ্যাঁ, ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর ডিএনএ কিংবা প্রোটিনের মতো কোন ভৌত রূপ হয়তো নেই, কিন্তু অন্য সকল ক্ষেত্রে এটা প্রকৃত ভাইরাসের মতোই কাজ করে। অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গর তার 'গড – দ্য ফলি অব ফেইথ' বইয়ে ডেরেল রে'র গবেষণা থেকে ধর্মের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করেছেন[৯০] –

১) এটা মানুষকে সংক্রমিত করে।
২) অন্য ধারণার (ভাইরাসের) প্রতি প্রতিরোধ এবং এন্টিবডি তৈরি করে।
৩) কিছু বিশেষ মানসিক এবং শারীরিক ফাংশনকে অধিকার করে ফেলে, এবং সেই ব্যক্তির মধ্যে এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যে সেই ব্যক্তির পক্ষে তাকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় না।
৪) বিশেষ কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে ভাইরাসের বিস্তারে।
৫) বাহককে অনেকটা 'প্রোগ্রাম' করে ফেলে ভাইরাসের বিস্তারে সহায়তা করতে।

আরো একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের অনেকেই শৈশবে সর্দি কাশি গলা ব্যথা সহ অনেক উপসর্গের সম্মুখীন হতাম। শিশুরা ভাইরাসাক্রান্ত হয় বেশি, কারণ পূর্ণবয়স্ক মানুষের চেয়ে অরক্ষিত শিশুকে কাবু করা সহজ। তাই শৈশবেই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে বেশীমাত্রায়। ঠিক একইভাবে ধর্মগুলোও 'অরক্ষিত শৈশব'কে বেছে নেয় ভাইরাসের প্রসারে। মুক্তমনা ব্লগার আদিল মাহমুদ 'ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার সরল পাঠ' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ লিখছেন মুক্তমনায়[৯১]।

সিরিজটির প্রথম পর্বে তিনি দেখিয়েছেন ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় শিক্ষার নামে কিভাবে শিশু-কিশোরদের 'ব্রেন-ওয়াশ' করা হয়। তিনি বাংলাদেশের সরকারী শিক্ষা বোর্ডের নবম-দশম শ্রেণীর ইসলাম-শিক্ষা বইটির (বর্তমান পাঠ্যসূচীতে বইটির শিরোনাম বদলে 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' রাখা হয়েছে) কিছু স্ক্যান করা পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করেছেন, যা রীতিমত আতঙ্কজনক। বইটিতে 'কুফ্‌র' কী, 'কাফির কারা' এ সংক্রান্ত আলোচনা আছে, যা রীতিমত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত। অবিশ্বাসীরা হল কাফের; তারা অকৃতজ্ঞ, যাদের দুনিয়ায় কোন মর্যাদা নাই, তারা অবাধ্য ও বিরোধী, জঘন্য

---

[৯০] Victor J. Stenger, God and the Folly of Faith: The Incompatibility of Science and Religion, Prometheus Books, 2012

[৯১] আদিল মাহমুদ, ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার সরল পাঠ-১, মুক্তমনা।

জুলুমকারী, হতাশ/নাফরমান। একই বইয়ের ৫৩ পাতায় বেশ গুরুত্ব সহকারে জিহাদ সম্পর্কিত শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। শুধু জিহাদের সংজ্ঞা নয়, কিভাবে এবং কাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা স্পষ্ট ভাষাতেই বর্ণনা করা হয়েছে রেফারেন্স সহকারে –

জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদ দুই প্রকার। যথা : ১. যাহিরী বা প্রকাশ্য জিহাদ। ২. বাতিনী বা অপ্রকাশ্য জিহাদ।

প্রকাশ্য জিহাদ

ইসলামের চিরশত্রু কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদী ইত্যাদি। এরা সর্বদা ইসলামকে দুনিয়া থেকে মুছে দিতে চায়। এই আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে প্রকাশ্য জিহাদ বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

"হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও।" (সূরা তাওবা : ৭৩)"

অপ্রকাশ্য জিহাদ

ইবলিস ও কু-প্রবৃত্তি মানুষের চরম শত্রু। শয়তানের ফাঁদে পড়ে কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়। এই চরম শত্রু ইবলিস ও কু-প্রবৃত্তির (নফ্স) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে বাতিনী জিহাদ বলা হয়। কু-প্রবৃত্তিকে দমন করা কঠিন কাজ। তাই একে বড় জিহাদ বলা হয়। কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানকে দমন করতে পারলে জান্নাতের পথ সুগম হয়। নবী কারীম (স) বলেছেন– নফ্স বা কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হল বৃহত্তর জিহাদ।" আল্লাহর দীন কায়েম তথা দুনিয়াতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জিহাদ করা প্রতিটি মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব। ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় নিজের জানমাল সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। আমরা ইসলামের পথে চলব। ধর্মদ্রোহীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করব।

বাংলাদেশের ইসলাম-শিক্ষা বইটির এই অংশটুকু পড়লে কিন্তু অনেকেরই মনে হবে বিন লাদেন, বাংলা ভাই, শায়খ রহমানদের সন্ত্রাসী বলা এই ধর্মশিক্ষার আলোকে মোটেই যুক্তিসংগত নয়। বইটি পড়লে আরো মনে হবে ইসলাম শিক্ষা বইটি যেন ইমাম আল গাজ্জালীর উগ্র আদর্শের আলোকে লেখা হয়েছে যিনি ইসলামের মধ্যে মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী মোতাজিলাদের মুক্তবুদ্ধিকে এক সময় ধ্বংস সাধন করেন নির্মমভাবে। জিহাদ সম্বন্ধে গাজ্জালীর বাণী ছিল এরকমের –

> 'প্রত্যেক মুসলিমকে বছরে অন্তত একবার অবশ্যই জিহাদে যেতে হবে... দুর্গের ভিতরে যদি নারী এবং শিশুরাও থাকে, তবু তাদের বিরুদ্ধে ভারী পাথর বা তীর নিক্ষেপের যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে কিংবা ডুবিয়ে মারা যেতে পারে।'

গাজ্জালী, মওদুদীদের উগ্র ভাবধারা শিশু-কিশোরদের সংক্রমিত করার মাধ্যমে কীভাবে ভাইরাস আক্রান্ত মনন কীভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে সেটা বোধ হয় না বললেও চলবে। পাকিস্তানে নাকি শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে পড়ানো হয়, 'এ ফর আলিফ, বি ফর

বন্দুক'[92]। সে দেশের ভাইরাস –আক্রান্ত সেনাবাহিনী পরিণত বয়সে সুযোগ পেয়ে নয় মাসে ত্রিশ লক্ষ মানুষ মারবে আর দুই লাখ নারীর সম্ভ্রমহানি করবে, এ আর বিচিত্র কী! মর্নিং শোজ দ্য ডে!

চিত্র : পাকিস্তানে শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে পড়ানো হয়, 'এ ফর আলিফ, বি ফর বন্দুক'

ধর্মকে আসলে স্রেফ ভাইরাস হিসেবেই চিহ্নিত করা প্রয়োজন। ধর্মের সংক্রমণ, পুনরুৎপাদন এবং প্যারাসাইটিক বৈশিষ্ট্যগুলো কেবল ভাইরাসের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ বিশ্বাসীরা একে ভাইরাস হিসেবে না দেখে নীতি-নৈতিকতার উৎস হিসেবেই দেখতে চায়। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখব, ধর্ম নৈতিকতার উৎস হিসেবে সত্যই দাঁড়াতে পারে কিনা।

---

[92] Kayes Ahmed, alif for Allah, bay for Bondook!, Opinion bdnews24.com; http://opinion.bdnews24.com/2012/06/02/alif-for-allah-bay-for-bondook/

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্ম কি সত্যই নৈতিকতার উৎস?

প্রাচীনকাল থেকেই ঈশ্বরের প্রতি অগাধ আনুগত্য এবং ধর্ম বিশ্বাসকেই মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করা হয়েছে। পাশ্চাত্য বিশ্বে গোঁড়া খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা সংগঠিত হয়ে অনেক আগে থেকেই মগজ ধোলাই করতে শুরু করেছে এ কথা প্রচার করে যে, ধর্মগ্রন্থগুলো আর তাদের ঈশ্বরই একমাত্র নৈতিকতা বিষয়ে শেষ কথা বলবার অধিকার রাখে। ধর্মগ্রন্থগুলোতে যেভাবে পথ দেখানো হয়েছে, সেগুলো অন্ধভাবে অনুসরণ করাই হল নৈতিকতা[93]। আমাদের দেশি সংস্কৃতি তো আবার এগুলোতে সবসময়ই আবার আরও একধাপ এগিয়ে। অনেক বাসায় দেখেছি সেই ছেলেবেলা থেকেই ছোট ছেলে-মেয়েগুলোর মাথা বিগড়ে দিয়ে বাংলা শেখার আগেই বাসায় হুজুর রেখে আরবি পড়ানোর বন্দোবস্ত করানো হয়, নয়ত হরি-কীর্তন শেখানো হয় আর নৈতিক চরিত্র গঠনের মূলমন্ত্র হিসেবে তোতা পাখির মতো আওরানো হয় নীরক্ত বাক্যাবলী – 'অ্যাই বাবু, এগুলো করে না। আল্লাহ কিন্তু গোনাহ দিবে।' ছোটবেলা থেকেই এইভাবে নৈতিকতার সাথে ধর্মের খিচুড়ি একসাথে মিশিয়ে এমনভাবে ছেলে-পিলেদের খাওয়ানো হয় যে তারা বড় হয়েও আর ভাবতেই পারে না যে ধর্ম মানা ছাড়াও কারো পক্ষে ভালো মানুষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু সত্যিই কি ধর্মের সাথে নৈতিক চরিত্র গঠনের কোনো বাস্তব যোগাযোগ আছে? নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কৃষ্ণলীলা, তবলিগ জামাত ইত্যাদির মাধ্যমে গণ মানুষের নৈতিকতা উন্নয়নের যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্মের নামে মারামারি, হানাহানি, হিংসা, শোষণ, নির্যাতন, দারিদ্র্য আর সন্ত্রাসের বিস্তার দেখে বোঝা যায় যে ঈশ্বরে বিশ্বাস আসলে কোনো বিশাল অনুপ্রেরণা হয়ে মানুষের মধ্যে কখনোই কাজ করে নি। কারণটা অতি পরিষ্কার। ঈশ্বরে বিশ্বাসের মাধ্যমে মরালিটি বা নৈতিকতা অর্জনের চেষ্টা

---

[93] 'The religions of the world … have laid claim to the role of arbiters of human behavior. They insist that they have the right to tell the rest of us what is right and what is wrong because they have a special pipeline to the place where right and wrong are defined—in the mind of God.', see 'Do Our Values Come from God?, The Evidence Says No', Victor stinger, Mukto-Mona

করা আসলে সোজা পথে ভাত না গিলে কানের চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার মতন। প্রত্যেক ধর্মই বলছে বিধাতা ভালো মানুষকে পুরস্কৃত করেন আর পাপী-তাপী-নীতিহীনদের শাস্তি দেন। বোঝাই যায়, পুরস্কারের লোভটাই এখানে মুখ্য। নৈতিকতা বাদ দিয়ে অন্য যেকোনো উপায়ে আল্লাহকে তুষ্ট করে পুরষ্কার বগলদাবা করতে পারলে কোনো বান্দাই আর নৈতিকতার ধার ধারবে না। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, রাম-নাম, হরিবোল, পাঁঠা বলি, কোরবানি, নামাজ, হজ্জ, কোরআন তেলাওয়াত, পূজা, যজ্ঞ এই সমস্ত ব্যাপার-স্যাপারগুলোর মাধ্যমে মানুষ আসলে নৈতিকতার কোনো ধার না ধেরে বিধাতার তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টাতেই মত্ত। মানুষের প্রতি আর সমাজের প্রতি যাদের অবজ্ঞা আর প্রবঞ্চনা বেশি, তারাই কিন্তু বেশি-বেশি 'আল্লা-আল্লা' করে। হাজী সেলিমের মতো লোকের হজ্জ করার প্রয়োজনটা পড়ে বেশি, এরশাদের 'আলহাজ্জ' হওয়ার শখ হয় প্রবল। কারণ ধর্মেই রয়েছে সমস্ত আ-কাজ, কু-কাজ করেও পার পাবার ঢালাও ব্যবস্থা। মক্কা, জেরুজালেম, পুরী, বারানসী, তিরুপতি, এসব পবিত্র স্থান দর্শনে রয়েছে জীবনের সব পাপ ধুয়ে গিয়ে পরকালে স্বর্গবাসী হওয়ার নিশ্চিত গ্যারান্টি। কোটি টাকার চোরাকারবারী তাই ধুম-ধাম করে পূজা-যজ্ঞ করে নয়ত, শেষ বয়সে এলাকায় মন্দির গড়ে দেয় বেহেশতে একটা 'প্লট বুকিং' দেবার আশায়।

উপরন্তু, যুক্তি আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ সচেতন মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে যে, ঈশ্বর এক অর্থহীন অলীক কল্পনা মাত্র। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভাষায় – 'অজ্ঞানতার অপর নামই হলো ঈশ্বর।' কাজেই অজ্ঞানতাকে পুঁজি করে ঈশ্বর নামক মিথ্যা-বিশ্বাসের মূলা ঝুলিয়ে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের কাহিনি আজ অনেকের কাছেই 'শিশুতোষ গল্প' ছাড়া আর কিছু নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল তার 'হোয়াই আই অ্যাম নট আ খ্রিস্টান' গ্রন্থে বলেন[৭৪] –

> 'ধর্ম সম্পর্কে দু ধরণের আপত্তি করা যায়-বৌদ্ধিক এবং নৈতিক। বৌদ্ধিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় যে, কোনো ধর্মকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই এবং নৈতিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় ধর্মের উপদেশগুলো এমন সময় থেকে উঠে এসেছিল যখন মানুষ বর্তমান যুগের থেকেও অনেক নিষ্ঠুর ছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে এই উপদেশগুলো অমানবিকতাকে চিরন্তন করবার জন্যই তৈরি। যদি এই চিরন্তন ব্যাপারটি গ্রহণে মানুষকে বাধ্য না করা হতো, তবে মানুষের নৈতিক বিবেকবোধ বর্তমানে আরো অনেক উন্নত হতো।'

---

[৭৪] বার্ট্রান্ড রাসেল, আমি কেন ধর্মবিশ্বাসী নই, ভাষান্তর: অরিন ভাদুড়ী, দীপায়ন, ২য় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৪।

ইন্টারনেটে লেখালিখি করতে গিয়ে ধার্মিকদের নানা (কু)যুক্তির সাথে পরিচয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। একবার এক ওয়েব সাইটের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যকার বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। লেখা শুরু করতে না করতেই এক ধার্মিক ভদ্রলোক সেখানে হুঙ্কার ছেড়ে তেড়ে আসলেন এই বলে –

> এদের মতো ব্যক্তিবর্গ যুগ যুগ ধরে এসেছে এবং ভূত হয়ে চলে গেছে। এদের সম্পর্কে কোরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, তারা অন্ধ ও বর্বর। এদের হৃদয়ে সীলমোহর এঁটে দেওয়া আছে। তারা কিছুই দেখতে পায় না এবং শুনতে পায় না। শুধু প্রাণীর মতো হাম্বা হাম্বা রব তোলে।

কোরআনে যদি সত্যিই এমনটি বলা থাকে (এবং কোরআনে সত্যিই অবিশ্বাসীদের অন্ধ/বর্বর, এবং এদের হৃদয়ে যে সীলমোহর এঁটে দেওয়া আছে তা বলা আছে; দেখুন সুরা ২:৭, ৪:১৫৫, ৭:১০০, ৭:১০১, ৯:৯৩, ১৬:১০৮, ৩০:৫৯, ৪৫:২৩ ইত্যাদি) বলতেই হয় মহান সৃষ্টিকর্তার রুচিবোধ সত্যিই প্রশংসনীয়। কেবল ধর্ম মানি না বলেই ভদ্রলোক আমাকে 'অন্ধ' ও 'বর্বর' বলেছেন, আর প্রমাণ স্বরূপ 'সাক্ষী গোপাল' মেনেছেন তার চির-আরাধ্য ওই ধর্মগ্রন্থকেই। শুধু যে কোরআনেই অধার্মিকদের সম্বন্ধে এ ধরণের বিষোদগার করা হয়েছে তা ভাবলে ভুল হবে। শঙ্করাচার্য প্রমুখ দার্শনিকদের প্রাচীনকালের নাস্তিক্যবাদী চার্বাক দর্শনকে 'লোকায়াত' বা ইতর লোকের দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রবণতাটির কথা এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতেই পারে। এমন কি চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বলা হয় যে, মহাভারতের এক কুচরিত্র রাক্ষস চার্বাকের নাম থেকেই নাকি চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। মহাভারতে আছে, চার্বাক ছিল দুর্যোধনের বন্ধু এক দুরাত্মা রাক্ষস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ের পর চার্বাক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞাতিঘাতী হিসেবে ধিক্কার জানিয়ে আত্মঘাতী হতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা তাদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় চার্বাকের চালাকি ধরে ফেলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন। বোঝাই যায়, প্রাচীন ভাববাদীরা এই নাস্তিক্যবাদী দর্শনটির প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এমন ঘৃণ্য চরিত্রের রাক্ষসের সাথে দর্শনটিকে জুড়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আরেকটি উদাহরণ দেখি।

মহাভারতের শান্তিপর্ব। এক ধনী বণিক রথে যাওয়ার সময় এক ব্রাহ্মণকে ধাক্কা মেরে দিলো। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ অপমানের জ্বালা ভুলতে আত্মহত্যা করার কথা চিন্তা করলো। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার মধ্যে সর্বনাশের সঙ্কেত দেখতে পেয়ে শিয়াল সেজে হাজির হলেন। ব্রাহ্মণকে তার পশু জীবনের নানা দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে মানবজীবনের জয়গান গাইলেন। জানালেন অনেক জন্মের পুণ্যের ফল সম্বল করে এই মানব জন্ম পাওয়া। এমন মহার্ঘ্যতম এই মানবজীবন আর তায় আবার ব্রাহ্মণ! এমন

জীবন পাওয়ার পরও কি কেউ আত্মহত্যা করে? কাজেই অভিমানে আত্মহত্যা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। শিয়াল বলল, সে নিজেও আগের জন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিল। কিন্তু সেই জন্মে সে চূড়ান্ত মূর্খের মতো এক মহাপাতকের কাজ করেছিল বলেই আজ এই শিয়াল জন্ম। চূড়ান্ত মূর্খের মতো কাজটি কী? এ বারেই কিন্তু বেরিয়ে এলো নীতি কথা –

> অহমাংস পণ্ডিতকো হৈতুকো দেবনিন্দকঃ।
> আম্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যম্‌অনুরক্তো নিরার্থিকাম।।
> হেতুবাদান্‌প্রবদিতা বক্তা সুংসৎসু হেতুমৎ।
> আক্রোষ্টা চ অভিবক্তা চ ব্রাহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্‌।।
> নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ
> ভাষ্য ইয়ং ফলনিবৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ (শান্তিপর্ব ১৮০/৪৭-৪৯)

(অর্থাৎ, আমি ছিলাম এক বেদ সমালোচক পণ্ডিত। নিরর্থক তর্কবিদ্যায় ছিলাম অনুরক্ত। বিচার সভায় ছিলাম তর্কবিদ্যার প্রবক্তা। যুক্তিবলে দ্বিজদের ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটাতাম। ছিলাম জিজ্ঞাসু মনের নাস্তিক, অর্থাৎ কিনা পণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ। হে ব্রাহ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আমার এই শিয়ালজন্ম।)

বোঝাই যায়, বৈদিক যুগেও যুক্তিবাদীদের সংশয়, অযাচিত প্রশ্ন আর অনর্থক তর্ক-বিতর্ক একটা 'ফ্যাক্টর' হয়ে উঠেছিল। 'পণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ' – এ ধরণের লেবেল এঁটে দিয়ে বেদ-সমালোচকদের প্রতিহত করার প্রচেষ্টা তারই ইঙ্গিত বহন করে। আজকেও কি এ দৃষ্টিভঙ্গির খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে? যে ভদ্রলোকটি আমাকে ধর্মগ্রন্থের সমালোচনা করার জন্য 'অন্ধ' বা 'বর্বর' হিসেবে চিত্রিত করছেন, সে ধরণের লোকজনের কিন্তু আজো সমাজে অভাব নেই, নাস্তিক শুনলেই তারা খ্যাঁক করে ওঠেন – 'ও তুমি নাস্তিক! তবে তো তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো! তোমার তো চরিত্র বলে কিছু নেই।' এরা আসলে নাস্তিকদের মানুষ বলেই মনে করেন না, ভালো-মানুষ ভাবা তো অনেক পরের কথা। কিন্তু, নাস্তিক মানেই কি অনৈতিক, চরিত্রহীন, লম্পট গোছের কিছু? এমনিভাবে ভাবার মোটেই কোনো কারণ নেই। নাস্তিকরা আসলে নাকের সামনে থেকে ঈশ্বর নামক মূলাটি সরিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে 'মরালিটি' বা নৈতিকতাকে দেখবার পক্ষপাতী। ঈশ্বরের ভয়ে নয়, একটি সুন্দর এবং সুস্থ সমাজ গড়ে তুলবার প্রয়োজনেই মানুষের চুরি, লাম্পট্য, খুন, ধর্ষণ বিসর্জন দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধগুলো গড়ে তোলা দরকার। নয়ত সমাজের ভিত্তিমূলই যে একসময় ধ্বসে পড়বে! কাজেই অধার্মিকদের চোখে 'নৈতিকতা' বেহেস্তে যাওয়ার কোনো পাসপোর্ট নয়, বরং নিতান্তই সামাজিক আবশ্যকতা। ধর্মান্ধরা যেহেতু সামাজিক-মূল্যবোধের এই বিষয়গুলো একেবারেই বুঝতে চান না, তাই তাদের মধ্যে যুদ্ধ, দাঙ্গা, জিহাদ, মারামারি লেগেই আছে। ১৯৭১

সালের কথাই ধরা যাক। সারা বাংলা হতবিহ্বল হয়ে দেখেছে কিছু ধর্মান্ধ মানুষ ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে কী করে পশুর স্তরে নেমে যেতে পারে।

এক ভদ্রলোককে চিনতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সাতে-পাঁচে নেই; সাদা চোখে দেখলে নিতান্ত ভালোমানুষ বলেই মনে হবে। কিন্তু ভুক্তভোগীরা জানেন যে একাত্তরে ভদ্রলোক এহেন দুষ্কর্ম নেই যে করেন নি। সেসময় এমন কি তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন এই বলে যে, খান-সেনারা যদি কোনো বাঙালি মেয়েকে ধর্ষণ করে তবে সেটি অন্যায় বলে বিবেচিত হবে না, বঙ্গনারীরা পাক-বাহিনীর জন্য 'মালে গনিমত', কারণ তারা ইসলামের জন্য লড়ছে। এমন নয় যে ভদ্রলোক অশিক্ষিত ছিলেন, অথবা ছিলেন বুদ্ধিহীন। বরং সৎ এবং হৃদয়বান হিসেবেই একটা সময় তার খ্যাতি ছিল; কিন্তু এই 'সজ্জন' ব্যক্তিও স্রেফ ধর্মের প্রতি ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে নেমে গেলেন পশুর স্তরে। উনি ভেবেছিলেন পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে ইসলাম হবে বিপন্ন। তাই ধর্ম বাঁচাতে যা যা করা দরকার সবই করেছেন। এমন কি খান সেনাদের সাথে পাল্লা দিয়ে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও আছে। ব্যাপারটি অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও অতিমাত্রায় ধর্মপ্রবণদের জন্য এ ধরণের কাজ খুবই স্বাভাবিক। অনেক সময়ই মানবিকতার চেয়ে তাদের কাছে ধর্মবোধটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই ভদ্রলোকের কথা ভাবলেই নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিভেন ওয়াইনবার্গের বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে যায়[95] –

> 'ধর্ম মানবতার জন্য এক নির্মম পরিহাস। ধর্ম মানুক বা নাই মানুক, সবসময়ই এমন অবস্থা থাকবে যে ভালো মানুষেরা ভালো কাজ করছে, আর খারাপ মানুষেরা খারাপ কাজ করছে। কিন্তু ভালো মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করানোর ক্ষেত্রে ধর্মের জুড়ি নেই।'

কেবল একাত্তরে নয়, ২০০২ সালে গুজরাটে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দাঙ্গা, কিংবা তারও আগে অযোদ্ধায় বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে শিবসেনাদের তাণ্ডব নৃত্য ধর্মের এই ভয়াবহ রূপটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অপরপক্ষে নাস্তিকদের যেহেতু এই অতিমানবিক সত্তা-কেন্দ্রিক নৈতিকতায় কোনো বিশ্বাস নেই, একজন নিষ্ঠাবান নাস্তিক সত্যিকার অর্থে গড়ে উঠতে পারেন একজন যথার্থ প্রথা-বিরোধী মানুষ হিসেবে। সুমন তুরহান নামে এক লেখক মাসিক দেশ পত্রিকার ৪ নভেম্বর ২০০২ সংখ্যায় 'নাস্তিকতার সংজ্ঞা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন[96] – 'নাস্তিকদের অবিশ্বাস তাই শুধু অতিমানবিক সত্তায় নয়, তারচেয়ে অনেক গভীরে, তিনি অবিশ্বাস করেন প্রথাগত সভ্যতার প্রায় সমস্ত

---

[95] *'Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.'*; Steven Weinberg, In a speech given in Washington, DC, on April 1999.

[96] নাস্তিকতার সংজ্ঞা, সুমন তুরহান। দেশ ৪ নভেম্বর, ২০০২।

অপবিশ্বাসে। সবকিছুই তারা যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে চান।' এর মধ্যে কিছুটা হলেও যে সত্যতা নেই তা নয়। তবে ভালোমানুষ হোন, আর নাই হোন এটা কিন্তু ঠিক যে নাস্তিক বা অধার্মিকদের মধ্যে থেকে কখনোই আল-কায়েদা, তালিবান, হরকত-উল-জিহাদ, রাজাকার, আলবদর বা শিবসেনাদের মতো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিকরূপ দেখা যায় না। যতদিন ধর্ম থাকবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকবে ধর্মের সাম্প্রদায়িক এই সাংগঠনিক রূপটিও কিন্তু বজায় থাকবে পুরোমাত্রায়। কাজেই যতদিন মানুষের আনুগত্য ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকবে ততদিন তা মানুষকে স্বাধীনভাবে আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জনে বাধা দেবেই। বেহেস্তের লোভে বা ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য নয়, মানুষকে ভালোবেসে মানুষের জন্য কাজ করার প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয়, তবেই গড়ে উঠবে সার্বজনীন মানবতাবাদ। সম্প্রতি এর প্রচেষ্টা শুরুও হয়েছে। ঈশ্বরকেন্দ্রিক মিথ্যার বেসাতি মন থেকে সরিয়ে শুধু মানুষের জন্য মানুষের কাজ করার বাসনা নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে নতুন শতকের আধুনিক মতবাদ হিসেবে এসেছে হিউম্যানিজম। এমন কি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে মানবতাবাদী সমিতি এবং যুক্তিবাদী সমিতি অফিস আদালতের ফর্মে বা বিয়ের রেজিস্ট্রেশনে 'হিন্দু', 'মুসলিম' এই শব্দগুলোর পাশাপাশি ধর্মের জায়গায় 'মনুষ্যত্ব' শব্দটি ব্যবহারের আইনি অধিকার আদায় করেছে[97]। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় যুক্তিবাদী

---

[97] 'ধর্ম' যেহেতু ব্যক্তিগত ব্যাপার তাই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মীয় পরিচিয় জানানো জরুরি নয় বলে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীরা মনে করে। কিন্তু সমস্যা হলো, যারা কোনো ধর্ম মানেন না তারা চাকুরি বা শিক্ষার ক্ষেত্রে কলামটা খালি রাখতে চাইলেও অতীতে আপত্তি উঠেছে নানা জায়গায়। এমনকি ফর্ম বাতিল করা হয়েছে 'অসম্পূর্ণ' বলে। সেই সময় বহু মানুষ দ্বারস্থ হয় ভারতীয় মানবতাবাদী সমিতির। এই সময় প্রথম এই সমিতি Humanists' Association of India সক্রিয় হয় মানবতাকে ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে, সেটা ১৯৯২-৯৩ সালের দিকে। দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ও সংবাদপত্রের দপ্তরে যোগাযোগ করে ঘটনাটি জানানো হয়। যাতে একজন মানুষ নিজের ধর্ম ' মানবতা' বলতে পারে তার জন্য সরকারি কোনো নিয়মাবলী বা গাইডলাইন আছে কিনা তা স্পষ্টভাবে জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে সবাই বলেন যে এভাবে নতুন ধর্ম তৈরি করা সম্ভব নয়। তারপর মানবতাবাদী সমিতি সরাসরি চিঠি পাঠায় জাতিসংঘের অফিসে। উত্তর আসে দেরি না করেই। ইউএনও তাদের Human rights এবং Religious rights সংক্রান্ত যাবতীয় বই ও কাগজপত্র পাঠিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়- '১৯৮১' এর জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করেছে প্রতিটি মানুষের যে কোনো ধর্মমত গ্রহণ ও চর্চা করার স্বাধীন অধিকার আছে। তারপরই এই আইনি লড়াইতে যৌথভাবে নেমে পড়ে ভারতের মানবতাবাদী সমিতি ও যুক্তিবাদী সমিতি। জাতিসংঘকে চিঠি দিয়ে জানানো হয় যে ভারত জাতিসংঘের সদস্য দেশের অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মকে এখানে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। হিউম্যানিজম-কেও ধর্ম বলে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু যেহেতু ইউএনও তার গাইডলাইন পাঠিয়ে দিয়েছে, আমরা ইউএনও-এর অন্তর্গত দেশ হিসেবে মনে করি মানবতা আমাদের ধর্ম হতে কোনো বাধা নেই। এবং আইনিভাবে এই ধর্মমতকে গ্রহণ করার অধিকার ভারতের নাগরিকেরা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ও

প্রবীর ঘোষের একটি চমৎকার উক্তি তার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক গ্রন্থ' থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি[৭৪] –

'আগুনের ধর্ম যেমন দহন, ছুরির ধর্ম যেমন তীক্ষ্ণতা তেমনি মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। আর সে হিসেবে নামাজ না পড়েও বা শনি শীতলার পূজা না করেও আমরা যুক্তিবাদী নাস্তিকেরাই প্রকৃত ধার্মিক, কারণ আমরা মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ চাই'।

ধর্মগ্রন্থগুলো কি সত্যিই নৈতিকতার ধারক এবং বাহক?

ইদানীং এক নতুন ধরণের প্রগতিবাদী (নাকি সুবিধাবাদী) আন্দোলন শুরু হয়েছে, যার মূলমন্ত্র হলো ধর্ম নয় কেবল মৌলবাদকে আঘাত করো। মুক্তমনা যুক্তিবাদীদের অনেকেই দেখছি বুঝে হোক, না বুঝে হোক এ প্রচারণায় গা ভাসিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের মতোই ইদানীং সোচ্চারে বলছেন: 'শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও মৌলবাদ রুখব', যেন মৌলবাদ ব্যাপারটি হঠাৎ করেই আকাশ থেকে আবির্ভূত হয়েছে মহীরুহ আকারে – কোনো শিকড়-বাকড় ছাড়াই। যারা ধর্মকে শাশ্বত চিরন্তন আর জনকল্যাণমূলক বলে মনে করেন আর যত দোষ চাপাতে চান কেবল মওদুদী, গোলাম আজম, আদভানী কিংবা 'মৌলবাদ' নামক নন্দঘোষটির ঘাড়ে, তাদের প্রথমে খোদ 'মৌলবাদ' শব্দটিকেই বিশ্লেষণ করে দেখতে বলি। 'মৌল' শব্দের অর্থ মূল থেকে আগত, বা 'মূল সম্বন্ধীয়'। আর 'বাদ' শব্দের অর্থ যে 'মত', 'তত্ত্ব' বা 'থিওরি', তা তো আমরা জানিই। তা হলে মৌলবাদ শব্দের প্রকৃত অর্থ কী দাঁড়ালো? দাঁড়ালো – 'মূল থেকে আগত তত্ত্ব'। কোন্ মূল থেকে আগত তত্ত্ব? শেষ পর্যন্ত ওই ধর্মগ্রন্থের গোঁড়া মূলনীতিগুলো হতে আগত তত্ত্ব। কাজেই বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কিন্তু থলের বিড়াল ঠিকই বেরিয়ে পড়ছে যে, ধর্মশাস্ত্রের মূলনীতিগুলোকে চরম সত্য বলে যারা মনে করেন, তারাই শেষ পর্যন্ত মৌলবাদী হন। মৌলবাদ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Fundamentalism'। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলা হয়েছে – 'Strict maintenance of traditional scriptural beliefs'; চেম্বার্স ডিকশনারি শব্দটি সম্পর্কে বলছে 'Belief in literal truth in Bible, against evolution etc.'। কাজেই ধর্মকে বাদ দিয়ে মৌলবাদ রুখবার চেষ্টা অনেকটা বিষবৃক্ষের গোঁড়ায় পানি ঢেলে

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিদেশি দূতাবাসগুলোতেও। তারপর ভারতের মানবতাবাদী সমিতির সহায়তায় কোর্টে গিয়ে affidavit করে দলে দলে ছেলে-মেয়ে Humanism কে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে (১৯৯৩ এর ১০ ডিসেম্বর)। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুনঃ মানুষের ধর্ম মানবতা, সুমিত্রা পদ্মনাভন, দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম, পুনঃ মুদ্রিত, মুক্তমনা দ্রঃ।

[৭৪] অলৌকিক নয়, লৌকিক, প্রথম খণ্ড, প্রবীর ঘোষ, দে'জ প্রকাশন।

তাকে বাঁচিয়ে রেখে আগায় কাঁচি চালানোর প্রচেষ্টা, নিছক ভণ্ডামি। প্রসঙ্গত তসলিমা নাসরিন একবার একটি ইংরেজি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন[৯৯] –

> ‘আমি সাধারণভাবে মৌলবাদীদের আর সেইসাথে ধর্মের – দুয়েরই সমালোচনা করেছিলাম। আমি আসলে ইসলামের সাথে ইসলামি মৌলবাদের কোনো তফাৎ দেখি না। আমি মনে করি ধর্মই হচ্ছে মূল উৎস, যেটি থেকে মৌলবাদ নামক বিষাক্ত ডালপালাগুলো সময় সময় বিস্তার লাভ করে। যদি আমরা ধর্মকে অক্ষত রেখে দেই, কেবল মৌলবাদ নামক একটি ডালকে ছেঁটে ফেলতে সচেষ্ট হই, দেখা যাবে কিছু দিন পর মৌলবাদের আরেকটা শাখা অচিরেই বেড়ে উঠেছে। আমি খুব পরিষ্কারভাবেই এটি বলছি কারণ, কিছু উদারপন্থী লোকজন আছেন যারা এ ধরণের প্রশ্নে ইসলামকে ডিফেন্ড করেন আর সমস্ত সমস্যার জন্য কেবল মৌলবাদীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হন। কিন্তু ইসলাম নিজেই তো নারী-নির্যাতনকারী। ইসলাম নিজেই তো গণতন্ত্র সমর্থন করে না আর সমস্ত মানবিক অধিকার হরণ করে।’

আমার এক পরিচিতজন আছেন – সেক্যুলার এবং প্রগতিশীলতার দাবিদার। কিন্তু তসলিমার এই সাক্ষাৎকার পড়ে তার যেন পিত্তি জ্বলে গেল! তসলিমা ‘শ্যালো’, তসলিমা ‘নির্বোধ’, তসলিমা ‘ইডিয়ট’, কী নন তিনি! বুঝলাম, তসলিমার বড় অপরাধ তিনি ধর্ম আর মৌলবাদকে এক করে ফেলেছেন। কিন্তু তসলিমা ভুল বলছেন না ঠিক বলছেন সেটি বিশ্লেষণ করতে হলে নির্মোহ সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে তাকানো দরকার। আসুন প্রিয় পাঠক, আমরা যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখি – ধর্মগ্রন্থগুলোর সাথে মৌলবাদের সত্যিই কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে কিনা, এবং ধর্মগ্রন্থগুলো আদপেই ‘নৈতিকতার ভাণ্ডার’ হিসেবে পরিচিত হবার যোগ্যতা রাখে কিনা!

---

[99] *‘I criticized fundamentalists as well as religion in general. I don't find any difference between Islam and Islamic fundamentalists. I believe religion is the root, and from the root fundamentalism grows as a poisonous stem. If we remove fundamentalism and keep religion, then one day or another fundamentalism will grow again. I need to say that because some liberals always defend Islam and blame fundamentalists for creating problems. But Islam itself oppresses women. Islam itself doesn't permit democracy and it violates human rights.'* One Brave Woman vs. Religious Fundamentalism, An Interview With Taslima Nasrin, Free Inquiry magazine, Volume 19, Number1, available online
http://www.secularhumanism.org/library/fi/nasrin_19_1.html

ধর্মগ্রন্থগুলো আসলে কী বলছে?

পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মমতগুলো সৃষ্টি হয়েছে বড় জোর বিগত ২ –৪ হাজার বছরের মধ্যে। হিন্দু, ইসলাম কিংবা খ্রিস্ট ধর্ম কোনোটাই সে অর্থে চিরন্তন বা সনাতন নয়। কাজেই 'সনাতন ধর্ম' নিছকই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। তবে সনাতন না হলেও ধর্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু কিন্তু হয়েছিল বহু হাজার বছর আগে। বিরূপ প্রকৃতির নানা দুর্যোগ-দাবানল, প্লাবন, বজ্রপাত প্রভৃতির ব্যাখ্যা খুঁজতে অসহায় হয়ে আর ওগুলোর হাত থেকে মুক্তি খুঁজতে মানুষ সৃষ্টি করেছিল নানা দেবদেবীর; মৃত্যুকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করতে পেরে সৃষ্টি করেছিল অদৃশ্য আত্মার। যারা সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে সামান্য পড়াশোনা করেছেন তারাই এগুলো জানেন। আর এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, মানুষের মধ্যে তথাকথিত 'ধর্মবিশ্বাসের' সৃষ্টি হয়েছিল নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের আমলে – যারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে। নিয়ান্ডার্থাল মানুষের আগে পিথেকানথ্রোপাস আর সিনানথ্রোপাসদের মধ্যে ধর্মাচরণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বিশ্বাসগুলো ছিল একেবারেই আদিম – আজকের দিনের প্রচলিত ধর্মমতগুলোর তুলনায় একেবারেই আলাদা। এখন থেকে ৪০ –১৮ হাজার বছর আগে উচ্চতর পুরা-প্রস্তর যুগে এসে আত্মা, পরমাত্মা, ধর্মীয় আচার আর জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপারগুলো সুসংহত হয়। আজকের দিনের ধর্মবিশ্বাসগুলোর মধ্যে বৈদিক ধর্মের (হিন্দু ধর্মের পূর্বসূরি) উদ্ভব হয়েছিল আজ থেকে মাত্র ৩৫০০ বছর আগে, ইসলাম ধর্ম এসেছে ১৪০০ বছর আগে, খ্রিস্টধর্ম ২০০০ বছর আগে, ইত্যাদি। একটা সময় সামাজিক প্রয়োজনে যে ধর্মীয় রীতিনীতি নিয়ম কানুন তৈরি হয়েছিল, আজ তার অনেকগুলোই কালের পরিক্রমায় স্থবির, পশ্চাৎপদ, নিবর্তনমূলক এবং অমানবিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ইতিহাস পরিক্রমায় দেখা যায় ফোনিকান, হিব্রু, ক্যানানাইট, মায়া, ইনকা, অ্যাজটেক, ওলমেক্স, গ্রিক, রোমান কার্থাগিনিয়ান, টিউটন, সেল্ট, ড্রুইড, গল, থাই, জাপানি, মাউরি, তাহিতিয়ান, হাওয়াই অধিবাসী – সবাই নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী দেদারসে শিশু, নারী, পুরুষ বলি দিয়েছে তাদের অদৃশ্য দেব-দেবীদের তুষ্ট করতে। এই বইয়ের বহু জায়গাতেই এ নিয়ে আলোচনা আছে। তবে এই অধ্যায়ে আমরা কেবল প্রচলিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ধর্মমতগুলোর ঐশী ধর্মগ্রন্থগুলোতে চোখ রাখব; আমরা নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব, ধর্মগ্রন্থগুলো আসলে কী বলছে।

যারা কোরআন আগাগোড়া পড়েছেন তারা সকলেই জানেন, পবিত্র কোরআনের বেশ অনেকটা জুড়েই রয়েছে উত্তেজক নির্দেশাবলী। যেমন[100] –

কোরআন আহ্বান জানাচ্ছে যেখানেই অবিশ্বাসীদের পাওয়া যাক তাদের হত্যা

---

[100] কোরআন শরীফ (বঙ্গানুবাদ), মাওলানা খান মুহাম্মদ ইউসুফ আবদুল্লাহ, সোলেমানিয়া বুক হাউস।

করতে (২:১৯১, ৯:৫), তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে, কঠোর ব্যবহার করতে (৯:১২৩), আর যুদ্ধ করে যেতে (৮:৬৫)। বিধর্মীদের অপদস্থ করতে আর তাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করতে (৯:২৯)। অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নির্যাসটুকু কেড়ে নিয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করছে যে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম (৩:৮৫)। এটি অবিশ্বাসীদের দোজখে নির্বাসিত করে (৫:১০), এবং 'অপবিত্র' বলে সম্বোধন করে (৯:২৮); মুসলিমদের ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সকল ধর্মকে সরিয়ে ইসলামি রাজত্ব কায়েম হয় (২:১৯৩)। কোরআন বলছে যে শুধু ইসলামে অবিশ্বাসের কারণেই একটি মানুষ দোজখের আগুনে পুড়বে আর তাকে সেখানে পান করতে হবে দুর্গন্ধময় পুঁজ (১৪:১৭)। অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে অথবা তাদের হাত-পা কেটে ফেলতে প্ররোচিত করছে, দেশ থেকে অপমান করে নির্বাসিত করতে বলছে – 'তাদের জন্য পরকালে অপেক্ষা করছে ভয়ানক শাস্তি' (৫:৩৪)। আরও বলছে, 'যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে যাতে ওদের চামড়া আর পেটে যা আছে তা গলে যায়, আর ওদের পেটানোর জন্য থাকবে লোহার মুগুর' (২২:১৯)। কোরআন ইহুদি এবং নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বটুকু করতে পর্যন্ত নিষেধ করছে (৫:৫১), এমন কি নিজের পিতা বা ভাই যদি অবিশ্বাসী হয় তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখতে উদ্বুদ্ধ করছে (৯:২৩, ৩:২৮)। আল্লা-রসুলে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড (৪৮:১৩)। ইসলামে অবিশ্বাস করে কেউ মারা গেলে কঠোরভাবে উচ্চারিত হবে – 'ধরো ওকে, গলায় বেড়ি পড়াও এবং নিক্ষেপ করো জাহান্নামে আর তাকে শৃঙ্খলিত করো সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে' (৬৯:৩০ –৩৩)। আল্লাহর নামে যুদ্ধ করতে সবাইকে উৎসাহিত করা হয়েছে এই বলে – 'এটা আমাদের জন্য ভালোই, এমন কি যদি আমাদের অপছন্দ হয় তবুও' (২:২১৬), তারপর – 'কাফেরদের গর্দানে আঘাত করো' আর তারপর তাদের উপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার নির্দেশের পর রয়েছে অবশিষ্টদের ভালোভাবে বেঁধে ফেলতে (৪৭:৪)। আল্লাহতালা এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন – 'কাফেরদের হৃদয়ে আমি গভীর ভীতির সঞ্চার করব' এবং বিশ্বাসীদের আদেশ করেছেন কাফেরদের কাঁধে আঘাত করতে আর হাতের সমস্ত আঙ্গুলের ডগা ভেঙ্গে দিতে (৮:১২)

আল্লাহ জিহাদকে মুমিনদের জন্য 'আবশ্যক' (mandatory) করেছেন আর সতর্ক করেছেন এই বলে – 'তোমরা যদি সামনে না এগিয়ে আসো (জিহাদের জন্য) তবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মন্তুদ শাস্তি'(৯:৩৯)। আল্লাহ তার পেয়ারা নবীকে বলছেন, 'হে নবী, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো আর কঠোর হও – কেননা, জাহান্নামের মতো নিকৃষ্ট আবাস স্থলই হলো তাদের পরিণাম' (৯:৭৩)।

এই হচ্ছে কোরআন (হাদিস এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলোর কথা না হয় বাদই থাকুক আপাতত)। অনেকেই দেখেছি নিজস্ব বিশ্বাসে আপ্লুত হয়ে কোরআনকে নির্দ্বিধায় 'The book of guidance' বলে মেনে নেন, আর ইসলামকে মনে করেন 'শান্তির ধর্ম'। যারা এমনটি ভাবেন, তারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে উপরের আয়াতগুলো কেউ যদি নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে আর সমাজে তার বাস্তব প্রয়োগ চায় তবে তারা কী ধরণের শান্তি এ পৃথিবীতে বয়ে আনবে? জিহাদিদের কল্যাণে আজকের বিশ্বে 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদ' (Islamic Terrorism) একটি প্রতিষ্ঠিত শব্দ। প্রতিদিন কাগজের পাতা খুললেই দেখা যায় এই জিহাদি জোশে উদ্বুদ্ধ কিছু লোক বোমা মারছে মানুষজন, বাড়ি-ঘর, কারখানা, রাস্তাঘাট, যানবাহন, সিনেমা হল, সাংস্কৃতিক অঙ্গন বা সমুদ্র-সৈকতে। হাজার খানেক জিহাদি সংগঠন যেমন – আল্‌কায়দা, ইসলামিক জিহাদ, হামাস, হরকত-উল-জিহাদ, হরকত-উল-মুজাহিদিন, জেইস-মুহম্মদ, জিহাদ-এ-মুহম্মদ, তাহ-রিখ-এ-নিফাজ-সারিয়াত-এ-মুহম্মদ, আল-হিকমা, আল-বদর-মুজাহিদিন, জামাতে ইসলামিয়া, হিজাব-এ-ইসলামিয়া, আনসারুল্লা বাংলা টিম আজ সারা পৃথিবী জুড়ে কায়েম করছে এক ভীতির পরিবেশ[101]।

বাংলাদেশ সরকার হিযবুত তাহরীর সহ কিছু দলকে নিষিদ্ধ করেছে জঙ্গিবাদের অভিযোগে। গ্রেফতার করেছে আনসারুল্লা বাংলা টিমের প্রধান মুফতি জসীম উদ্দিনসহ ৩১ জনকে। ব্লগার রাজীব হত্যা মামলায় মুফতি জসীম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এর আগে বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের আমলে জমিয়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি), হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামি বাংলাদেশ (হুজি) নিষিদ্ধ হয়; শাহাদাত ই

[101] প্রথম আলোর অক্টোবর ১৮, ২০০৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী খোদ বাংলাদেশেই ২৯ টি কিংবা তারও বেশি জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলঃ জমিয়াতুল মুজাহিদিন, জাগ্রত মুসলিম জনতা, শাহাদাত-ই আল হিকমা, হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামি, শহীদ নসুরুল্লাহ আল আরাফাত বিগ্রেড, হিযবুত তাওহিদ, জামায়াত-ই ইয়াহিয়া, আল তুরাত, আল হারাত আল ইসলামিয়া, জামাতুল ফালাইয়া তাওহিদি জনতা, বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট, জুম্মাতুল আল সাদাত, শাহাদাত-ই-নবুওয়ত, আল্লাহর দল, জইশে মোস্তফা বাংলাদেশ, আল জিহাদ বাংলাদেশ, ওয়ারত ইসলামিক ফ্রন্ট, জামায়াত-আস-সাদাত, আল খিদমত, হরকত-এ ইসলাম আল জিহাদ, হিজবুল্লাহ ইসলামী সমাজ, মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল, ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ, জইশে মুহাম্মদ, তা আমীর উদদ্বীন বাংলাদেশ, হিজবুল মাহাদী, আল ইসলাম মার্টায়ারস্‌বিগ্রেড ও তান্‌জীম। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময় নিষিদ্ধ করেছে চারটি আত্মস্বীকৃত ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনকে; এগুলো হলোঃ শাহাদাত ই আল হিকমা (২০০৪) জমিয়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি, ২০০৫), জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জে এম জে বি, ২০০৫) এবং হরকাতুল জিহাদ (২০০৫) প্রভৃতি। বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের আমলে জমিয়াতুল মুজাহিদীন, জাগ্রত মুসলিম জনতা, শাহাদাত ই আল হিকমা এবং হরকাতুল জিহাদ (হুজি)কে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। নিষিদ্ধ তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন হিযবুত তাহরী।

আল হিকমা ও জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) নিষিদ্ধ হয় চারদলীয় জোট সরকারের আমলে। বাংলাদেশে হরকাতুল জিহাদ প্রথম আলোচনায় আসে ১৯৯৬ সালে। ওই বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজার জেলার উখিয়া থানার পাইনখালী গ্রামসংলগ্ন লুন্ডাখালীর জঙ্গলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে সশস্ত্র প্রশিক্ষণের সময় ঐ সংগঠনের ৪১ জঙ্গি সদস্যকে অস্ত্র-গোলাবারুদসহ গ্রেফতার করে। ওই ৪১ জনের মধ্যে একজন বিদেশি নাগরিক ছাড়া বাকিরা ছিল দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষক। এরপর ১৯৯৯ সালের ১৮ জানুয়ারি ঢাকায় কবি শামসুর রাহমানের বাড়িতে তার উপর হামলাকালে ঘটনাস্থল এবং পরে বিভিন্ন স্থান থেকে আটক ১০ জঙ্গিও নিজেদের হরকাতুল জিহাদের সদস্য পরিচয় দেয়। এরপর যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে, ২০০০ সালের ২৩ জুলাই গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভার অদূরে বোমা পুঁতে রাখার ঘটনায়, এরপর ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল রমনার বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠানে, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা এবং ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলাসহ সারা দেশে বেশ কিছু বোমা, গ্রেনেড হামলা চালিয়ে হরকাতুল জিহাদ আবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে।

১৯৯৮ সালে জন্ম নেয়া জেএমবি ২০০২ সাল থেকে নাশকতা শুরু করলেও ব্যাপক আলোচনায় আসে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী একযোগে বোমা হামলা চালিয়ে। পাঠকদের অনেকেরই হয়তো সেদিনকার ভয়াবহতার কথা মনে আছে। সেদিন সারা বাংলাদেশে একনাগাড়ে ৬৩টি জেলায় বোমার মহড়া চালিয়েছিল। মহড়ার প্রকোপ এমনই ব্যাপক ছিল যে অনেকেই ১৭ই আগস্ট দিনটিকে সেসময় 'বাংলাদেশের ৯ –১১' বলে অভিহিত করেছিলেন। জঙ্গিবাদের সাথে বিশুদ্ধ ইসলামের সম্পর্ক কতটুকু তা বোঝা হয়ে গেছে বোমা মহড়ার স্থানগুলোতে পাওয়া তাদের ছাপানো লিফলেটগুলো থেকেই। সারা লিফলেট জুড়ে কোরআন-হাদিস থেকে নানা উদ্ধৃতি আর কাফের নাফরমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক। সেসময় ফরহাদ মজহার আর বদরুদ্দিন উমরেরা পালের হাওয়া অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করলেও, বিশুদ্ধ ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, তা আর চাপা থাকে নি[102]।

---

[102] বিগত বিএনপি জামাত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার জঙ্গিবাদের সেই 'সুবর্ণ' সময়গুলোতে ফরহাদ মজহার আর বদরুদ্দিন উমরেরা প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সেপ্টেম্বর ৯, ২০০৫ তারিখে 'আমাদের সময়' পত্রিকার একটি খবরে প্রকাশিত হয় যে, ফরহাদ মজহার সাহেব প্রেসক্লাবে একটি আলোচনা সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন এই বলে- ১৭ই আগস্টের জেএমবি'র বোমাহামলাকারীদের যদি সন্ত্রাসী বলা হয়, তবে নাকি ৭১ এর মুক্তিযোদ্ধারাও সন্ত্রাসী। শুধু তাই নয়, 'বোমাবাজি সন্ত্রাস-জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক এই সমাবেশটিতে সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন বোমাবাজদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যদি 'অবৈধ' হয় তবে নাকি ৫২, ৬৬, ৬৯, ৭১ এর সকল আন্দোলনও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। মজহার সাহেব জিহাদ ও শ্রেণী সংগ্রামকে এক করে দেখেন, আর মার্ক্সীয় তত্ত্ব আউরে সেটাকে সময় সময় বৈধতা দিতে চেষ্টা করেন। এই প্রেসক্লাবের আলোচনা সভাতে মজহার সাহেব পরিষ্কার করেই বলেছেন,

ধর্মভিত্তিক ৫টি জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হলেও ইতোমধ্যে গোপনে আরো ৭০টি জঙ্গি সংগঠন এদের সাথে যুক্ত হয়েছে। এরা একযোগে গোপনে দেশব্যাপী বড় ধরণের নাশকতা ঘটানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। এদের মূল টার্গেট হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করা[103]।

সচেতন শান্তিকামী ধার্মিক মানুষদের আজ আত্মোপলব্ধির সময় এসেছে, সময় এসেছে সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন করার – কেন এই জঙ্গি দলগুলো এত ইসলামিক? কেন তারা সন্ত্রাসী? কারা ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে মোল্লা ওমর, বিন-লাদেন, মৌলানা মান্নান, গোলাম আজম, শাইখ আব্দুর রহমান, মুফতি হান্নান আর বাংলা ভাইদের? কে ইন্ধন যোগায় তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে? আজ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তাই বলার সময় এসেছে – এই 'পবিত্র' ধর্মগ্রন্থগুলো অনেকাংশেই ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস। অবশ্য সেইসাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি দীর্ঘদিনের বিদ্বেষমূলক পররাষ্ট্রনীতির কথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না[104]। জনবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া কিংবা সাদ্দামের সাথে আল-কায়েদার কোনো সম্পর্ক না খুঁজে পাওয়া কিংবা জৈব-যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া সত্ত্বেও নির্লজ্জভাবে ইরাকের উপর যে আগ্রাসন চালিয়েছে তা শুধু যে আমেরিকার চিরচেনা সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে তা নয়, ইসলামি বিশ্ব এই আগ্রাসনকে যেকোনো কারণেই হোক 'ইসলামের উপর আঘাত' হিসেবে নিয়েছে। সেজন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেসমস্ত দেশেই ইসলামি আত্মঘাতী বোমা হামলার মাত্রাটা বেশি যে দেশের সরকার ইরাক যুদ্ধে বুশ-ব্লেয়ারকে নগ্নভাবে

১৭ই আগস্টের হামলাকারীরা নাকি 'তাদের মতো করে সমাজটাকে বদলাতে চায়।' এতে নাকি দোষের কিছু নেই। প্রসঙ্গত, বিন লাদেনের প্রতি মজহার সাহেব একটা সময় এতই গুণমুগ্ধ ছিলেন যে, তিনি 'চিন্তা' নামক একটা পত্রিকায় 'ক্রুসেড, জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম' নামের প্রবন্ধের (ডিসেম্বর, ২০০১) সমাপ্তি টেনেছেন করাচির 'উম্মত' নামক পত্রিকায় লাদেনের সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। চে গুয়েভারা, লেলিন, স্ট্যালিনের মতো বিন-লাদেনকেও একই কাতারে ফেলে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে 'বিপ্লবী কমরেড' বানিয়ে ছেড়েছিলেন লাদেনকে! 'প্রগতিশীল' এবং 'নিরপেক্ষ' মজহার বিশ্বাস করতেন না ৯/১১ এর বিধ্বংসী ঘটনায় লাদেন জড়িত থাকতে পারে। কারণ তার ধারণা হয়েছিল, 'মুসলমান হিসেবে তিনি মিথ্যা কথা বলেন না।' ফরহাদ মজহারকে নিয়ে অভিজিৎ রায়ের একটি লেখা 'ফরহাদ মজহারের বিভ্রান্তি' শিরোনামে দৈনিক ভোরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। প্রবন্ধটি মুক্তমনা ওয়েবসাইটেও রাখা আছে।

[103] হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা, বৃহস্পতিবার, ০৮ এপ্রিল ২০১০, নিউজ বাংলা।

[104] মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity, by Tariq Ali, Verso; Pbk edition (April, 2003); Rogue State: A Guide to the World's Only Superpower by William Blum, Common Courage Press (May, 2000);ইত্যাদি।

সমর্থন করেছে। প্যালেস্টাইনিদের বঞ্চিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলকে নগ্নভাবে সমর্থন করেছে তাও মুসলিম সমাজকে সংঘাতের পথে ঠেলে দিয়েছে। এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আর প্রতিহিংসার ব্যাপারগুলো ভুলে গেলে কোনো আলোচনাই কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ করাও বোধহয় এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রাষ্ট্রযন্ত্র কীভাবে ধর্ম ও মৌলবাদকে লালন করে, পালন করে আর সময় বিশেষে উস্কে দেয় তার একটি বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিজ্ঞানীরা স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা করবে কি করবে না, কৃত্রিমভাবে সংযুক্ত জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র তুলে ফেলা হবে কি হবে না, স্কুলে বিবর্তনবাদ পড়ানো হবে কিনা, আর হলে কীভাবেইবা পড়াতে হবে, সবকিছুই সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সরকার। বিজ্ঞানীদের গবেষণা আর কাজকর্ম নৈতিক না অনৈতিক – এ নিয়েও উপযাজক হয়ে জ্ঞানগর্ভ মত দিতে এগিয়ে আসছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত অর্ধশিক্ষিত পাদ্রি আর যাজকেরা। যুদ্ধের আগে নবী-রাসুলদের মতোই 'ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর' শুনতে পেয়েছে সে দেশের প্রেসিডেন্ট; মিডিয়া, বৃহৎ পত্রিকা গোষ্ঠী আর প্রকাশক নির্ধারণ করে দিচ্ছে কোন্ খবরে আমরা বিশ্বাস করব, আর কোন খবর চেপে যাওয়া হবে। আসলে 'মুক্ত বিশ্বের' কথা মুখে বলে এভাবেই নাগরিক রুচি, চাহিদা, চেতনা আর পুরো জীবনধারাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে ধর্মান্ধ শাসককুল আর ধনকুবের গোষ্ঠী; সে অন্য এক ইতিহাস।

তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ *সমস্যা* হলেও আমরা মনে করি না সেটা ইসলামি সন্ত্রাসবাদের *কারণ*। ইসলামি সন্ত্রাসবাদের উৎস মূলত ইসলামেই নিহিত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কারণে কোরআনে 'যেখানেই অবিশ্বাসীদের পাওয়া যাক তাদের হত্যা' করার আয়াত, 'তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হবার' আয়াত, বিধর্মীদের উপর 'জিজিয়া কর আরোপ করার' আয়াত, 'গর্দানে আঘাত করার' আয়াত পয়দা হয়নি। ধর্মগ্রন্থগুলোতে নারীদের অবরুদ্ধ রাখার, শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করার, কিংবা যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে সহবাসের আয়াত, অথবা ব্যভিচারী নারীদের পাথর ছুঁড়ে হত্যার নির্দেশ মার্কিনরা করে যায়নি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মহানবী মুহাম্মদ নিজে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বনি কুয়ানুকা, ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে বনি নাদির আর ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে বনি কুরাইজার ইহুদি ট্রাইবকে আক্রমণ করে তাদের হত্যা করেন। বনি কুয়ানুকার ইহুদিদের সাতশ জনকে এক সকালের মধ্যে হত্যা করতে সচেষ্ট হন (কিন্তু 'ভণ্ড' বলে কথিত আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাইয়ের হস্তক্ষেপে সেটা বাস্তবায়িত হয়নি)[105], আর বনি কুরাইজার প্রায় আটশ থেকে নয়শ লোককে আব্দুল্লাহর বাধা উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত হত্যা করেই ফেলেন,

---

[105] Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint, p545

এমন কি তারা আত্মসমর্পণ করার পরও[106]। হত্যার ভয়াবহতা এতই বেশি ছিল যে, ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর মতো লেখিকা, যিনি মুসলিম সমাজের পছন্দের তালিকায় শীর্ষস্থানীয় হিসবে গণ্য হন, তিনি পর্যন্ত এ ধরণের কর্মকাণ্ডকে নাৎসি বর্বরতার সাথে তুলনা করেছেন[107]। বহু বিশ্লেষকই অতীতে দেখিয়েছেন যে, বিন লাদেন, বাংলা ভাই, মুফতি জসিম কিংবা মোহাম্মদ আতাসহ শীর্ষ সন্ত্রাসীরা মূলত ইসলামকে নিয়মনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন। এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে জানতে চাইলে পাঠকেরা মুক্তমনায় প্রকাশিত আকাশ মালিকের লেখা 'যে সত্য বলা হয় নি' ই-বইটি পড়ে নিতে পারেন[108]। কিন্তু তারপরেও অনেকেই আবার আছেন যারা ইতিহাস এবং বাস্তবতা ভুলে কেবল আমেরিকাকেই সব সময় ইসলামি সন্ত্রাসবাদের উৎস বলে মনে করেন। যেমন, নোয়াম চমস্কি যদিও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে বহু বিশ্লেষণমূলক লেখা লিখেছেন, এবং বাংলাদেশসহ বহু মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে তার বিশ্লেষণ খুবই জনপ্রিয়, তিনিও মনে করেন, 'আমেরিকা নিজেই এক সন্ত্রাসবাদী দেশ, সে কারণেই ৯ –১১ এর মতো আক্রমণ আমেরিকার ঘাড়ে এসে পড়েছে'[109]। সিএনএন- এর নিউজহোস্ট এবং নিউজ উইক ইন্টারন্যাশনালের এডিটর ফরিদ জাকারিয়া তার ২০০৭ সালে প্রকাশিত 'ভবিষ্যতের স্বাধীনতা' নামক বইয়ে বলেছেন, 'যদি মুসলিম সন্ত্রাসবাদের পেছনে কেবল একটি মাত্র কারণ পাওয়া যায়, তা হবে আরব বিশ্বে আমেরিকান পলিসির ব্যর্থতা' [110]। মুক্তচিন্তক স্যাম হ্যারিস জবাব দিয়েছেন এই বলে, 'হতে পারে। কিন্তু মুসলিম সন্ত্রাসবাদের উত্থান যদি সমস্যা হয়ে থাকে, তবে সমস্যার মূল কারণ হলো, ফান্ডামেন্টালস অফ ইসলাম'[111]।

ধর্ম, মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনার একটা বড় সমস্যা হলো অযাচিত 'স্টেরিওটাইপিং' এর ভয়। এ ধরণের আলোচনা শুরু হলেই আমরা দেখেছি বিশ্বাসীদের অনেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে থাকেন – শুধু গুটি কয়েক সন্ত্রাসীদের কারণে সামগ্রিকভাবে ইসলামকে বা মুসলিমদের দায়ী করা কি ঠিক হচ্ছে? একজন বিন লাদেন বা একজন মুফতি হান্নান কি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে নাকি? না, সত্যিই করে না।

---

[106] Tabari, Abu Ja'far Muhammad b. Jarir, 'The Victory of Islam', vol viii, pp.35-36

[107] K. Armstrong Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam, Gollanz, 1991, London, p. 207.

[108] আকাশ মালিক, যে সত্য বলা হয়নি, মুক্তমনা ইবুক।

[109] Noam Chomsky, 9-11, Open Media/Seven Stories Press; 2001

[110] Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, W. W. Norton & Company; Revised Edition edition, 2007.

[111] Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, W. W. Norton , 2005

কাজেই আমিও বলি যে, পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কখনোই সন্ত্রাসী বলা উচিত নয়, যারা এ ধরণের 'স্টেরিওটাইপিং' করতে চান তারা ভুল করেন। এটি এক ধরণের Racism। কেউবা বলেন এটি এক ধরণের রোগ – 'ইসলামোফোবিয়া'! রোগই বলুন আর পশ্চিমা জাত্যাভিমানই বলুন (যাকে প্রয়াত এডোয়ার্ড সাইদ অভিহিত করেন 'ওরিয়েন্টালিজম' নামে), ৯ –১১ এরপর পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসরত মুসলিমরা এ ধরণের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই – এ তো অস্বীকার করবার জো নেই। মুসলিম মানেই যে 'সন্ত্রাসী' নয় এটি বোঝার জন্য তো কোনো দর্শন কপচানোর দরকার নেই, আমার-আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তো যথেষ্ট হবার কথা। আমার নিজেরই অনেক মুসলিম বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। তাদের কেউই তো সন্ত্রাসী নন। কেউই বিন লাদেন নন, কেউই নন মুফতি হান্নান। তারা আমার বিপদে-আপদে খোঁজ-খবর নেন, বাসায় এসে গল্প-গুজব করেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, এমন কি নামাজের সময় হলে এই কাফিরের বাসায় 'পশ্চিম দিক কোনটা' জানতে চেয়ে নামাজও পড়েন। এরা নিপাট ভালো মানুষ। তারা কোরআনের কোন আয়াতে ভায়োলেন্সের কথা আছে তা সম্বন্ধে মোটেও ওয়াকিবহাল নন, সেটা নিয়ে আগ্রহীও নন – তারা আসলে 'স্পিরিচুয়াল ইসলামের' চর্চা করেন। বিপদটা কখনোই এদের নিয়ে নয়। এরা সবাই শান্তি, ভালোবাসা আর সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই মূল্যবোধগুলো তারা যতটা না ইসলাম থেকে পেয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ছোটবেলা থেকেই সামাজিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ কোনোদিন কোরআনের বা ইসলামের চর্চা না করেও তো বহু মানুষ এই গুণাবলী বর্জিত নয়, এমন হাজারো উদাহরণ হাজির করা যায়। কিন্তু এই 'স্পিরিচুয়াল ইসলামের'চর্চাকারী দলের বাইরেও একটা অংশ রয়েছে যারা রীতিমতো আক্ষরিকভাবে কোরআনের চর্চা করেন, চোখ-কান বন্ধ করে কোরআনের সকল আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেন আর কোরআনের আলোকে দেশ ও পৃথিবী গড়তে চান। বিপদটা এদের নিয়েই। কারণ কেউ যদি সামাজিক শিক্ষার বদলে কোরআনের সকল আদেশ-নির্দেশ চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নেন তাহলে কী হবে? সুরা আল-ইমরানের নিচের আয়াতটায় চোখ বোলানো যাক[112] –

> 'মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো অমুসলিম/কাফেরকে'বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না' (৩:২৮)।

যারা কোরআনের মধ্যে কখনো ভায়োলেন্সের টিকিটিও খুঁজে পান না, বরং পবিত্র কোরআনের আলোকে জীবন সাজাতে চান, তারা নিজেরাই কি তাদের কোনো হিন্দু, খ্রিস্টান বা অধার্মিক প্রতিবেশীদের প্রতি কোরআনে বর্ণিত উপরের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করেন? তারা কি সত্যিই শুধুমাত্র অমুসলিম বলেই কারো বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান

---

[112] কোরআন শরীফ (বঙ্গানুবাদ) পূর্বোক্ত।

করেন? যদি তা না হয়, তবে বলতেই হয় যে তারা আসলে কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী চলছেন না। কিন্তু কোরআন তো 'আল্লাহর কিতাব'। কেউ যদি ভাসা ভাসা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোরআনের চর্চা না করে কোরআনের সকল নির্দেশ আক্ষরিকভাবেই মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেন আর অবশেষে সাম্প্রদায়িক 'তালিবান' হিসেবে বেড়ে ওঠেন, তবে দোষটা কার হবে?

সুরা আল বাকারা থেকে আরেকটি আয়াত দেখি[113] –

> 'তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর' (২:২১৬)।

অথবা সুরা আন নিসা থেকে উদ্ধৃত করা যাক[114] –

> আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের জিম্মাদার নন! আর আপনি অন্য মুসলমানদেরকেও উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা (৪:৮৪)।

কোরআনের বর্ণিত নির্দেশ মতো জিহাদি জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে তালিবানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইহুদি-নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য আফগানিস্তান চলে গিয়েছিলেন অনেকেই; কারণ ইহুদি-নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে তারা আল্লাহর নির্দেশ বলেই মেনে নিয়েছিলেন। তাদের যে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় তাও নয়। ২০০৫ সালের ১৮ই অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলোর রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে নিষিদ্ধ ঘোষিত হরকাতুল জিহাদের তত্ত্বাবধানে আশির দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় তিন হাজার মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক জিহাদি জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিল। কোরআনের কিছু শিক্ষাই যে শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্যে 'কাফিরদের' বিরুদ্ধে অযথা হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানোতে বহুলাংশে দায়ী, এটি অস্বীকার করার চেষ্টা স্রেফ আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। এ স্পর্শকাতর বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে সবসময়ই ঘুরে ফিরে ৯-১১ এর ঘটনাটি সামনে চলে আসে। ৯-১১ এর ঘটনায় সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে দেখেছিল কী করে কিছু ধর্মোন্মাদ জিহাদি সৈনিক উড়োজাহাজকে অস্ত্র বানিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ

---

[113] কোরআন শরীফ (বঙ্গানুবাদ) পূর্বোক্ত।

[114] কোরআন শরীফ (বঙ্গানুবাদ) পূর্বোক্ত।

লোকের প্রাণহানি ঘটাতে পারে। যারা ইসলামের মধ্যে প্রতিনিয়ত শান্তি খোঁজেন, তারা বলবেন, এগুলো কতিপয় পথভ্রষ্ট দুষ্কৃতকারীদের কাজ – যার সাথে প্রকৃত ইসলামের সাথে কোনোই সম্পর্ক নাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই 'কতিপয় পথভ্রষ্ট দুষ্কৃতকারী'রা তো আর নিজেদের দুষ্কৃতকারী ভাবে নি। বরং ভেবেছে তারাই সাচ্চা মুসলিম, যারা কিনা আল্লাহর দেওয়া অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে। ৯ –১১ ঘটার অনেক আগেই – ১১ই জানুয়ারি ১৯৯৯ এর নিউজ উইকের একটি সংখ্যায় ওসামা বিন লাদেনের একটা সাক্ষাতকার ছাপা হয়েছিল। সেই সাক্ষাতকারে লাদেন সাহেব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন তিনি সকল আমেরিকানদের মেরে ফেলাকে 'জায়েজ' মনে করেন। পাঠকদের উদ্দেশ্য কিছু অংশ তুলে দেওয়া হলো[115] –

> QUESTION: Why have you asked Muslims to target civilian Americans all over the world? Islam prohibits its followers from killing civilians in war?
> BIN LADEN: If the Israelis are killing small children in Palestine and the Americans are killing the innocent people in Iraq, and if the majority of the American people support their dissolute president, this means the American people are fighting us and we have the right to target them.
>
> QUESTION: All Americans?
> BIN LADEN Muslim scholars have issued a fatwa [a religious order] against any American who pays taxes to his government. He is our target, because he is helping the American war machine against the Muslim nation.

হিন্দু ধর্মকে ইসলাম থেকে কোনো অর্থেই ভালো বলবার জো নেই। যে জাতিভেদ প্রথার বিষ-বাষ্প প্রায় তিন হাজার বছর ধরে কুড়ে কুড়ে ভারতকে খাচ্ছে তার প্রধান রূপকার স্বয়ং ঈশ্বর। মনুসংহিতা থেকে আমরা পাই – মানুষের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য, আর পা থেকে শূদ্র সৃষ্টি করেছিলেন (১:৩১)। বিশ্বাসীরা জোর গলায় বলেন, ঈশ্বরের চোখে নাকি সবাই সমান! অথচ, ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে আর শূদ্রদের পা থেকে তৈরি করার পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যটি কিন্তু বড়ই মহান! শূদ্র আর দলিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাই

---

[115] Terrorist and Insurgent Organizations, Air University Library Publications.

'ঈশ্বরের মাথা থেকে সৃষ্ট' উঁচু জাতের ব্রাহ্মণদের দুর্ব্যবহারের কথা সর্বজনবিদিত। সমস্ত বড়লোকের বাসায় এখনও দাস হিসেবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হয়। মনু বলেছেন – দাসত্বের কাজ নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শূদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন (৮:৪১৩)। এই সমস্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বাসার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে চলে যাওয়ার পর গঙ্গা-জল ছিটিয়ে গৃহকে 'পবিত্র' করা হতো (ক্ষেত্র বিশেষে এখনও হয়)। আর হবে নাই বা কেন! তারা আবার মানুষ নাকি? তারা তো অচ্ছুৎ! শ্রী এম.সি.রাজার কথায়, 'আপনি বাড়িতে কুকুর-বিড়ালের চাষ করতে পারেন, গো-মূত্র পান করতে পারেন, এমন কি পাপ দূর করার জন্য সারা গায়ে গোবর লেপতে পারেন, কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ছায়াটি পর্যন্ত আপনি মারাতে পারবেন না'! এই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের নৈতিকতা! এমন কি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে শূদ্রদের উপার্জিত ধন সম্পত্তি তাদের ভোগেরও অধিকার নেই। সব উপার্জিত ধন দাস-মালিকেরাই গ্রহণ করবে – এই ছিল মনুর বিধান – 'ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিত স্বং ভর্ত্তৃহার্যধনো হি সঃ' (৮:৪১৬)। শূদ্ররা ছিল বঞ্চণার করুণতম নিদর্শন; তাদের না ছিল নাগরিক অধিকার, না ছিল ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক অধিকার। শূদ্রদের যাতে অন্য তিন বর্ণ থেকে আলাদা করে চেনা যায় এবং শূদ্ররা যেন প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখে যে তিন বর্ণের মানুষের ক্রীতদাস হয়ে সেবা করবার জন্যই তাদের জন্ম। তিন বর্ণের মানুষদের থেকে শূদ্ররা যে ভিন্নতর জীব তা জানানোর জন্য প্রতি মাসে মাথার সব চুল কামিয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছেন মনু (৫:১৪০)। একজন শূদ্রকে বেদ পাঠ তো দূরের কথা, শ্রবণেরও অধিকার দেওয়া হয় নি। একজন শূদ্রকে তার উঁচু জাতে বিয়ে করবার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। একজন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসে পড়ে, তবে তার বুকে গরম লোহার দন্ডের ছ্যাঁকা দেবার অথবা পশ্চাৎদেশ কর্তন করে নেবার বিধান রয়েছে (৮: ২৮১)[116]।

মনুর এসব বর্ণবাদী নীতির বাস্তব রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই রামায়ণ ও মহাভারতে। বিশেষত ধর্মশাস্ত্রীয় অনুশাসন যে শ্রেণী বৈষম্যের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং শূদ্রদের দমন-নিপীড়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ রামায়ণের শম্বুকবধ কাহিনি। তপস্যা করার 'অপরাধে' রামচন্দ্র খড়গ দিয়ে শম্বুক নামক এক শূদ্র তাপসের শিরচ্ছেদ করেন তার তথাকথিত রামরাজ্যে [117]।

প্রায় একই ধরণের ঘটনা আমরা দেখি মহাভারতে যখন নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে এলে তাকে নীচ জাতি বলে প্রত্যাখ্যান করেন দ্রোণ। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত একলব্যের শর নিক্ষেপের দক্ষতা নষ্ট করে ধনুর্বিদ্যায় দ্রোণের প্রিয় ছাত্র অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রক্ষার

---

[116] সাদ কামালী এবং অভিজিৎ রায় (সম্পাদনা), স্বতন্ত্র ভাবনা, চারদিক, ২০০৮

[117] বাল্মীকি রামায়ন, হেমচন্দ্র অনূদিত, রিফেকট পাবলিকেশন, কলিকাতা ১৯৮৪, পৃঃ ১০৬৭-৭১

অভিপ্রায়ে 'গুরু দক্ষিণা' হিসেবে একলব্যের বুড়ো আঙ্গুল কেটে নেন তিনি। এ ধরণের অনেক উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন মহাকাব্যগুলোতে[118]।

আসলে এইসব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আদিম মানুষের সাম্যের সমাজকাঠামোর ভিত উপড়ে ফেলে প্রতিষ্ঠা করেছিল অসাম্য, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের। ধর্মই তৈরি করেছিল হুজুর-মুজুর শ্রেণীর কৃত্রিম বিভাজনের, কিংবা হয়তো বলা যায় শোষক শ্রেণীই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ফায়দা পুরোপুরি লুটবার জন্য প্রথম থেকেই কাজে লাগিয়েছিল ধর্মকে; যেভাবেই দেখি না কেন এর ফলে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সামাজিক আর অর্থনৈতিক শোষণের। এই শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবার জন্যই ব্রাহ্মণেরা প্রচার করেছিল – ধর্মগ্রন্থগুলো স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত। মানুষে মানুষে বিভেদ নাকি ঈশ্বর-নির্দেশিত! ঈশ্বরকে সাক্ষী মেনে রাজনৈতিকভাবে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত সুঁদূরপ্রসারী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় উপমহাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে।

ইসলামি জিহাদি সৈনিকদের মতোই ভারতে বিভেদের হাতিয়ার 'সনাতন ধর্ম' রক্ষায় আজ সচেষ্ট হয়েছে বিজেপি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, শিব-সেনা, বজরং দলের মতো প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো। কয়েক দশক আগেও ভারতে নবহিন্দুত্বের তেমন কোনো সংগঠিত রূপ ছিল না[119]। তবে অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর ধর্মান্ধতার কারণে ভারতের আপামর জনসাধারণের কাছে সন্ন্যাসী, গেরুয়া, জটা, দণ্ড, রুদ্রাক্ষ, কমণ্ডুল এসব দীর্ঘকাল ধরে একটা বিমূঢ় সম্ভ্রম ভোগ করে এসেছে। ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের মোহের কথা ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা জানে। এই ধর্মীয় ভাবালুতাকে উস্কে দিতেই বোধহয় ১৯৮৮ –৯০ সালে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দূরদর্শনে ধর্মীয় অবয়বে প্রচারিত হলো রামায়ণ আর মহাভারত। সরকারি প্রচার মাধ্যমে এভাবে অন্ধবিশ্বাসকে উৎসাহ দেবার ফলে ভারতে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দুয়ার উন্মোচিত হলো, রোপণ করা হলো এক বিষ-বৃক্ষের চারা। দূরদর্শনের পর্দায় প্রথমবার রামায়ণ চলাকালে কল্পিত রাম জন্মভূমি নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার এবং পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর উত্থান সেই প্রক্রিয়ারই অংশ। জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে তার 'মহাকাব্য ও মৌলবাদ' বইয়ে বলেন[120] –

---

[118] মহাকাব্যগুলোতে মনুর প্রভাব বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুনঃ মহাকাব্য ও মৌলবাদ, জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায়, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা। এবং Laws of Manu, translated with extracts from seven commentaries by G. Buhler, ed. F. Max Muller, Clarendon Press, Oxford, 1886.

[119] সুকুমারী ভট্টাচার্য, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, দীপ প্রকাশন, ২০০০।

[120] মহাকাব্য ও মৌলবাদ, জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায়, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা।

'দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে রামায়ণ ও মহাভারতকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহাকাব্যিক প্রতিফলন হিসেবে অথবা ভারতীয় তথা বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য ধ্রুপদী সম্পদ হিসেবে গণ্য না করে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতাই বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানেই আমাদের গভীর লজ্জা। প্রথমে ১৯৮৮–৯০ সালে এবং আরও কয়েকবার সরকারি দূরদর্শনে রামায়ণ ও মহাভারত যে অবয়ব ও প্রকাশভঙ্গিমায় সম্প্রচারিত হয়েছে, তা এই মৌলবাদী রাজনীতিতে ইন্ধন জুগিয়েছে বলেই মনে হয়। দূরদর্শনে সম্প্রচারিত রামায়ণের কাহিনি প্রধানত তুলসী দাস রচিত রামচরিত মানস গ্রন্থকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে, বাল্মীকি রামায়ণকে ভিত্তি করে নয়। তুলসী রামায়ণের কাহিনি মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলনের ফলশ্রুতি এবং বৈষ্ণব ভক্তি সাহিত্যের অন্তর্গত। আদি বাল্মীকি রামায়ণে বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড ছিল না। আর পরবর্তী কালে সংযোজিত এই দুই কাণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্ষিপ্ত কথা বাদ দিলে আদি বাল্মীকি রামায়ণে রামের অবতারত্বের বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় না। মহাকাব্য হিসেবেও রামায়ণের সাহিত্যগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তুলসী রামায়ণে বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ দেবতা রামকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। যা এমন কি বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডসহ পল্লবিত বাল্মীকি রামায়ণেরও প্রধান বিষয়বস্তু নয়। দূরদর্শনে এভাবে রামায়ণকে মহাকাব্য হিসেবে উপস্থিত না করে বিকৃতরূপে অবতারকাহিনি ও ধর্মগ্রন্থরূপেই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সরকারি প্রচারমাধ্যমে এভাবে অন্ধবিশ্বাসকে উৎসাহ দেওয়ার ফলে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সঞ্জীবিত হয়েছে, এ ধারণা যুক্তিসঙ্গত। দূরদর্শনের পর্দায় প্রথমবার রামায়ণ চলাকালে রাম জন্মভূমি নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার এবং পরবর্তীকালে তার ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াই এর অকাট্য প্রমাণ।'

২০০২ সালে গুজরাটে ঘটে যাওয়া স্মরণকালের সবচাইতে ভয়াবহ দাঙ্গা আমরা দেখেছি। ধর্মের মায়াজালে পড়ে সাধারণ মানুষ কী ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে আর নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে – গুজরাটের সাম্প্রতিক দাঙ্গা তার প্রমাণ। তারপরেও কিন্তু ধর্মের সমালোচনা করলে মৌলবাদীদের সাথে সাথে অনেক প্রগতিপন্থীরাও একাট্টা হয়ে বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ান!

ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের পবিত্রগ্রন্থের দিকে তাকালে দেখা যায়, পুরো বাইবেলটিতেই ঈশ্বরের নামে খুন, রাহাজানি, ধর্ষণকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। কিছু উদাহরণ তো দেওয়া যেতেই পারে। যুদ্ধজয়ের পর অগণিত যুদ্ধবন্দিকে কব্জা করার পর মুসা নির্দেশ দিয়েছিলেন ঈশ্বরের আদেশ হিসেবে সমস্ত বন্দি পুরুষকে মেরে ফেলতে[121]–

এখন তোমরা এইসব ছেলেদের এবং যারা কুমারী নয় এমন সব স্ত্রী লোকদের মেরে ফেলো; কিন্তু যারা কুমারী তাদের তোমরা নিজেদের জন্য বাঁচিয়ে রাখো (গণনা পুস্তক, ৩১:১৭ -১৮)।

---

[121] পবিত্র বাইবেল, পুরতন ও নূতন নিয়ম, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, ২০০০

একটি হিসেবে দেখা যায়, মুসার নির্দেশে প্রায় ১০০,০০০ জন তরুণ এবং প্রায় ৬৮,০০০ অসহায় নারীকে হত্যা করা হয়েছিল[122]। এছাড়াও নিষ্ঠুর, আক্রমণাত্মক এবং অরাজক বিভিন্ন আয়াতসমূহের বিবরণ পাওয়া যায় যিশাইয় (২১:৯), ১ বংশাবলী (২০:৩), গণনা পুস্তক (২৫:৩ –৪), বিচারকর্তৃগন (৮:৭), গণনা পুস্তক (১৬:৩২–৩৫), দ্বিতীয় বিবরণ (১২:২৯–৩০), ২ বংশাবলী (১৪:৯,১৪:১২), দ্বিতীয় বিবরণ (১১:৪–৫), ১ শমূয়েল (৬:১৯), ডয়টারনোমি (১৩:৫ –৬, ১৩:৮–৯, ১৩:১৫), ১ শমূয়েল (১৫:২ –৩), ২ শমূয়েল (১২:৩১), যিশাইয় (১৩:১৫ –১৬), আদিপুস্তক (৯:৫ –৬) প্রভৃতি নানা জায়গায়।

বিশ্বাসী খ্রিস্টানরা সাধারণত বাইবেলে বর্ণিত এই ধরণের নিষ্ঠুরতা এবং অরাজকতাকে প্রত্যাখ্যান করে বলার চেষ্টা করেন, এগুলো সব বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ) অধীন, যিশুখ্রিস্টের আগমনের সাথে সাথেই আগের সমস্ত অরাজকতা নির্মূল হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এটি সত্য নয়। বাইবেলের নতুন নিয়মে যিশু খুব পরিষ্কার করেই বলেছেন যে তিনি পূর্বতন ধর্মপ্রবর্তকদের নিয়মানুযায়ীই চালিত হবেন[123] –

> এ কথা মনে করো না, আমি মোশির আইন-কানুন আর নবীদের লেখা বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসি নি বরং পূর্ণ করতে এসেছি (মথি, ৫: ১৭)।

খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা যেভাবে যিশুকে শান্তি এবং প্রেমের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন, সত্যিকারের যিশু ঠিক কতটুকু প্রেমময় এ নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। যিশু খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে –

> 'আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি এই কথা মনে করো না। আমি শান্তি দিতে আসি নাই, এসেছি তলোয়ারের আইন প্রতিষ্ঠা করতে। আমি এসেছি মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে দাঁড় করাতে; ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, বৌকে শাশুড়ির বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি' (মথি, ১০: ৩৪ –৩৫)।

ব্যভিচার করার জন্য শুধু ব্যভিচারিণী নন, তার শিশুসন্তানদের হত্যা করতেও কার্পণ্য বোধ করেন না যিশু[124] –

> 'সেইজন্য আমি তাকে বিছানায় ফেলে রাখব, আর যারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করে তারা যদি ব্যভিচার থেকে মন না ফেরায় তবে তাদের ভীষণ কষ্টের মধ্যে ফেলব।

---

[122] The Dark Bible, Compiled by Jim Walker, http://www.nobeliefs.com/DarkBible/DarkBibleContents.htm

[123] পবিত্র বাইবেল,পূর্বোক্ত

[124] পবিত্র বাইবেল,পূর্বোক্ত

তার ছেলেমেয়েদেরও আমি মেরে ফেলব' (প্রকাশিত বাক্য, ২: ২২ –২৩)।

ধর্মের সমালোচনা কেন?

মানবতাবাদীরা আর যুক্তিবাদীরা কেন ধর্মগ্রন্থগুলোর সমালোচনা করেন? সমালোচনা করেন কারণ তা সমালোচনার যোগ্য, তাই। কোনোকিছুই তো আসলে সমালোচনার উর্ধ্বে নয় – তা সে অর্থনীতি বা পদার্থবিজ্ঞানের নতুন কোনো তত্ত্বই হোক, বা মহান আল্লাহর বাণীই হোক। আসলে পুরো ধর্মবিশ্বাসই তো দাঁড়িয়ে আছে এক জলজ্যান্ত মিথ্যার উপর ভর করে। ধর্ম মানেই আজ কিছু অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা, কুসংস্কার আর রীতি-নীতির সমাহার, যেগুলো কালের পরিক্রমায় উপযোগিতা হারিয়েছে। ধর্মের সমালোচনার আর একটি বড় কারণ হলো, ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিরাজমান নিষ্ঠুরতা। ধর্মগ্রন্থগুলো তো আর গীতাঞ্জলি বা সঞ্চিতার মতো নির্দোষ কাব্যসমগ্র নয় যে অবসর সময়ে শুয়ে শুয়ে কাব্য চর্চা করলাম আর তারপর আলমারীর তাকে তুলে রেখে দিলাম! ধর্মগ্রন্থগুলোতে যা লেখা আছে তা ঈশ্বরের বাণী হিসেবে পালন করা হয় আর উৎসাহের সাথে সমাজে তার প্রয়োগ ঘটান হয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত সতীদাহর মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শুধুমাত্র ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে সতীদাহের স্বীকার হয়েছে ৮১৩৫ জন নারী। এই তো সেদিনও – ১৯৮৭ সালে রূপ কানোয়ার নামে একটি মেয়েকে রাজস্থানে পুড়িয়ে মারা হলো 'সতী মাতা কী জয়' ধ্বনি দিয়ে। সারা গ্রামের মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল – কেউ টুঁ শব্দটি করলো না। আর করবেই বা কেন? ধর্ম নাশ হয়ে যাবে না? মহাভারতের কথা শুনলে যেমন পুণ্য হয়, সতী পোড়ানো দেখলেও নাকি তেমনি। আমি আমার পূর্ববর্তী 'অবিশ্বাসের দর্শন' বইটাতে সতীদাহের পরিসংখ্যান হাজির করেছিলাম। এক 'মডারেট' হিন্দু বইটার রিভিউ করতে গিয়ে একটা ব্লগ সাইটে লিখে দিলেন – পুরো ব্যাপারটাই নাকি সাংস্কৃতিক, ধর্মগ্রন্থে নাকি সতীদাহের কোন অস্তিত্ব নেই। আসলে এই 'মডারেট' হিন্দুরা নিজের ধর্মগ্রন্থটাও ঠিকমত পড়ে দেখেন না। অনেক হিন্দুই জানেন না তাদের ধর্মগ্রন্থে 'স্বামী মারা গেলে বিধবাকে স্বামীর চিতায় আগুনে পুড়ে মরে সতী হওয়ার' সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। যেমন, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৮নং সূক্তের ৭ নং ঋক (১০/১৮/৭) দ্রষ্টব্য :

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु ।
अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥

শ্লোকটির ইংরেজি হচ্ছে : 'Let these women, whose husbands are worthy and are living, enter the house with ghee (applied) as collyrium (to their eyes). Let these wives first step into the pyre, tearless without any affliction and well adorned.'।

অথর্ববেদে রয়েছে : "আমরা মৃতের বধূ হবার জন্য জীবিত নারীকে নীত হতে দেখেছি।" (১৮/৩/১,৩)। পরাশর সংহিতায় পাই, "মানুষের শরীরে সাড়ে তিন কোটি লোম থাকে, যে নারী মৃত্যুতেও তার স্বামীকে অনুগমন করে, সে স্বামীর সঙ্গে ৩৩ কোটি বৎসরই স্বর্গবাস করে।" (৪:২৮)। দক্ষ সংহিতার ৪:১৮ –১৯নং শ্লোকে বলা হয়েছে, "যে সতী নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রবেশ করে সে স্বর্গে পূজা পায়"। এই দক্ষ সংহিতার পরবর্তী শ্লোকে (৫:১৬০) বলা হয়েছে, "যে নারী স্বামীর চিতায় আত্মোৎসর্গ করে সে তার পিতৃকুল, স্বামীকুল উভয়কেই পবিত্র করে।"

হিন্দু ধর্মের সতীদাহ আসলে ধর্মগ্রন্থ থেকেই উৎসারিত ছিল, তা এখন যতই অস্বীকার করার চেষ্টা হোক না কেন। ধর্ম যে কীরকম নেশায় বুঁদ করে রাখে মানুষকে, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এই সতীদাহ। এজন্যই বোধহয় প্যাসকেল বলেছেন – 'Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.' খুবই সত্যি কথা। চিন্তা করুন ব্যাপারটা – জীবন্ত নারী-মাংস জ্বলছে, ছটফট করছে, অনেক সময় বেঁধে রাখতে কষ্ট হচ্ছে, মাঝে মাঝে পালাতে চেষ্টা করছে – আফিম জাতীয় জিনিস গিলিয়ে দিয়ে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আবার চিতায় তুলে দেওয়া হচ্ছে – কী চমৎকার মানবিকতা[125] ! প্রায় প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় পড়ছি যে, ইসলামি বিশ্বে শরিয়ার শিকার হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে অসহায় সাফিয়া, আমিনারা। তবুও নেশায় বুঁদ হয়ে ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'শান্তি', 'প্রগতি' আর 'সহিষ্ণুতা' খুঁজে চলেছেন মডারেট ধর্মবাদীরা[126]।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই বেশ কিছু ভালো ভালো কথা আছে (এগুলো নিয়ে আমার কিংবা কারোই আপত্তি করার কিছু নেই); এগুলো নিয়েই ধার্মিকেরা গর্ববোধ করেন আর এ কথাগুলোকেই নৈতিকতার চাবিকাঠি বলে মনে করেন তারা। কিন্তু একটু সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই বোঝা যাবে – ভালোবাসা প্রেম

---

[125] ভাস্বতী চক্রবর্তী, সতী: একের আনলে বহুরে আহুতি, দেশ ৪ জানুয়ারি, ২০০৩।

[126] সত্যি কথা বলতে কি- আমরা নতুন দিনের নাস্তিকেরা আসলে বিন-লাদেন, মুফতি হান্নান, বাংলা ভাই, মোল্লা ওমর, খোমেনি বা মৌলানা মান্নানের মতো লোকদের তেমন একটা দোষ দেই না; অন্ততঃ তারা কথায় আর কাজে এক। আল্লাহ কোরআ্নে যেভাবে বলেছেন, ঠিক সেভাবেই কোরআ্নের আদর্শকে সামনে রেখে তারা কাজ করে চলেছেন। আমরা আসলে দোষ দেই 'শিক্ষিত' এবং 'মডারেট' তকমাধারী ধার্মিকদের যারা কোরআ্নের মধ্যে সহিষ্ণুতা খুঁজে পান আর চারিদিকে এত অশান্তি দেখেও 'ইসলাম শান্তির ধর্ম' বলতে বলতে চুপ হয়ে যান। ঠিক একই ব্যাপার সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দুদের জন্যও খাটে। যারা রামের শাসনামলে শূদ্র তাপস, শম্বুক কিংবা রামপত্নী সীতার কি করুণ অবস্থা হয়েছিল তা না জেনেই 'রাম রাজ্য' প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন, অথবা বেদ, গীতা, উপনিষদ, মনুসংহিতায় কি আছে তা না জেনেই হিন্দু ধর্মকে সহিষ্ণুতম ধর্ম হিসেবে আখ্যা দিয়ে বসেন, আর মারামারি, হানাহানি আর সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির জন্য দায়ী করেন কেবল গুটিকয় আদভানী আর লালু প্রসাদকে।

এবং সহিষ্ণুতার বিভিন্ন উদাহরণ যে ধর্মগ্রন্থ এবং তার প্রচারকদের সাথে লেবেল হিসেবে লাগিয়ে দেওয়া হয়, সেগুলো কোনোটাই ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের জন্য মৌলিক নয়। যেমন, যিশুখ্রিস্টের অনেক আগেই লেভিটিকাস (১৯:১৮) বলে গেছেন, 'নিজেকে যেমন ভালোবাস, তেমনি ভালোবাসবে তোমার প্রতিবেশীদের।' বাইবেল এবং কোরআনে যে সহনশীলতার কথা বলা আছে, সেগুলোর অনেক আগেই (খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগে) কনফুসিয়াস এইরকমভাবে বলেছিলেন – 'অন্যের প্রতি সেরকম ব্যবহার করো না, যা তুমি নিজে পেতে চাও না'। আইসোক্রেটস খ্রিস্টের জন্মের ৩৭৫ বছর আগে বলে গিয়েছিলেন, 'অন্যের যে কাজে তুমি রাগান্বিত বোধ করো, তেমন কিছু তুমি অন্যদের প্রতি করো না'। এমন কি শত্রুদের ভালোবাসতে বলার কথা তাওইজমে রয়েছে, কিংবা বুদ্ধের বাণীতে, সেও কিন্তু যিশু বা মুহম্মদের অনেক আগেই[127]।

কাজেই নৈতিকতার যে উপকরণগুলোকে ধর্মানুসারীরা তাদের স্ব স্ব ধর্মের 'পৈত্রিক সম্পত্তি' বলে ভাবছেন, সেগুলো কোনোটাই কিন্তু আসলে ধর্ম থেকে উদ্ভূত হয় নি, বরং বিকশিত হয়েছে সমাজবিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে। সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যকে 'নৈতিক গুণাবলী' হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে; কারণ ওভাবে গ্রহণ না করলে সমাজব্যবস্থা অচিরেই ধ্বসে পড়তো। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক সলোমন অ্যাশ বলেন –

> 'আমরা এমন কোনো সমাজের কথা জানি না, যেখানে সাহসিকতাকে হেয় করা হয়, আর ভীরুতাকে সম্মানিত করা হয়; কিংবা উদারতাকে পাপ হিসেবে দেখা হয় আর অকৃতজ্ঞতাকে দেখা হয় গুণ হিসেবে'।

এমন ধরণের সমাজের কথা আমরা জানি না কারণ এমন সমাজ টিকে থাকতে পারে না। খুব সাদা চোখে দেখলেও, একটি সমাজে চুরি করা যে অন্যায়, এটি বোঝার জন্য কোনো স্বর্গীয় ওহি নাজিল হবার দরকার পড়ে না। কারণ যে সমাজে চুরি করাকে না ঠেকিয়ে মহিমান্বিত করা হবে, সে সমাজের অস্তিত্ব লোপ পাবে অচিরেই। ঠিক একইভাবে আমরা বুঝি, সত্যি কথা বলার বদলে যদি মিথ্যা বলাকে উৎসাহিত করা হয়, তবে মানুষে মানুষে যোগাযোগ রক্ষা করাই দুরূহ হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারগুলো উপলব্ধির জন্য কোনো ধর্মশিক্ষা লাগে না। আবার এমনও দেখা গেছে যে, শতাব্দী-প্রাচীন কোনো চলমান ব্যবস্থার পরিবর্তন মানুষ নিজে থেকেই করেছে পরিবর্তিত মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে মানবতাকে যাচাই করে, এবং অনেকক্ষেত্রেই ধর্ম কী বলছে না বলছে তার তোয়াক্কা না করেই। দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ এমনি একটি ঘটনা। বলা বাহুল্য,

---

[127] Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis: How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books, 2007

কোনো ধর্মগ্রন্থেই দাসত্ব উচ্ছেদের আহ্বান জানানো হয় নি। বাইবেলের নতুন কিংবা পুরাতন নিয়ম, কিংবা কোরআন, অথবা বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা – কোথাওই দাসত্ব প্রথাকে নির্মূল করার কথা বলা হয় নি, বরং সংরক্ষিত করার কথাই বলা হয়েছে প্রকারান্তরে। কিন্তু মানুষ সামাজিক প্রয়োজনেই একটা সময় দাসত্ব উচ্ছেদ করেছে, যেমনিভাবে হিন্দু সমাজ করেছে সতীদাহ নির্মূল বা খ্রিস্ট সমাজ করেছে ডাইনি পোড়ানো বন্ধ। সতীত্ব সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা, কিংবা সমকামিতা বা গর্ভপাতের অধিকার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে সারা পৃথিবী জুড়ে এ কয় দশকে। এ পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির অনেকগুলোই ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি: লেট দ্য ডেটা ডিসাইড

আজ আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, আল্লাহর গোনাহর দোহাই দিয়ে মানুষজনকে সৎ পথে পরিচালিত করার ব্যাপারটি কী নিদারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আল্লাহ বা ঈশ্বরের গোনাহর ভয় দেখিয়েই যদি মানুষজনকে পাপ থেকে বিরত রাখা যেত, তা হলে রাষ্ট্রে পুলিশ-দারোগা, আইন-কানুন, কোর্ট-কাচারি কোনো কিছুরই প্রয়োজন হতো না। এক ইন্টারনেট ফোরামে একটা সময় রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং ধর্মের নৈতিকতা বিষয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম; সাথে সাথেই এক ধার্মিক ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করলেন – 'অভিজিৎ রায়ের মতো নাস্তিক লোকজন রাষ্ট্রে আছেন বলেই পুলিশ দারোগার প্রয়োজন'। এ ধরণের উক্তিকে স্রেফ একজনমাত্র অজ্ঞ ধার্মিকের আস্ফালন বলে মনে করলে কিন্তু ভুল হবে। এ ধরণের ধ্যান ধারণা অনেকেই মনে মনে পোষণ করেন, তাদের বেশ বড় অংশই আবার সুশিক্ষিত। আমেরিকার রক্ষণশীল লেখিকা অ্যান কোল্টার তার 'গডলেস' বইয়ে মন্তব্য করেছেন, 'সমাজ ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে না চললে দাসত্ব, গণহত্যা, পশুবৃত্তিতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে'[128]। একই কথা উচ্চারণ করেছেন ডিসকভারি ইন্সটিটিউটের পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের অন্যতম প্রবক্তা ফিলিপ জনসনও একটু ভিন্ন ভাবে। তার মতে, যেহেতু অবিশ্বাসীরা ডারউইনের মতানুসারে মনে করে মানুষ বানর থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সেহেতু তারা যেকোনো ধরণের 'নাফরমানি' করতে পারে – সমকামিতা, গর্ভপাত, পর্নোগ্রাফি, তালাক, গণহত্যা সবকিছু। এমন একটা ভাব, ডারউইন আসার আগ পর্যন্ত সারা পৃথিবী যেন এগুলো থেকে একেবারেই মুক্ত ছিল! ফক্স টিভির 'ও'রাইলি ফ্যাক্টরের' জনপ্রিয় উপস্থাপক বিল ও'রাইলি তার একটি বইয়ে লিখেছেন, ঈশ্বরের আইনের বিরুদ্ধে গেলে পুরো সমাজ নৈরাজ্য এবং অরাজকতায় পতিত হবে, আর আইন-লঙ্ঘনকারীরা সমাজকে জঙ্গল বানিয়ে ফেলবে[129]।

---

[128] Ann Coulter, Godless: The Church of Liberalism, Three Rivers Press, 2007
[129] Bill O'Reilly, Culture Warrior, Broadway , 2007

একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি হিসেবে অ্যান কোল্টার, বিল ও'রাইলি কিংবা ফিলিপ জনসনের এ ধরণের আবেগপ্রবণ আপ্তবাক্যাবলীতে আমাদের বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই, বরং আমাদের আস্থা থাকবে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত ফলাফলে; বিজ্ঞানীরা যেটিকে বলেন, 'Let the data decide'। আমরা ফিলিপ জনসনের সমর্থনে এমন কোনো উপাত্ত বা ডেটা খুঁজে পাই নি যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের চাইতে বেশি অপরাধপ্রবণ; বরং কিছু পরিসংখ্যান একেবারেই উল্টো সিদ্ধান্ত হাজির করেছে। আমেরিকায় বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে নাস্তিকদের চাইতে পুনরুজ্জীবিত খ্রিস্টানদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার বেশি; এও দেখা গিয়েছে, যেসব পরিবারের পরিবেশ ধর্মীয়গতভাবে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল সেসমস্ত পরিবারেই বরং শিশুদের উপর পরিবারের অন্য কোনো সদস্যদের দ্বারা বেশি যৌন নিপীড়ন হয়[130]। ১৯৩৪ সালে আব্রাহাম ফ্রান্সব্লাউ তার গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন ধার্মিকতা এবং সততার মধ্যে বরং বৈরী সম্পর্কই বিদ্যমান। ১৯৫০ সালে মুর রসের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, ধার্মিকদের তুলনায় নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরাই বরং সমাজ এবং মানুষের প্রতি সংবেদনশীল থাকেন, তাদের উন্নয়নের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ১৯৮৮ সালে ভারতের জেলখানায় দাগী আসামীদের মধ্যে একটি জরিপ চালিয়েছিল। জরিপের যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল অবাক করার মতো। দেখা গিয়েছে, আসামীদের শতকরা ১০০ জনই ঈশ্বর এবং কোনো না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী[131]। আমেরিকায়ও এরকম একটি জরিপ চালানো হয়েছিল ৫ ই মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে। সে জরিপে দেখা গেছে যে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (৮-১০%) ধর্মহীন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কম (মাত্র ০.২১%), সে তুলনায় ধার্মিকদের মধ্যে শতকরা হিসেবে অপরাধপ্রবণতা অনেক বেশি[132]। আমার ধারণা আজ বাংলাদেশে জরিপ চালালেও ভারতের মতোই ফলাফল পাওয়া যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, বেহেস্তের লোভ বা দোজখের ভয় কোনোটাই কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে নি। আল্লাহর গোনাহ কিংবা ঈশ্বরের ভয়েই যদি মানুষ পাপ থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারত, তবে তো বাংলাদেশ এতদিনে বেহেস্তে পরিণত হতো। কিন্তু বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা আজ কী দেখছি? বাংলাদেশে শতকরা ৯৯ জন লোকই আল্লা-খোদা আর পরকালে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতিতে এই

---

[130] Kimberly Blaker, The Fundamentals of Extremism: The Christian Right in America, New Boston Books, 2003

[131] প্রবীর ঘোষ, অলৌকিক নয়, লৌকিক, তৃতীয় খন্ড, দে'জ প্রকাশনী, পৃঃ ৩৯।

[132] The results of the Christians vs atheists in prison investigation, By Rod Swift, http://holysmoke.org/icr-pri.htm

দেশ প্রায়ই থাকে পৃথিবীর শীর্ষে। ধর্মে বিশ্বাস কিন্তু দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারে নি। পারবেও না। যে দেশে সর্বোচ্চ পদ থেকে বইতে শুরু করে দুর্নীতির স্রোত, যে দেশে ধর্ষকেরা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকে এবং বুক চিতিয়ে ঘুরে-বেড়ায়, নেতা হবার সুযোগ পায়, সে দেশের মানুষ নামাজ পড়েও দুর্নীতি চালিয়ে যাবে; তারা রোজাও রাখবে, আবার ঘুষও খাবে। তাই হচ্ছে। এই তো ধর্মপ্রাণ, আল্লাহ-খোদায় বিশ্বাসী বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা। অপরদিকে ঈশ্বরবিহীন দেশগুলোর দিকে তাকানো যাক। আমাকে পেশাগত কারণে একটা সময় দীর্ঘদিন সিঙ্গাপুরে থাকতে হয়েছিল। সেখানে থাকাকালীন সময়গুলোতে লক্ষ্য করেছিলাম যে, দেশটিতে অধিকাংশ লোকই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মপরিচয় থেকে মুক্ত। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অনেক চীনা ছাত্র-ছাত্রীকেই তিনি দেখেছেন ধর্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে – 'ফ্রি থিঙ্কার'। অথচ ধর্ম নয়, শুধু আইনের শাসন আর সামাজিক মূল্যবোধগুলোর চর্চা করে সিঙ্গাপুর আজ পৃথিবীর সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি। অধিকাংশ সিঙ্গাপুরবাসীরা আল্লাহ-খোদার নামও করেন না, নরকের ভয় অথবা বেহেস্তের লোভও তাদের নেই। কোন জাদুবলে তারা তাহলে দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকছে?

এটি আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি ভাবলে ভুল হবে। সাম্প্রতিককালে বহু আন্তর্জাতিক গবেষকই এই পর্যবেক্ষণের সাথে একমত পোষণ করেন। যেমন, গবেষক ফিল জুকারম্যান ২০০৫ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে সমীক্ষা চালিয়েছেন। সেসব দেশগুলোতে ঈশ্বরে বিশ্বাস এখন একেবারেই নগণ্য। যেমন, সুইডেনে জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ ভাগ এবং ডেনমার্কে প্রায় ৮০ ভাগ লোক এখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না[133]। অথচ সেসমস্ত 'ঈশ্বরে অনাস্থা পোষণকারী' দেশগুলোই আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্থ এবং সবচেয়ে কম সহিংস দেশ হিসেবে চিহ্নিত। ফিল জুকারম্যান তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন, 'ঈশ্বরবিহীন সমাজ' শিরোনামে[134]। তিনি সেই বইয়ে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন যে, ডেনমার্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আরহাসে থাকাকালীন সময়গুলোতে কোনো পুলিশের গাড়ি দেখেন নি বললেই চলে। প্রায় ৩১ দিন পার করে তিনি প্রথম একটি পুলিশের গাড়ি দেখেন রাস্তায়। পুরো ২০০৪ সালে মাত্র একজন লোক হত্যার খবর প্রকাশিত হয়। এ থেকে বোঝা যায় এ সমস্ত দেশগুলোতে মারামারি হানাহানি কতো কম। শুধু তাই নয়,

[133] Phil Zuckerman,. 'Atheism: Contemporary Rates and Patterns', chapter in The Cambridge Companion to Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2005.

[134] Phil Zuckerman, Society without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment, NYU Press, 2010

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে ডেনমার্ক পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দেশ[135]।

আরেকটা সাম্প্রতিক উদাহরণ দেই। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ০৩ তারিখ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে, যা হয়তো অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গেছে। খবরের শিরোনাম – 'অপরাধী কম, তাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারাগার'। না, দেশটা বাংলাদেশ নয়, সুইডেন। বিষয় হল – সুইডেনের কারাগারগুলো নাকি সব ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিগত সময়গুলোতে কারাবন্দির সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়ার ফলেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে রাষ্ট্রকে। সুইডেন পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নাস্তিক-প্রধান দেশ (আমরা বইয়ের শেষ অধ্যায়ে এ নিয়ে আরো আলোচনা করব)। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রশ্ন হচ্ছে, রাষ্ট্র ধর্মহীন হলেই সেখানে অপরাধপ্রবণতা হু হু করে বাড়বে বলে যারা মনে করেন, তারা সুইডেনে অপরাধপ্রবনতার ক্রমশ নিম্নহারকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

প্রকাশ : ২২ নভেম্বর, ২০১৩ ১২:১০:০১

সুইডেনে কয়েদি না থাকায় কারাগার বন্ধ

অনলাইন ডেস্ক:

কয়েদির অভাবে কারাগার বন্ধ একথা কি বিশ্বাস করা যায়? হ্যাঁ যায় কারন সুইডেনের কারাগারগুলোতে এমন ঘটনাই ঘটেছে। কোন কয়েদি নাই তাদের কারাগারে।

এমন ঘটনা যদি আমাদের দেশে ঘটতো। তাহলে আমরা কত শান্তিতে বসবাস করতে পারতাম। থাকতো না কোন হিংসা-বিদ্বেষ। থাকতো না চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি। কাওকে গাড়ির মধ্যে জীবন্ত দগ্ধ হতে হতো না। কোন শিশুকে অকালে প্রাণ হারাতে হতো না। কোন বধুকে পুড়িয়ে মারা হতো না।

কিন্তু আমাদের দেশের প্রতিটি কারাগার ধারণ ক্ষমতার বাইরে। কারণ একটিই তা হলো অপরাধীর সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছেই। এমন কোন দিন নেই পত্রিকার পাতায় হত্যা, নির্যাতন, চুরি, ডাকাতির খবর পাওয়া যায় না।

কয়েক বছর ধরেই সুইডেনের কারাগারগুলোতে কয়েদির সংখ্যা কমছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে হঠাৎ করে এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্য রকম কমেছে। এ অবস্থায় বাড়তি কারাগার রাখা প্রয়োজন মনে করছে না সেদেশের সরকার। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু কারাগার বন্ধ করে দিয়েছেন।

উপরের পরিসংখ্যানগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে, মানুষ নাস্তিক হলেই ভালো হবে কিংবা আস্তিক হলেই খারাপ হবে, বরং এটাই বোঝানো যে, ধর্ম কোনোভাবেই নৈতিকতার 'মনোপলি ব্যবসা' দাবি করতে পারে না। আসলে কোনো

[135] Something Happy in the State of Denmark, Los Angeles Times, June 19, 2006.

বিশেষ ধর্মের আনুগত্যের উপর কিন্তু মানুষের নৈতিক চরিত্র-গঠন নির্ভর করে না, নির্ভর করে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আর সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। আসলে আধুনিক যুগের জীবন যাত্রার প্রেক্ষাপটে এ কথা বলা যায়, প্রাচীনকালের ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে নৈতিকতাকে বিশ্লেষণ করলে আর চলবে না, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান এবং বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রখ্যাত মনোবিদ, বিজ্ঞানের দার্শনিক এবং স্কেপটিক ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা ড. মাইকেল শারমার মানব সমাজে মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার অভিব্যক্তি নিয়ে আলাদা করে ভেবেছেন এবং এ নিয়ে লিখেছেন। তিনি তার 'দ্য সায়েন্স অফ গুড এন্ড এভিল' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন সমাজ বিকাশের প্রয়োজনেই মানুষ কিছু নীতিকে প্রথম থেকে 'গোল্ডেন রুল' হিসেবে গ্রহণ করেছিল[136] –

Do unto others, as you would have them do unto you.

(অন্যদের প্রতি সেরকম ব্যবহারই করো যা তুমি তাদের থেকে পেতে চাও)

কারণ এই নীতির অনুশীলন ছাড়া কোনো সমাজ ব্যবস্থা টিকে থাকবে না। মাইকেল শারমার তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, মানব বিবর্তনের ধারাতেই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আবার নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহনশীলতা, উদারতা, স্বার্থত্যাগ, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি গুণাবলীর চর্চা হয়েছে। সভ্যতার প্রতিনিয়ত সংঘাত ও সংঘর্ষেই গড়ে উঠেছে মানবীয় 'প্রোভিশনাল এথিক্স', যা মানুষকে প্রকৃতিতে টিকে থাকতে সহায়তা করেছে।

বিবর্তন ও নৈতিকতার উদ্ভব

একটা সময়ে ধর্মবাদীরা একচেটিয়াভাবে নৈতিকতার উৎসের জন্য ধর্ম এবং ঈশ্বরকে সাক্ষীগোপাল হিসেবে উপস্থাপন করতেন। তারা বহুকাল ধরেই নৈতিকতার পুরো ব্যাপারটাকে ঐশ্বরিক প্রলেপ লাগিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন এবং দাবি করেছেন (এবং এখনো অনেকে করেন) যে, জৈববৈজ্ঞানিকভাবে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের উদ্ভবের মতো ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করা যাবে না। এগুলোর কোনো জৈবিক ব্যাখ্যা নেই। এগুলোর ব্যাখ্যা একমাত্র ঈশ্বর। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয় নি মোটেই, বরং বিজ্ঞানীরা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে পরার্থতা কিংবা সহযোগিতার মতো ব্যাপারগুলো প্রাণীজগতে উদ্ভূত হয়েছে তার বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছেন। এমন কি ডারউইন নিজেও তার সময়ে জিনেটিক্সের কোনো জ্ঞান ছাড়াই কেবল জীবজগৎ পর্যবেক্ষণ করে সহযোগিতা এবং

---

[136] Michael Shermer, The Science of Good & Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule, Holt Paperbacks, 2004

পরার্থতার বিবর্তনীয় উপযোগিতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং চিন্তাবিদেরা বহুভাবে দেখিয়েছেন যে এই ডারউইনীয় পদ্ধতিতে প্রাকৃতিকভাবেই পরার্থপরায়নতা, সহযোগিতা, নৈতিকতা আর মূল্যবোধের মতো অভিব্যক্তিগুলো জীবজগতে উদ্ভূত হতে পারে, যা বিবর্তনের পথ ধরে মানব সমাজে এসে আরো বিবর্ধিত আর বিকশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে জীববিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক এবং বিবর্তনীয় উৎসের সন্ধান করে বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে[137]।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, নৈতিকতার ব্যাপারটি যে শুধু মানব সমাজেরই একচেটিয়া তা নয়, ছোট স্কেলে তথাকথিত অনেক 'ইতর প্রাণী' জগতের মধ্যেও কিন্তু এটি দেখা যায়। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়েরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য ভাগাভাগি করে, বানর এবং গরিলারা তাদের দলের কোনো সদস্য মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলে তাকে সহায়তা করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে, এমন কি 'দশে মিলে' কাজ করে তার জন্য খাবার পর্যন্ত নিয়ে আসে। ডলফিনেরা অসুস্থ অপর সহযাত্রীকে ধাক্কা দিয়ে সৈকতের দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে অসুস্থ ডলফিনটির পর্যাপ্ত আলো বাতাস পেতে সুবিধা হয়, তিমি মাছেরা তাদের দলের অপর কোনো আহত তিমি মাছকে দ্রুত সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। হাতিরা তাদের পরিবারের অসুস্থ বা আহত সদস্যকে বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। এ ধরণের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

বিবর্তন তত্ত্ব আমাদের খুব ভালোভাবেই দেখিয়েছে জিনগত স্তরে স্বার্থপরতা কিংবা প্রতিযোগিতা কাজ করলেও, জিনের এই স্বার্থপরতা থেকেই পরার্থতার মতো অভিব্যক্তির উদ্ভব ঘটতে পারে। এ ব্যাপারটি শিক্ষায়তনে গবেষণার মাধ্যমে

---

[137] সাম্প্রতিক সময়গুলোতে জীববিজ্ঞান, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বিবর্তনীয় উৎসের সন্ধান করে বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়ঃ

* Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1985
* Richard Alexander, The Biology of Moral Systems, Aldine Transaction, 1987
* Robert Wright, The Moral Animal: Why We Are, the Way We Are: The New Science of Evolutionary Psychology, Vintage, 1995
* Frans B. M. de Waal, Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals, Harvard University Press, 1997
* Larry Arnhart, Darwinian Natural Right: The Biological Ethics of Human Nature, State University of New York Press, 1998
* Leonard D. Katz, Evolutionary Origins of Morality: Cross-Disciplinary Perspectives; Imprint Academic, 2000
* Donald M. Broom, The Evolution of Morality and Religion, Cambridge University Press, 2004 ইত্যাদি

প্রথমবারের মতো তুলে ধরেন বিজ্ঞানী উইলিয়াম হ্যামিলটন। পরবর্তীতে ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স তার 'সেলফিশ জিন' বইয়ের মাধ্যমে[138]।

এই বইয়ের মাধ্যমেই আসলে জীববিজ্ঞানীরা সমাজ এবং জীবনকে ভিন্নভাবে দেখা শুরু করলেন। পরার্থতা, আত্মত্যাগ, দলগত নির্বাচনের মতো যে বিষয়গুলো আগে বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন না, সেগুলো আরো বলিষ্ঠভাবে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারলেন। শুধু মানুষ নয় অন্য যেকোনো প্রাণীর মধ্যেই সন্তানদের প্রতি অপত্য স্নেহ প্রদর্শন কিংবা সন্তানদের রক্ষা করার জন্য মা বাবারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। অর্থাৎ, নিজের দেহকে বিনষ্ট করে হলেও পরবর্তী জিনকে রক্ষা করে চলে। 'পরবর্তী জিন' রক্ষা না পেলে নিজের দেহ যত সুষম, সুন্দর, শক্তিশালী আর মনোহর কিংবা নাদুস-নুদুস হোক না কেন, বিবর্তনের দিক থেকে কোনো অভিযোজিত মূল্য নেই। সেজন্যই নেকড়ে যখন আক্রমণ করে, গোত্রের ছোট বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য বুনো মোষেরা বাচ্চাদের চারিদিকে ঘিরে শিং উঁচিয়ে নেকড়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে হলেও। এভাবেই জীব বিবর্তনের পথ ধরে তার জিন-বিস্তারে কিংবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষায় উদ্যোগী হয়, টিকে থাকার প্রয়োজনেই।

আসলে যার সাথে সে বেশি জিন বিনিময় করবে, যত ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে, তত বাড়বে নিজের জিন বিস্তারের সম্ভাবনা, সেজন্যই, সন্তানের প্রতি, পরিবারের প্রতি, নিকটাত্মীয়ের প্রতি এবং গোত্রের প্রতি এক ধরণের জৈবিক টান উপলব্ধি করে, এবং তাদেরকে রক্ষার চেষ্টা করে।

বিজ্ঞানীরা আরো দেখেছেন, স্বার্থপর জিন যেমন আত্মত্যাগ কিংবা পরার্থতা তৈরি করে, ঠিক তেমনি আবার প্রতিযোগিতামূলক জীবন সংগ্রাম থেকেই জীবজগতে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরণের পারস্পরিক সহযোগিতা, মিথোজীবিতা কিংবা সহ-বিবর্তন। টিকে থাকার প্রয়োজনেই কিন্তু এগুলো ঘটে। শিকারী মাছদের থেকে বাঁচার জন্য ক্লাউন মাছদের সাথে এনিমোনের সহবিবর্তন, হামিং বার্ডের সাথে অর্নিথোপথিলাস ফুলের সহবিবর্তন, এংরাকোয়িড অর্কিডের সাথে আফ্রিকান মথের সহবিবর্তন এগুলোর প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রকৃতিতেই আছে।

---

[138] Richard Dawkins, The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press. 1976.

চিত্র : ক্লাউন মাছ আর এনিমোনের সহবিবর্তন-প্রকৃতিতে এরকম সহযোগিতার উদাহরণ আছে বহু।

কোনো শিকারী পাখি যখন কোনো ছোট পাখিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করে, তখন অনেক সময় দেখা যায় যে, গোত্রের অন্য পাখি চিৎকার করে ডেকে উঠে তাকে সতর্ক করে দেয়। এর ফলে সেই শিকারী পাখি আর তার আদি লক্ষ্যকে তাড়া না করে ওই চিৎকার করা পাখিটিকে আক্রমণ শুরু করে। এই ধরণের পরার্থতা এবং আত্মত্যাগ কিন্তু প্রকৃতিতে খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়। এই ব্যাপারগুলো বিবর্তনের কারণেই উদ্ভূত হয়েছে। মুক্তমনায় সম্প্রতি 'বিবর্তন ও নৈতিকতার উদ্ভব' শিরোনামে দুই পর্বের একটি লেখা লিখেছিলাম (লেখাটি ২০১১ সালে শুদ্ধস্বর থেকে প্রকাশিত 'ভালবাসা কারে কয়?' বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে)[139]। সেই প্রবন্ধটিতে বাংলায় প্রথমবারের মতো মেনার্ড স্মিথসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গাণিতিক মডেলের উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে, শুধু প্রতিযোগিতা কিংবা বিবাদ করে জিনপুলকে সর্বোচ্চ দক্ষতায় বাঁচিয়ে রাখা যায় না, সাথে আনতে হয় সহযোগিতা এবং পরার্থতার কৌশলও। কাজেই ঈশ্বর কিংবা কোনো বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, এই মুহূর্তে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের উদ্ভবকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে বিবর্তন তত্ত্ব।

নৈতিকতার জন্য ধর্মের কি আর কোনো প্রয়োজন আছে?

একটা সময় হয়তো ধর্মীয় নৈতিক বিধানগুলোর একটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিল সমাজের উপর। নানা ধরণের ধর্মীয় বিধানই ছিল সে সময়কার আইন, ওগুলোই ছিল সুনীতিবোধ গড়ে তোলার ভিত্তিভূমি। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগামীতার সাথে সাথে ধর্মীয় প্রয়োজনিয়তা

---

139 অভিজিৎ রায়, বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব (১ম এবং ২য় পর্ব), অক্টোবর ২১, ২০১০, মুক্তমনা।

ফুরিয়ে যাচ্ছে, অনেক আগেই ফুরিয়েছে ধর্মপ্রবর্তকদের ভূমিকাও। আজ আধুনিক মননের অধিকারী মানুষের কাছে প্রাচীন উপাসনা ধর্মগুলো একেবারেই অপাংক্তেয় হয়ে উঠেছে। কেউই আজ বিশ্বাস করে না তন্ত্র-মন্ত্রে অসুখ সারে, কিংবা 'আল্লাহ মেঘ দে পানি দে' বলে ডাকলেই বৃষ্টি ঝরে। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতেও আজ ধর্মগুরু, নবী কিংবা পয়গম্বরদের 'মহান মিথ্যার' চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ, আইনের শাসন আর সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অনেক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। ধর্মকেন্দ্রিক নৈতিকতার বিষয়গুলো অগ্রণী চিন্তার মানুষদের কাছে গুরুত্বহীন, তাদের মতো ধর্মমুক্ত মানুষেরাই হয়তো আগামীর পরিবর্তিত বিশ্বে নির্ধারণ করবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের এক নতুন সংজ্ঞা। শেষ করি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'আফিম তবুও ভালো, ধর্ম সে তো হেমলক বিষ' কবিতাটি থেকে কিছু চরণ উদ্ধৃত করে –

একদার অন্ধকারে ধর্ম এনে দিয়েছিল আলো,
আজ তার কংকালের হাড় আর পচা মাংসগুলো
ফেরি করে ফেরে কিছু স্বার্থান্বেষী ফাউল মানুষ –
সৃষ্টির অজানা অংশ পূর্ণ করে গালগল্প দিয়ে।
আফিম তবুও ভালো, ধর্ম সে তো হেমলক বিষ।

ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ, ঘৃণ্য চতুরতা,
মানুষের পৃথিবীকে শত খণ্ডে বিভক্ত করেছে
তারা টিকিয়ে রেখেছে শ্রেণিভেদ ঈশ্বরের নামে।
ঈশ্বরের নামে তারা অনাচার করেছে জায়েজ।

ইহকাল ভুলে যারা পরকালে মত্ত হয়ে আছে
চলে যাক সব পরপারে বেহেস্তে তাদের
আমরা থাকবো এই পৃথিবীর মাটি জলে নীলে,
দ্বন্দ্বময় সভ্যতার গতিশীল স্রোতের ধারায়
আগামীর স্বপ্নে মুগ্ধ বুনে যাবো সমতার বীজ।

ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য়

নারী : ধর্ম-ভাইরাসের প্রধানতম শিকার

২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি ঘটনা। সৌদি আরবের এক হতভাগ্য নারী তার এক স্কুল-বন্ধুর কাছে থেকে একটি ছবি আনতে গিয়ে সেই বন্ধু আর তার ৬ জন সাঙ্গপাঙ্গদের দ্বারা ধর্ষিত হন। এ ধরণের কোন ঘটনায় ধরে নেয়া হয় যে, ধর্ষণকারীর শাস্তি হবে। অন্তত ধর্ষিতাকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় আইন হতভাগ্য মেয়েটির পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু বিধি বাম। সৌদি আইনে (যার মূল ভিত্তি হচ্ছে ইসলামের শরিয়া), হতভাগ্য নারীটিই উল্টে বিচারের রায়ে দুশোটি বেতের আঘাত পেয়েছেন[140]।

News › Politics › Republican

Rape victim sentenced 200 lashes by Saudi court

See also **Government Topics** / International Affairs / Saudi Arabia / Sharia Law / Lashes / Rape Victims

Wikimedia-Commons

Timothy Whiteman | Wilmington Conservative Examiner

✔ Subscribe Follow

Advertisement

September 24, 2013

"The victim's sentence was increased because her lawyer had spoken out..."

When the defense attorney for a raped Saudi Arabian woman appealed a Sharia Court decision that the 90-lash sentence against his client was unjust, all that was succeeded was the more than doubling of the punishment meted out to the woman who was raped and beaten by seven men, as reported by the women's rights-centered news portal **The Clarion Project** on Sept. 22, 2013.

চিত্র : সৌদি আরবে ধর্ষণকারীর বদলে ধর্ষিতাকেই বেত্রাঘাত করার হয়।

---

[140] Rape victim sentenced 200 lashes by Saudi court, examiner.com, September 24, 2013

ব্যাপারটা হয়তো অনেককেই অবাক করবে। কিন্তু যারা ধর্মের আইনকানুনগুলো জানেন, তাদের অবাক করেনা। ইসলামী আইনে ধর্ষণ প্রমাণ করার জন্য চার জন 'পুরুষ' চাক্ষুষ সাক্ষীর বিধান রয়েছে। কোরআনের সুরা নিসায় (৪:১৫) বর্ণিত আছে –

> 'তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা (ব্যভিচারের) দুষ্কর্ম নিয়ে আসবে, তাদের (বিচারের) ওপর তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে চারজন সাক্ষী যোগাড় করবে, অতঃপর **সে চারজন লোক যদি ইতিবাচক সাক্ষ্য প্রদান করে** তাহলে সে নারীদের তোমরা ঘরের ভেতর অবরুদ্ধ করে রাখবে, যতদিন না, মৃত্যু এসে তাদের সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়, অথবা আল্লাহতায়ালা তাদের জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা না করেন।'

আর সাক্ষীরা যদি নারী হন তাহলে একজন পুরুষ সাক্ষীর পরিবর্তে দুই জন মহিলা সাক্ষী নেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন পরীক্ষার (যেমন ডিএনএ কিংবা অন্যান্য মেডিকেল টেস্ট ইত্যাদি) কোন স্থান শরিয়া আইনে নেই।

সাক্ষী হিসেবে যে একজন পুরুষ সমান দুজন নারী তা কোরআনে (সুরা বাকারা, ২:২৮২) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে –

> 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না| আল্লাহ্ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে| অত:পর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। **দুজন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা** ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়...'।

এখানে লক্ষণীয় যে, এ ধরণের সাক্ষী সাবুদের ক্ষেত্রে দুজন পুরুষ সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। দুজন পুরুষ না পাওয়া না গেলে মহিলাদের দিয়ে কাজ চলতে পারে, তবে একজন পুরুষের বদলে সেক্ষেত্রে দুজন নারীর সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে। পুরুষ ছাড়া কেবল 'মহিলাদের সাক্ষী' কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সাথে অন্তত একজন পুরুষ থাকতেই হবে। যারা কোরআনের মধ্যে সব সময় নারী-পুরুষের সাম্য খুঁজে পান, যারা বৈষম্যের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন, তারা এর কী জবাব দেবেন? গবেষকেরা বলেন, নারীরা চিন্তায় চেতনায় পুরুষদের থেকে হীন, তাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তাদের বিচার বুদ্ধি কম, তারা ঠিকমত সাক্ষ্য দিতে পারবে না এই ভাবনা থেকেই মূলত –

দুজন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সমতুল্য করা হয়েছে[141]।

এখন বোধ হয় পাঠকেরা বুঝতে পারছেন, সৌদি আরবে ধর্ষিতার শাস্তি হওয়ার মূল কারণ; তিনি অভিযোগ উত্থাপনের মাধ্যমে আসলে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেন যে তিনি 'বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কে' জড়িত ছিলেন। ইসলামি আইনে 'জেনা' হলো, ব্যভিচার, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনমিলন, ধর্ষণ ও পতিতাবৃত্তি। এ পর্যায়ে উল্লেখিত সাক্ষী যোগাড় করে ধর্ষণ প্রমাণ করতে না পারলে সাধারণত নারীটিকেই 'জেনা'র দায়ে শাস্তি দেয়া হয়। এটাই ইসলামী আইন।

অনেকে বলেন, সৌদি আরবের এই ঘটনায় শাস্তি বরং কমই দেয়া হয়েছে। ক' বছর আগে সোমালিয়ার একটা ঘটনার কথা পড়েছিলাম, সেখানে এ ধরণের ধর্ষণের ঘটনায় ১৩ বছরের একটা মেয়েকে পাথর ছুড়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল[142]। ইসলামী আইন মোতাবেকই এই শাস্তি কার্যকর হয়েছিল। হাদিস থেকে দেখা যায়, নবী মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর জীবদ্দশায় 'রজম' (পাথর মেরে হত্যা) নামক অমানবিক-নৃশংস শরিয়ার আইনটির দ্বারা বহু ব্যভিচারী নরনারীকে পাথর মেরে হত্যা করেছিলেন। একটি হাদিসের উদাহরণ দেয়া যাক[143]:

হজরত আস্ শাবানী থেকে বর্ণীত – 'আমি আব্দুল্লাহ বিন আবু আউফকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহর রাসুল কি 'রজম' বিধান (পাথর মেরে হত্যা) কারো উপর প্রয়োগ করেছিলেন'? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সুরা 'নুর' নাজিল হওয়ার আগে না পরে। তিনি বললেন, তা জানিনা'।

হজরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল্ আনসারী বর্ণনা করছেন – 'বনি আসলাম গোত্রের একজন বিবাহিত লোক এসে নবীজীর কাছে চারবার বলল যে সে একজন নারীর সাথে অবৈধ সঙ্গম করেছে। নবীজী তাকে পাথর মেরে হত্যার আদেশ দিলেন, যেহেতু সে বিবাহিত ছিল। পাথর মারায় আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম। মুসালা'য় তাকে পাথর মারা শুরু হলো। পাথরের আঘাত সহ্য করতে না পেরে লোকটি দৌড়ে পালাতে থাকলো, আমরা তাকে দৌড়ায়ে আল্ হারা'য় ধরে ফেললাম এবং সেখানেই তাকে পাথর মেরে হত্যা করলাম'। (সহি বোখারী শরিফ, ভলিউম ৮, বুক ৮২, নম্বর ৮০৫)।

এ সংক্রান্ত আরো কিছু হাদিস দেখা যাক। যেমন, সহি বুখারী ৪/৫৬/৮২৯:

'আব্দুল্লাহ বিন উমর বর্ণিত: ইহুদিরা আল্লাহর রসুলের কাছে এসে জানায় যে, তাদের এক পুরুষ ও নারী অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়েছে। নবী তাদেরকে বলেন, "তাউরাতে পাথর ছুড়ে হত্যা সম্পর্কে কী আইনি শাস্তির বিধান রয়েছে?" তারা জবাব

[141] নন্দিনী হোসেন, পুরুষ রচিত ধর্মে বিকলাঙ্গ নারী, মুক্তমনা।

[142] Stoning victim 'begged for mercy', BBC News, 4 November 2008

[143] সহি বোখারী: ভলিউম ৮, বুক ৮২, নম্বর ৮০৪

দেয়, "আমরা শুধুই তাদের অপরাধ ঘোষণা করি এবং তাদেরকে চাবুক মারি।" আব্দুল্লাহ বিন সালাম বললেন, "তোমরা মিথ্যে বলছো; তাউরাতে পাথর ছুড়ে হত্যার বিধান রয়েছে।" তারা তাউরাত আনল এবং তাদের একজন পাথর ছুড়ে হত্যার আয়াতটিকে হাত দিয়ে আড়াল করে তার আগের ও পরের আয়াতটি পড়ল। আব্দুল্লাহ বিন সালাম তাকে বললেন, "তোমার হাত সরিয়ে নাও।" সে হাত সরিয়ে নিলে দেখা গেল সেখানে পাথর ছুড়ে হত্যার আয়াতটি লিখা আছে। তখন তারা বলল, "মুহাম্মদ সত্য বলেছে; তাউরাতে পাথর ছুড়ে হত্যার আয়াত আছে।" নবী তখন নির্দেশ দিলেন যে, তাদের উভয়কে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হোক। আব্দুল্লাহ বিন উমর বলেন, "আমি দেখলাম পুরুষটি মহিলার উপর ঝুকে পড়ে তাকে পাথর থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছে।"

কিংবা সহিহ মুসলিম ১৭/৪২০৭:

'ইমরান বিন হুসেন জানান যে, জুহাইনা সম্প্রদায় থেকে এক মহিলা আল্লাহর নবীর কাছে এসে বলে যে, সে ব্যভিচারের মাধ্যমে অন্তঃসত্তা হয়ে পড়েছে। সে বলে, "আল্লাহর রাসুল, আমি এক অপরাধ করেছি যার শাস্তি আমাকে ভোগ করতে হবে, সুতরাং আমাকে সে শাস্তি দিন।" আল্লাহর রাসুল তার মালিককে ডেকে বললেন, "সন্তানের প্রসব পর্যন্ত ওকে ভালমত দেখাশুনা করিও; তারপর আমার কাছে নিয়ে এসো।" সে নবীর নির্দেশ মুতাবেক কাজ করল। তারপর আল্লাহর রাসুল তার সম্পর্কে শাস্তি ঘোষণা করলেন। এবং মহিলার কাপড় দিয়ে তাকে বেধে নবীর নির্দেশ মোতাবেক পাথর ছুড়ে হত্যা করা হলো'।

সোমালিয়ার ঐ ঘটনা ইসলামী আইন কানুন মেনেই হয়েছিল, বলাই বাহুল্য[144]।

---

[144] মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোরআনের কোথাও ব্যভিচারীদেরকে পাথর ছুড়ে হত্যার বিধান সম্বলিত কোন আয়াত নেই। কেন নেই, এ প্রসঙ্গে উপাখ্যান হচ্ছে : আল্লাহ ব্যভিচারীদের শাস্তির ব্যাপারে 'পাথর ছোড়া' সংক্রান্ত আয়াত নামে এক পৃথক আয়াত নাজিল করেছিলেন, কিন্তু খলিফা আবু বকরের অধীনে কোরআ্নের সংকলন শুরু হওয়ার আগে আয়াতটি কোন কারণে হারিয়ে যায়। এ ব্যাপারে হাদিস সংগ্রহকারী ইসলামী পণ্ডিত ইবনে মাজাহ জানান, আল্লাহ ব্যভিচারীদেরকে পাথর ছুড়ে হত্যার বিধান সম্বলিত এক আয়াত নাজিল করেছিলেন এবং নবী মুহাম্মদ আয়াতটিকে তাঁর স্ত্রী আয়েশার হেফাজতে রেখেছিলেন, কিন্তু আয়েশার অসতর্কতার কারণে এক ছাগল এসে নাকি আয়াতটি খেয়ে ফেলে। এ সংক্রান্ত হাদিসটি হলো:

'আয়শা বর্ণিত: পাথর ছুড়ে হত্যার এবং প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষদেরকে স্তনের দুধ খাওয়ানোর আয়াত নাজিল হয়েছিল এবং একটা টুকরো কাগজে লিখে আমার বালিশের নীচে রাখা হয়েছিল। আল্লাহর নবী যখন মারা যান, তখন আমরা তাঁকে নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং তখন একটা ছাগল ঘরে ঢুকে কাগজটি খেয়ে ফেলে'। (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস ১৯৪৪)

নবীর প্রথম জীবনীকার ইবনে ইসহাক (দ্য লাইফ অব মুহম্মদ, পৃঃ ৬৮৪) সে আয়াতটি সম্পর্কে লিখেছেন:

ক'দিন আগে দুবাইয়ের আরেকটা ঘটনা পড়েছিলাম – নরওয়ের এক স্থপতি নারী ধর্ষণের অভিযোগ করার পর শরিয়া নিয়মে উপযুক্ত সংখ্যক চাক্ষুষ সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করতে না পারার কারণে (ডিএনএ রিপোর্ট, মেডিকেল রিপোর্ট সব কিছু থাকা সত্ত্বেও) উল্টে তাকেই ১৬ মাসের জেল দেয়া হয়, যদিও আন্তর্জাতিক চাপে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পান তিনি[145]।

এ ধরণের ঘটনা আছে বহু। নারীকে প্রাপ্য মর্যাদা তো দূরে থাকুক, সামান্য অধিকারটাও দেয়া হয়নি। বরং অন্যের অপরাধে দেয়া হয়েছে শাস্তি। সুরা নাহল – আয়াত ৪৩ (১৬:৪৩), সুরা হজ্ব আয়াত ৭৫ (২২:৭৫) এ আল্লাহ স্পষ্ট করেই বলেছেন–

'নারীকে কোনদিন নবী-রসুল করা হবে না।'

সুরা ইউসুফ, আয়াত ১০৯ (১২:১০৯) -এও একই বক্তব্য:

'আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রসুল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল জনপদবাসীদের মধ্য থেকে, আমি তাঁদের কাছে ওহী প্রেরণ করতাম।'

এ ধরণের অনেক হাদিসের কথাই আমরা জানি। এগুলো পড়লে একটা শিশুও বুঝবে যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে নারী এবং পুরুষ মোটেই সমান নয়। ইসলাম আসলে ভয়াবহভাবেই পুরুষতান্ত্রিক এবং নারী-বিদ্বেষী[146]। হযরত মোহাম্মদ নিজেই বহুবার বলেছেন, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমি পুরুষের জন্য মেয়েদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর ফিতনা ও বিপর্যয় রেখে যাইনি।'' (বোখারী ও মুসলিম)

নারীর উৎপত্তি হয়েছে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে – বাইবেলের এই মিথকে বুকে ধারণ করে নবী বিধান দিয়েছেন[147]:

'নারীদের প্রতি বন্ধুত্বমূলক আচরণ করো কারণ তাদেরকে বুকের হাড় থেকে তৈরি করা হয়েছে, বুকের বাঁকা হাড়, যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তবে তা ভেঙে যাবে; আর যদি তুমি কিছুই না করো, তবে সে বাঁকাই থেকে যাবে'।

ইসলামী পণ্ডিতেরা এক্ষেত্রে 'বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের' কথায় জোর দিলেও মূলত বাঁকা

'আল্লাহ মুহাম্মদকে প্রেরণ করেন এবং তাঁর কাছে আসমানী কিতাব পাঠান। আল্লাহর প্রেরিত বাণীর অংশ ছিল পাথর ছুড়ে হত্যার আয়াত। ওমর বলতেন, ''আমরা তা পড়েছি, আমাদেরকে তা শেখানো হয়েছিল, এবং আমরা তা শুনেছি। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ পাথর ছুড়ে হত্যা করেছেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পর আমরা পাথর ছুড়ে হত্যা করেছি'।

[145] Dubai ruler pardons Norwegian woman convicted after she reported rape, CNN, Mon July 22, 2013

[146] Ibn Warraq, Islam's Shame: 'Lifting The Veil of Tears', Free Inquiry, vol 17 issue 4

[147] সহি বোখারী: ভলিউম-৭, বুক নং-৬২, হাদিস নং-১১৩; সহি বোখারী: ভলিউম-৭, বুক নং-৬২, হাদিস নং-১১৪; সহি বোখারী: ভলিউম-৪, বুক নং-৫৫, হাদিস নং-৫৪৮; সহি মুসলিম ৮: ৩৪৬৬।

হাড় থেকে সৃষ্ট হবার কারণে নারীরা স্বভাবেও বাঁকা – এটাই হাদিসটির মূল সুর।

কোরআনে মেয়েদের সংজ্ঞায়িতই করা হয়েছে শস্যক্ষেত্র হিসেবে – 'তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্যে (সন্তান উৎপাদনের) ফসলক্ষেত্র, তোমরা তোমাদের এই ফসলক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই গমন করো ...' (সূরা আল বাকারা, ২:২২৩)। আর স্বামী বিছানায় ডাকার সাথে সাথে নারীকে সাড়া দিতে হবে, এর উল্লেখ করে নবী বলেন –

'স্বামী তাহার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় আসিবার জন্য ডাকিলে যদি স্ত্রী স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয় (এবং স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়) তবে ভোর পর্যন্ত সারা রাত্র ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর প্রতি লানৎ ও অভিশাপ করিতে থাকেন।'' (বোখারী ও মুসলিম)।

দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে স্বামী রাত্রে ঘরে ফিরলে স্ত্রী যেন তার যৌনকেশ উত্তমরূপে শেভ করে রাখে বলে বিধান দিয়েছেন নবী[148]:

নবী বলেছেন – "যদি তুমি রাত্রিতে (তোমার শহরে) প্রবেশ কর (দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে), সাথে সাথে গৃহে প্রবেশ করো না যে পর্যন্ত না প্রবাসী ব্যক্তির স্ত্রী তার যৌনকেশ শেভ করে এবং আলুলায়িত কুন্তলা তার কেশগুলিকে ভালভাবে বিন্যস্ত করে।"

বিভিন্ন হাদিসে আরো বলা আছে একজন স্ত্রী যদি উটের পিঠে কিংবা রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে, তারপরেও স্বামীর যৌনচাহিদার প্রতি সে অবজ্ঞা করতে পারবে না –

"যদি কোন ব্যক্তি সঙ্গমের ইচ্ছায় নিজের স্ত্রীকে আহ্বান করে, তবে সে যেন তাহার নিকট উপস্থিত হয়, যদিও সে উনুনের উপর (রন্ধন কার্যে ব্যাপৃত) থাকে" (তিরমিজী)

আরো বলা আছে, যেসব বিষয়ের মধ্যে খারাপ ও শয়তানি জিনিস লুকিয়ে থাকে তা হলো: বাড়ি, নারী ও ঘোড়া[149]। নবী এও বলেছেন সেই ব্যক্তি কোনোদিন উন্নতির মুখ দেখবে না যে নারীর কাছে তার গোপন কথাগুলো বলে, কিংবা সেই জাতি কখনো উন্নতি করবে না যে জাতি নারীকে নেত্রী হিসেবে গ্রহণ করে[150]। স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে[151], 'যদি কুষ্ঠরোগে আপনার স্বামীর দেহ পচে ফেটে যায়,রক্ত ও পুঁজ সেখান

---

[148] সহি বোখারী: ভলিউম-৭, বুক নং-৬২, হাদিস নং-১৭৩: জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত।

[149] সহি বোখারী: ভলিউম-৪, বুক নং-৫২, হাদিস নং-১১০; সহি বোখারী: ভলিউম-৪, বুক নং-৫২, হাদিস নং-১১১

[150] সহি বোখারী: ভলিউম-৯, বুক নং-৮৮, হাদিস নং-২১৯। হাদিসটি বোখারীর যে কোন বাংলা অনুবাদে পাওয়া যাবে, হাফেজ মোঃ আবদুল জলিলের ৯০ পৃষ্ঠার ২২২ নম্বরে আছে, শাইখুল হাদিস আজিজুল হক সাহেবের বোখারীর চতুর্থ খণ্ডের ২২৬ পৃষ্ঠাতেও আছে।

[151] মুসনাদে আহমদ,সীরাত ইবনে হিশাম,সীরায়ে আনসার দ্রঃ। আরো দেখুন, কোরআনের ৪:৩৪

থেকে পড়তে থাকে আর আপনি তাতে মুখ লাগিয়ে চুষে চুষে নেন,তবুও স্বামীর হক পুরোপুরি আদায় হবে না'।

কিন্তু স্বামীদের জন্য এতকিছু করার পরও মৃত্যুর পর নারীদের অধিকাংশই যে দোজখের আগুনে পুড়বে, সেটা উল্লেখ করতেও ভোলেননি নবীজি:

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন দোযখ পরিদর্শন-কালে আমি দোযখের দ্বারে দাঁড়াইলাম এবং জানিতে পারিলাম যে, দোযখীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে'। (বোখারী শরিফ, ২১১)

সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে যেমন নারী-পুরুষে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি করা হয়েছে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও। সুরা নিসা অনুযায়ী উত্তরাধিকার সূত্রে বাবা-মার কাছ থেকে একজন পুরুষ সন্তান যা পাবে, মেয়ে সন্তান পাবে তার অর্ধেক। কোরআনে (৪:১১) আছে,

'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন: একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অত:পর যদি শুধু নারীই হয় দু-এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অত:পর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যেতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।'

বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইনেও (১৯৬১) বলা আছে, একটি মেয়ে পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে যা পাবে তা একটি ছেলের অর্ধেক। বোঝাই যায় কোরআন এবং সুন্নার আলোকে আইন করা হয়েছে বলেই এই বৈষম্য।

অনেক 'মুসলিম স্কলার' আছেন, যারা বলতে চান, মেয়ে বড় হয়ে যেহেতু স্বামীর সম্পত্তি পায়, তাই পিতার সম্পত্তি তাকে কম দেওয়া হয়েছে। এগুলো আসলে ছেলে ভুলানো ছড়া। নন্দিনী হোসেন তার 'পুরুষ রচিত ধর্মে বিকলাঙ্গ নারী' প্রবন্ধে এই যুক্তি খণ্ডন করে বলেন[152] –

'আধুনিক বিশ্বে বহু নারী উপার্জনক্ষম। অনেকেই স্বামীদের থেকেও বেশী রোজগার

আয়াত সম্বন্ধে জালালুদ্দিন সুতির মন্তব্য।

[152] নন্দিনী হোসেন, পুরুষ রচিত ধর্মে বিকলাঙ্গ নারী, মুক্তমনা।

করেন, তাদের অনেককেই স্বামীর উপার্জনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হয় না। মেয়েদের অনেকেই আজ বহুজাতিক কোম্পানির সিইও, এমনকি রাষ্ট্রক্ষমতার-ও শীর্ষে ছিলেন, কিংবা এখনো আছেন। এদের কাছে ওই আয়াতগুলো বোকা বোকাই লাগবে। আর তা ছাড়া এমন অনেক নারীই আছেন যারা বিয়েই করেননি, কিংবা করবেন না। মেয়েদের বড় হয়ে 'স্বামী' থাকতেই হবে – এটা কি ধ্রুব সত্য নাকি?'

অনেকেরই হয়তো মনে আছে আওয়ামীলীগ সরকার ২০১১ সালের এপ্রিলের দিকে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কী বিপদেই না পড়েছিল। উত্তরাধিকার সম্পদে নারী-পুরুষের সমান অধিকার চলে আসবে ভেবে হুঙ্কার দিয়ে রাস্তায় নেমেছিল মুফতি ফজলুল হক আমিনীরা। ইসলাম বিপন্ন ভেবে রাস্তাঘাট বন্ধ করে অবরোধ করে একাকার করে ফেলেছিল। আমিনীর রণ-হুংকার শুনে – হাসিনা, মতিয়া থেকে শুরু করে আওয়ামী মন্ত্রী-মিনিস্টার সবাই সমস্বরে জানান দিতে থাকেন, এই নারী-নীতির সাথে নাকি কোরআন-সুন্নাহর কোন বিরোধ নাই। ইসলামিস্টদের চাপে বাতিল হয়ে গেল উত্তরাধিকার সম্পদে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্ন।

আরেক আলেম হেফাজতে ইসলামের আমীর আল্লামা শাহ আহমেদ শফী মেয়েদের তেঁতুলের সাথে তুলনা করে পত্রপত্রিকায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। তার ওয়াজে তিনি বলেছেন,

'মেয়েরা তেঁতুলের মত, কখনো কখনো তেঁতুলের থেকেও বেশী খারাপ! তাদের দেখলে ছেলেদের মুখ থেকে লালা বের হয়,ছেলেদের দিলের মধ্যে লালা বের হয় এবং যাকেই ছেলেরা দেখে তাকেই বিয়ে করতে ইচ্ছা হয়, লাভ ম্যারেজ করতে ইচ্ছা হয়'!

কেবল ইসলাম ধর্মে নয়, সকল ধর্মেই মূলত কম বেশি একই অবস্থা। হিন্দু ধর্মের প্রসঙ্গে আসা যাক। হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থ বেদ। এজন্য অনেকে হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম হিসেবেও অভিহিত করে থাকেন। হিন্দুধর্মের বেদ চারটি; যথা ঋগ্বেদ, সামবেদ, অথর্ব বেদ ও যজুর্বেদ। এই যজুর্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—একটি হচ্ছে কৃষ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তরীয় সংহিতা অন্যটি শুক্লযজুর্বেদ; এই শুক্লযজুর্বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত, একটি শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ। শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে নারীকে তুলনা করা হয়েছে এভাবে, "সে ব্যক্তিই ভাগ্যবান, যার পশু সংখ্যা স্ত্রীর সংখ্যার চেয়ে বেশি" (২/৩/২/৮)। পরের আরেকটি শ্লোকে পাওয়া যায় হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান; "বজ্র বা লাঠি দিয়ে নারীকে দুর্বল করা উচিৎ, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার না থাকতে পারে" (৪/৪/২/১৩)। এর থেকে স্পষ্ট কোনো বক্তব্যের আর প্রয়োজন আছে?[153] বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য

[153] অনন্ত বিজয় দাশ, 'সনাতন ধর্মে'র দৃষ্টিতে নারী, বিজ্ঞান ও ধর্ম সংঘাত নাকি সমন্বয়; মুক্তমনা ই-বুক।

বলেন, "স্ত্রী স্বামীর সম্ভোগ কামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে 'কিনবার' চেষ্টা করবে, তাতেও অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে" (৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪)। দেবীভাগবত-এ নারীর চরিত্র সম্পর্কে বলা আছে (৯:১): "নারীরা জোঁকের মত, সতত পুরুষের রক্তপান করে থাকে। মূর্খ পুরুষ তা বুঝতে পারে না, কেননা তারা নারীর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়ে"। নারীদের সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছে চরম অবমাননাকর কিছু শ্লোক মনুসংহিতায়। কিছুদিন আগে রণদীপ বসু মুক্তমনা ব্লগে সিরিজ আকারে লিখেছিলেন, 'অস্পৃশ্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং একজন বাবাসাহেব' নামের আট পর্বের একটি সিরিজ[154]। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন,

'পৃথিবীতে যতগুলো কথিত ধর্মগ্রন্থ রয়েছে তার মধ্যে মনে হয় অন্যতম বর্বর, নীতিহীন, শঠতা আর অমানবিক প্রতারণায় পরিপূর্ণ গ্রন্থটির নাম হচ্ছে হিন্দুদের 'মনুস্মৃতি' বা 'মনুসংহিতা'।

কথাটি মিথ্যে নয়। মনুর দৃষ্টিতে নারী স্বভাব-ব্যভিচারিণী, কামপরায়ণা; কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কুটিলতা ইত্যাদি যত খারাপ দোষ আছে, সবই নারীর বৈশিষ্ট্য, এগুলো দিয়েই নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে[155]! যেমন, মনুসংহিতার একটি শ্লোকে (২: ২১৩) বলা হয়েছে –

স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ্ দূষণম্।
অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ।।

অর্থাৎ, ইহলোকে (শৃঙ্গার চেষ্টার দ্বারা মোহিত করে) পুরুষদের দূষিত করাই নারীদের স্বভাব; এই কারণে পণ্ডিতেরা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কখনোই অনবধান হন না।

আরো বলা হয়েছে –

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা না বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।। (২:২১৫)

অর্থাৎ, মাতা, ভগিনী বা কন্যার সাথে কোনও পুরুষ নির্জন গৃহাদিতে বাস করবে না, কারণ এদের চিত্ত এতোই চঞ্চল যে, এরা বিদ্বান ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে কামের বশবর্তী করে তোলে।

মনু সংহিতা মতে, নারীর কর্তব্য গৃহকর্ম এবং সন্তান উৎপাদন (৯:২৬)। সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্যই নারী এবং সন্তান উৎপাদনার্থে পুরুষ সৃষ্টি হয়েছে (৯:৯৬)। নারী মন্ত্রহীন, অশুভ (৯:১৮), নারীদের জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত-অমন্ত্রক (২:৬৬); কন্যা, যুবতী, রোগাদি পীড়িত ব্যক্তির হোম নিষিদ্ধ এবং তা করলে তারা নরকে পতিত

[154] রণদীপম বসু, অস্পৃশ্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং একজন বাবাসাহেব, পর্ব, ০১-০৮: মুক্তমনা

[155] অনন্ত বিজয় দাশ, 'সনাতন ধর্মে'র দৃষ্টিতে নারী, বিজ্ঞান ও ধর্ম সংঘাত নাকি সমন্বয়; মুক্তমনা ই-বুক।

হয় (১১:৩৭)! স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে –

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ
উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥ (৫:১৫৪)

বাংলা করলে দাঁড়ায়, স্বামী দুশ্চরিত্র, কামুক বা নির্গুণ হলেও তিনি সাধ্বী স্ত্রী কর্তৃক সর্বদা দেবতার ন্যায় সেব্য।

কোনো নারী (স্ত্রী) যদি স্বামীকে অবহেলা করে, ব্যভিচারিণী হলে সংসারে তো নিন্দিত হবেই সেই সাথে যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগেও আক্রান্ত হবে; শুধু তাই নয় পরজন্মে শৃগালের গর্ভে জন্ম নিবে সেই নারী (৫:১৬৩ –১৬৪); শুধু স্বামীর সেবার মাধ্যমেই নারী স্বর্গে যাবে (৫:১৫৫)। সাধ্বী নারী কখনো জীবিত অথবা মৃত স্বামীর অপ্রিয় কিছু করবেন না (৫:১৫৬)। স্বামী মারা গেলে স্ত্রী সারা জীবন ফলমূল খেয়ে দেহ ক্ষয় করবেন, কিন্তু অন্য পুরুষের নামোচ্চারণ করবেন না (৫:১৫৭)। অথচ স্ত্রী মারা গেলে দাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করেই স্বামী আবার দার পরিগ্রহ করবেন (৫:১৬৮)।

আমাদের চারপাশের প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে বৌদ্ধধর্মকে অপেক্ষাকৃত উদার, অহিংস এবং প্রগতিশীল বলে মনে করা হয়। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্র নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করলে নারীদের সম্পর্কে যে ধারণা আমরা পাই, তাকে আর যাহোক প্রগতিশীল বলার কোন উপায় নেই। এত জ্ঞানবান, এত দয়াবান, অহিংসার প্রচারক বলে বুদ্ধকে প্রচার করা হয়েছে, তিনি তার সঙ্ঘে কোন নারী ভিক্ষু রাখতে চাননি। পরে অবশ্য তিনি মত পরিবর্তন করেন, নারীরা সঙ্ঘে ঢোকার অনুমতি পায়, কিন্তু তিনি 'নস্ট্রাডামুসের' মত ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে, মেয়েদের সংঘে ঢোকানোর ফলে বৌদ্ধ জামানার আয়ুষ্কাল নাকি অর্ধেকে নেমে আসবে।

গৌতম বুদ্ধের সময়কাল আনুমানিক ৫৬৩ – ৪৮৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ধরা হয়। কিন্তু বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে, তিনি এর আগেও বহু বার মানুষ অথবা জীবজন্তুর রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং প্রত্যেকবারই পরম জ্ঞান অর্থাৎ বোধি লাভ করে বোধিসত্ত্ব হয়েছেন। সেই অতীত বুদ্ধ'দের জীবনের থেকে নেওয়া শিক্ষামূলক কাহিনি-সংগ্রহ, যেগুলো 'জাতিস্মর' গৌতম বুদ্ধ তার জীবনে শিষ্যদের শুনিয়েছেন, সেই সংকলন হল 'জাতক'। অবশ্য কোন্ জাতকগুলি বুদ্ধেরই বলা, আর কোন্‌গুলি পরবর্তী সংযোজন, তা অবশ্য বিতর্ক সাপেক্ষ। কিন্তু যা বিতর্ক সাপেক্ষ নয়, তা হল সেই সময়ে উঠে আসা পুরুষতান্ত্রিক সমাজচিত্র এবং নারীদের প্রতি মানসিকতা।

মুক্তমনা সদস্য নিলয় নীল সম্প্রতি একটি চমৎকার সিরিজ লিখেছেন মুক্তমনায় 'বৌদ্ধশাস্ত্রে পুরুষতন্ত্র' নামে[156]। বছর খানেক আগে আরেক মুক্তমনা ব্লগার কৌস্তভ

---

[156] নিলয় নীল, বৌদ্ধশাস্ত্রে পুরুষতন্ত্র, মুক্তমনা, নভেম্বর ১৫, ২০১৩

আরেকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'জাতক ও কামিনী' নামে[157]। এ লেখাগুলো থেকে বৌদ্ধধর্মের যে স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তা সত্যই অস্বস্তিকর ঠেকবে অনেকের কাছেই।

বৌদ্ধশাস্ত্রের ৫৩৬ নম্বর জাতক – নাম কুণাল জাতক। এই জাতকের প্রধান চরিত্র হল কুণাল যার মুখ নিঃসৃত বানী থেকে আমরা নারীদের সম্পর্কে জানতে পারি। কুণাল বলেন নারী কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়, নারী স্বভাবতই বিশ্বাস ঘাতিনী। নারী কোনভাবেই প্রশংসার যোগ্য নয়। পৃথিবী যেমন সকলের আধার তেমনি নারীও কামাচারে পাত্রাপাত্র বিচার করে না। কুণালের মুখে উচ্চারিত হয় নীতি গাথা:

> "সদা রক্ত মাংস প্রিয়, কঠোর হৃদয়,
> পঞ্চায়ুধ, ক্রূরমতি সিংহ দুরাশয়।
> অতিলোভী, নিত্য প্রতিহিংসা পরায়ণ,
> বধি অন্যে করে নিজ উদর পূরণ।
> স্ত্রীজাতি তেমতি সর্বপাপের আবাস,
> চরিত্রে তাদের কভু করো না বিশ্বাস।"

তার মানে, পুরুষের কখনোই নারীর চরিত্রে বিশ্বাস করা উচিত নয়। কুণালের মতে, নারীকে বেশ্যা, কুলটা বললেই সব বলা হয় না, নারী প্রকৃত পক্ষে এরও অধিক কিছু। নারীরা হল –

- উন্মুক্ত মলভাণ্ডের মতো দুর্গন্ধযুক্ত।
- বিষমিশ্রিত মদিরার মতো অনিষ্টকারী।
- কুটিলা সাপের মতো দুই জিহ্বা বিশিষ্ট।
- পাতালের ন্যায় অতল গভীর।
- রাক্ষসীর ন্যায় সন্তোষহীন।
- অগ্নির ন্যায় সর্বগ্রাসিনী।
- নদীর ন্যায় সর্ববাহিনী।
- বায়ুর ন্যায় যথেচ্ছগামিনী।
- বিষবৃক্ষের ন্যায় বিষফল প্রসবিনী।

নারীরা যে মলের মতো দুর্গন্ধময়, এ সম্পর্কে কুণাল বলেন –

> "নারী হল উন্মুক্ত মলভাণ্ডের ন্যায়। উন্মুক্ত মলভাণ্ড দেখিলে মাছি সেখানে ঝাপ দিবেই তাকে রোহিত করা কষ্টকর। কিন্তু একজন জ্ঞানী মানুষ সব সময় এই মলভাণ্ডের দুর্গন্ধ উপলব্ধি করে তা এড়িয়ে চলে। তদ্রূপ নারীরূপ মলভাণ্ডে মাছিরূপ পুরুষ ঝাপ দিবেই, কিন্তু একজন জ্ঞানী ভিক্ষু এই উন্মুক্ত মলভাণ্ডরূপ নারীদের দুর্গন্ধ উপলব্ধি করিয়া তাদের সদাই পরিত্যাগ করেন।"

---

[157] কৌস্তুভ, জাতক ও কামিনী, মুক্তমনা, জুলাই ১১, ২০১১

কুণাল তার নীতিগাথায় আরো বলেন –

"চৌর, বিষদিগ্ধসুরা, বিকথি বণিক
কুটিল হরিণ শৃঙ্গ, দ্বিজিহ্বা সর্পিণী
প্রভেদ এদের সঙ্গে নেই রমণীর।
প্রতিচ্ছন্ন মলকূপ, দুষ্কর পাতাল
দুস্তোস্যা রাক্ষসী, যম সর্বসংহারক
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।
অগ্নি, নদী বায়ু, মেরু (পাত্রাপাত্রভেদ
জানে না যে) কিংবা বিষবৃক্ষ নিত্যফল
প্রভেদ এদের সঙ্গে নাই রমণীর।"

অন্ধভূত-জাতকের মূল কথাই হল, "রমণীরা নিতান্ত অরক্ষণীয়া"। এখানে আমরা দেখি, বোধিসত্ত্ব এক রাজা ছিলেন, এবং তাঁর পুরোহিতের সঙ্গে নিয়মিত পাশা খেলতেন। খেলার সময় একটি গান গেয়ে চাল দিতেন, এবং গানটির সত্যতা-বলে প্রতিবারই জিততেন। সেটির অংশবিশেষ:

"পাপাচার পরায়ণ জানিবে রমণীগণ,
স্বভাব তাদের এই নাহিক সংশয়;
যখনই সুবিধা পায়, কুপথে ছুটিয়া যায়,
ধর্ম্মে মতি তাহাদের কভু নাহি হয়।"

দুরাজান (দুর্জ্ঞেয়)-জাতক এর ছোটগল্পে একটি কবিতা আছে এরকমের:

"ভাল যদি বাসে নারী, হইও না হৃষ্ট তায়;
যদি ভাল নাহি বাসে, তাতেই কী আসে যায়?
নারীর চরিত্র বুঝে হেন সাধ্য আছে কার?
বারিমাঝে চলে মাছ, কে দেখিবে পথ তার?"

তার পরের ছোট গল্পটি হল অনভিরতি-জাতক। এর বক্তব্য এর কবিতাটিতেই স্পষ্ট –

"নদী, রাজপথ, পানের আগার উৎস, সভাস্থল আর,
এই পঞ্চস্থানে অবাধে সকলে ভুঞ্জে সম অধিকার।
তেমনি রমণী ভোগ্যা সকলের, কুপথে তাহার মন;
চরিত্রস্খলন দেখিলে তাহার, রোধে না পণ্ডিত জন।"

বিদূরপণ্ডিত জাতকে আছে:

"নারীর চরিত্র হায়, কে বুঝিতে পারে?
অসতী প্রগলভা বলি জানি সবাকারে।
কামিনী কামাগ্নি তাপে জবে দগ্ধো হয়
উচ্চে নীচে সমভাবে বিতরে প্রণয়।
খাবার প্রস্তুতে বিচার নাই আগুনের ঠাই
নারীর প্রেমে পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান নাই।
অতএব ত্যাজি হেন জঘন্য সংসার
সন্ন্যাসী হইবো এই সংকল্প আমার।"

নারীর প্রতি 'সুআচরণের' লক্ষণীয় প্রকাশ ঘটে যুদ্ধবন্দিনীদের ক্ষেত্রে। ইসলামের দৃষ্টিতে বহুগামী পুরুষের কাছে নারী শুধুই সম্ভোগের বস্তু, সে জন্য দেখা যায় ইসলামী সৈনিকদের জন্য যুদ্ধবন্দি সধবা, বিধবা, বিবাহিত, অবিবাহিত সব নারীকে হালাল করা হয়েছে (কোরআন ৪: ২৪)। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মহানবী থেকে শুরু করে হজরত আলী, হজরত ওসমান, হজরত ওমর সবাই যুদ্ধবন্দি নারী উপভোগ করেছেন, কখনোবা উপপত্নী বানিয়েছেন। কোরআনে বলা আছে – 'তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী (দাস, দাসী এবং যুদ্ধবন্দিনী) – আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাদেরকে বৈধ করেছেন" (৪:২৪)[158]!

এ সমস্ত আয়াতের সুস্পষ্ট প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি আমরা নবী মুহম্মদের জীবনে। ইবনে সাদের প্রথম দিককার জীবনী-সঙ্কলন কিতাব আত তাবাকাত (Kitaab at Tabaqaat al Kabeer) থেকে জানা যায়, মহানবী তার শেষ দশ বছরে অন্তত ৭৪ টি হামলা যুদ্ধ (আরবিতে *গাজওয়া*) সম্পন্ন করেছিলেন[159]। আল তাবারি নবী মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর জীবনে ঘটা যে ষাটটি যুদ্ধের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার 'তারিক আল রসুল ওয়া আল মুল্লুক' গ্রন্থে, এর মধ্যে উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ ছাড়া সবগুলোই ছিল আক্রমণাত্মক[160]। মুহম্মদের প্রথম জীবনীকার ইবনে ইসহাক তার 'সিরাত রসুলাল্লাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, মুসলমানরা বানু হাওয়াজিন গোত্রকে পরাজিত করার

---

[158] Dictonary of Islam থেকে জানা যায়, দাসী যদি বিবাহিতাও হয়, তাকেও অধিকারে নেয়ার ক্ষমতা আছে মনিবের। সুরা ৪:২৪; "তোমাদের দক্ষিন হস্ত যাদের অধিকারী- আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাদেরকে বৈধ করেছেন"। এই আয়াতের ব্যখ্যায় জালালাইন বলেন- "অর্থাৎ, যাদেরকে তারা যুদ্ধের ময়দানে আটক করেছে, তাদের সাথে সহবাস করা তাদের জন্যে বৈধ, যদি তাদের স্বামীগণ জীবিতও থাকে"।

[159] S. Moninul Haq, Pakistan Historical Society. Ibn Sa'd's Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir Vols. 1&2. ISBN 81-7151-127-9

[160] আকাশ মালিক, যে সত্য বলা হয়নি, মুক্তমনা ইবুক।

পরে প্রায় ৬ হাজার নারী ও শিশুর দখল নিয়ে নেয়। যুদ্ধ থেকে সংগৃহীত নারীরা ইসলামী যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টিত হয়। যেমন, ৬২৭ সালের এপ্রিল মাসে বানু কুরাইজার উপর অভিযানের সময় রায়হানা নামের এক সুন্দরী ইহুদি নারীকে নবী নিজের জন্যেই নির্বাচিত করেন। রায়তা নামের সুন্দরী বন্দিনীটি হযরত আলী তার জন্য নেন, জয়নাব নামের আরেক যুদ্ধবন্দি নারী পড়ে আবার হযরত ওসমানের ভাগে। হযরত ওমর আবার তিনি নিজে না নিয়ে ভোগ করার জন্যে তা প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহর হাতে তুলে দেন বলে কথিত আছে। শুধু রায়হানা নয়, জাওয়াহিরা এবং সাফিয়া নামে আরও দুই রক্ষিতা ছিল নবীর। জওয়াহিরা তার হাতে আসে বানু আল-মুস্তালিক অভিযান থেকে, সাফিয়া আসে খায়বারের বানু নাজির গোত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান থেকে। এমনকি কিছু হাদিসে উল্লিখিত আছে যে, যুদ্ধজয়ের পর স্বামীর সামনে স্ত্রীকে অধিগ্রহণেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন মহানবী[161]। কোন কোন সাহাবী বন্দিনীদের সাথে সহবাস করতে বিরত থাকতে চাইছিলেন, কারণ তাদের স্বামীরা ছিল জীবিত, কিন্তু মহানবী উপায় বাৎলে দিলেন, 'তার যদি স্বামী থেকে থাকে, বন্দি হওয়ার পর সে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে'। (কোরআন-৪:২৪, সহি মুসলিম-৮:৩৪৩২)।

সহি মুসলিম, বুক নং-৮, হাদিস নং-৩৪৩২:

আবু সাইদ আল খুদরি (রাঃ) বলেছেন যে হুনায়েনের যুদ্ধকালে আল্লাহর রাসুল (দঃ) আওতাস গোত্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠান। তারা তাদের মুখোমুখি হলো এবং তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। যুদ্ধে পরাজিত করার পর কিছু বন্দি তাদের হাতে আসল। রাসুলুল্লার কিছু সাহাবি ছিলেন যারা বন্দিনীদের সাথে সহবাস করতে বিরত থাকতে চাইলেন, কারণ তাদের স্বামীরা ছিল জীবিত, কিন্তু বহু ঈশ্বরবাদী। তখন মহান আল্লাহ এ সম্পর্কিত আয়াতটি নাজেল করলেন – "এবং বিবাহিত নারীগণ তোমাদের জন্যে অবৈধ, তবে যারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারে আছে তাদের ছাড়া।"

মুহম্মদ যখন প্রথম জীবনে দরিদ্র ছিলেন, প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন ছিলো না, তিনি খাদিজার সাথে সংসার করেছিলেন। খাদিজা ছিলেন বয়সে মুহম্মদের ১৫ বছরের বড়। কিন্তু পরবর্তী জীবনে মুহম্মদ অর্থ, বৈভব এবং সমরাঙ্গনে অবিশ্বাস্য সফলতা অর্জন করার পর অপেক্ষাকৃত কম বয়সী সুন্দরী নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হন। খাদিজা মারা যাওয়ার সময় মহানবীর বয়স ছিল ৪৯। সেই ৪৯ থেকে ৬৩ বছর বয়সে মারা যাবার আগ পর্যন্ত তিনি কমপক্ষে হলেও ১১ টি বিয়ে করেন[162]। এর মধ্যে আয়েশাকে বিয়ে

---

[161] সুনান আবু দাউদঃ বুক নং-১১, হাদিস নং-২১৫০ দ্রঃ

[162] ইরানি স্কলার আলি দস্তি তাঁর 'Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad' গ্রন্থে প্রফেটের জীবনে ২২ জন রমণীর উল্লেখ করেছেন, এদের মধ্যে ১৬ জনকে তিনি বিবাহের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করেন, এ ছাড়া তিনি সম্পর্ক করেছিলেন ২ জন দাসী এবং অন্য ৪

করেন আয়েশার মাত্র ৬ বছর বয়সের সময়। তখন মুহম্মদের বয়স প্রায় ৪৮। এ ছাড়া তার দত্তক পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নবের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেন (সে সময় আরবে দত্তক পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত ছিল না, কিন্তু মুহম্মদ আল্লাহকে দিয়ে কোরআনের ৩৩:৪, ৩৩:৩৭, ৩৩:৪০ সহ প্রভৃতি আয়াত নাজিল করিয়ে নেন); এ ছাড়া আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রিষ্টান শাসক মুকাকিসের কাছ থেকে পাওয়া ক্রীতদাসী মারিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। মারিয়া মুহম্মদের স্ত্রী হাফসার দাসী হিসেবে থাকতেন। মারিয়ার সাথে মুহম্মদের গোপন সম্পর্ক (সে সময় তিনি হাফসাকে মিথ্যে কথা বলে ওমরের বাড়ি পাঠিয়েছিলেন বলে কথিত আছে[163]) হাফসা এবং আয়েশাকে রাগান্বিত করে তুলেছিলো; যুদ্ধবন্দি হিসেবে জুয়ারিয়া এবং সাফিয়ার সাথে সম্পর্ক পরবর্তীতে নানা রকম বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন বৈধ অবৈধ পথে নারীর দখল নিতে মুহম্মদ আগ্রাসী হয়েছিলেন তখনই যখন তার অর্থ প্রতিপত্তি আর ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণে।

হিন্দু ভাইয়েরা যদি এগুলো শুনে দাঁত কেলিয়ে হাসেন, তাহলে বলতেই হয় তাদের জন্য অপেক্ষা করছে দুঃসংবাদ। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে মুহম্মদের ৬ বছর বয়সী নাবালিকার সাথে পাণিগ্রহণের ঘটনা শুনে 'বিকৃত যৌনসম্পন্ন' মনে হয়, তাহলে তাদের অনুরোধ করব হিন্দু পুরাণ টুরানে একটু চোখ বোলাতে। মুহম্মদের তার পুত্র বধূ জয়নবের সাথে সম্পর্ককে যদি অনৈতিক ধরা হয়, তবে ব্রহ্মা নিজ মেয়ে শতরূপার সাথে মিলনকে কিভাবে নেয়া যায়? মৎস্যপুরাণে লেখা আছে ব্রহ্মা নাকি একদিন তার নিজের মেয়ে শতরূপাকে দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারেন নি। হিন্দুদের আদি মানব মনুর জন্ম হয় ব্রহ্মা আর শতরূপার মিলন থেকেই। শুধু ব্রহ্মাই নয়, নিজ মেয়ের সাথে মিলনের কাণ্ড ঘটিয়েছে দেবতা প্রজাপতিও। ঊষা ছিলেন প্রজাপতি কন্যা। প্রজাপতি ঊষার রূপে কামাসক্ত হন, এবং মিলিত হতে চান। তখন ঊষা মৃগীরূপ ধারণ করেন। প্রজাপতি মৃগরূপ ধারণ করে তার সাথে মিলিত হন (মৈত্রায়ন সংহিতা ৪/২/২২)।

জনের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তাবারির 'দ্য লাস্ট ইয়ারস অব দ্য প্রফেট' গ্রন্থ [al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad b. Jarir. The Last Years of the Prophet, vol. ix. Translated by Ismail K. Poonwala. State University of New York Press, Albany , 1990. ISBN 0-88706-692-5.] থেকে পাওয়া তালিকা অনুযায়ী মহানবীর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ২১। এর বাইরে তার অন্ততঃ ২ জন রক্ষিতা (concubine) থাকার উল্লেখ আছে।

[163] William Muir, 'Life of Mahomet' Vol.IV Ch.26 pp. 160-163; এছাড়া দেখুন, ইবনে সাদ, কিতাব আল তাবকাত আল কবির, ভলিউয়ম ৮, পৃঃ ১৯৫। তাবারির 'দ্য লাস্ট ইয়ারস অব দ্য প্রফেট' গ্রন্থের ফুটনোট ৮৮৪ -এও মারিয়ার ঘটনাটির উল্লেখ আছে।

হিন্দুরা ভগবান ডেকে যাকে পুজো করেন – সেই ভগবান ব্যাপারটাই অশ্লীল। 'ভগবান' বলতে ঈশ্বরকে বোঝানো হলেও এটি আসলে হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্রের একটি কুখ্যাত উপাধি। তিনি তার গুরুপত্নী অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করায় গুরুর অভিশাপে তার সর্বাঙ্গে একহাজার 'ভগ' (স্ত্রী যোনি) উৎপন্ন হয় এবং তাতে ইন্দ্রের নাম 'ভগবান' (ভগযুক্ত) হয়। 'ভগবান শব্দটি তাই ইন্দ্রের ব্যভিচারের একটি স্মারকলিপি, নিন্দনীয় বিশেষণ।

হিন্দু ধর্মের শ্রদ্ধেয় চরিত্রগুলো – ইন্দ্র থেকে কৃষ্ণ পর্যন্ত প্রত্যেকেই ছিলেন ব্যভিচারী। জলন্ধরের স্ত্রী বৃন্দা ও শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসীকে প্রতারিত করে বিষ্ণু তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। সপ্তর্ষির সাত স্ত্রীকে দেখে অগ্নি একসময় কামার্ত হয়ে পড়েন। আসলে ওই বিকৃত কল্পনাগুলো করেছিল বৈদিক যুগের পুরুষেরা। তারা নিজেরা ছিল কামাসক্ত, বহুপত্নীক এবং অজাচারী; তাই তাদের কল্পনায় তৈরি দেব-দেবীগুলোও ছিল তাদের মতই চরিত্রের। এজন্যই সমস্ত হিন্দু ধর্মের বই পুস্তকগুলোতে শুধু অযাচিত কাম আর মৈথুনের ছড়াছড়ি। পান থেকে চুন খসলে সে সময়কার মুনি ঋষিরা রাগে কাঁপতে কাঁপতে শাপ দিতেন। বিয়ে করতেন। তারপরও রাজাদের আমন্ত্রণে হাজির হতেন রানিদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে। সুন্দরী অপ্সরা আর বারবনিতা দেখলে এতই উত্তেজিত হয়ে যেতেন যে রেতঃপাত হয়ে যেতো। আর সেখান থেকেই নাকি সন্তান জন্মাত। অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, দ্রোণের জন্মের উদাহরণগুলোই এর প্রমাণ।

মুহম্মদের ২০/২২ জন স্ত্রী নিয়ে মুসলিম-বিদ্বেষীরা নরকগুলজার করেন, কিন্তু তারা হয়তো ভুলে যান, পদ্মপুরাণ অনুসারে (৫/৩১/১৪) শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীর সংখ্যা ষোল হাজার একশ। এদের সকলেই যে গোপবালা ছিলেন তা নয়, নানা দেশ থেকে সুন্দরীদের সংগ্রহ করে তার 'হারেমে' পুরেছিলেন কৃষ্ণ।

অশ্বমেধ যজ্ঞ বলে একটা যজ্ঞ প্রচলিত ছিল প্রাচীন কালে। এ নিয়ে কথা কিছু বলা যাক। বাজসনেয়ী সংহিতার ২২-২৩ অধ্যায় থেকে জানতে পারা যায়, অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রধান পুরোহিত প্রধান রাণীর সঙ্গে প্রকাশ্যে যজ্ঞ-ক্ষেত্রের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে মিলনে মেতে উঠতেন। অন্যান্য পুরোহিতরা যৌন-মিলনের নানা উত্তেজক দৃশ্যের বর্ণনা দিতে থাকতেন উচ্চস্বরে। সব মিলিয়ে (অশ্বমেধ যজ্ঞের) পরিবেশটা হল জীবন্ত খিস্তি-খেঁউড় সহযোগে তা রিলে করে যজ্ঞে হাজির নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন-উত্তেজনা ছড়িয়ে দেওয়া। পরবর্তী যুগে অশ্বমেধ যজ্ঞে পুরোহিতের জায়গা নেয় যজ্ঞের অশ্বটি। যজ্ঞে নাকি প্রধানা রানী অশ্বের লিঙ্গটি নিয়ে নিজের যোনির সাথে স্পর্শ করাতেন। অজাচার সংক্রান্ত এ সমস্ত ব্যাপার স্যাপার বাইবেলেও আছে ঢের।

বাইবেলে (এবং কোরআনে) বিশ্বাসী ধার্মিকেরা বিবর্তন তত্ত্বের বদলে আদম হাওয়ার কথা ফলাও করে প্রচার করেন। বিবর্তন নাকি খুব খারাপ, আর আদম হাওয়ার গল্প খুব ভাল। আমরা ছোটবেলায় ধর্মগ্রন্থে পড়েছি আদম-হাওয়ার দুই সন্তান হাবিল,

কাবিলের কথা। আমরা ধরে নিয়েছি দুটো মানুষ, তাদের সন্তানরা মিলে সারা পৃথিবী মানুষে মানুষে ছেয়ে ফেলেছে। তবে এখানেই থেমে না গিয়ে আরেকটু সামনে আগালে, আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই একটা গভীর প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। তাদের সন্তান উৎপাদনটা ঠিক কীভাবে হলো? সে সময় ভাইবোনে সঙ্গম ছাড়া আমাদের মানবজাতি কি তৈরি হতে পারে? যদিও আদম হাওয়ার কয়জন ছেলে মেয়ে ছিল তা নিয়ে কেউ নিশ্চিত নন, কিন্তু ইহুদী ইতিহাসবিদ জোসেফাসের অনুমান, আদমের তেত্রিশজন পুত্র এবং তেত্রিশজন কন্যা ছিল। আবার কারো কারো মতে পৃথিবীতে আগমনের পর তাঁদের ১৪০ জোড়া সন্তান হয়েছিল। কেউ বা বলেন, তাদের সন্তান সংখ্যা ছিল ৩৬১টি – এর মধ্যে একমাত্র নবী শীস ব্যতীত সবাই নাকি জন্মেছিল জোড়ায়। আদম ও হাওয়ার গর্ভে প্রতিবার নাকি একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্ম নিত। বয়ঃসন্ধি হবার পরে ছেলেটির সাথে পূর্বে জন্ম নেওয়া মেয়ের এবং মেয়েকে পূর্বে জন্ম নেওয়া ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়া হতো। কিংবা তারা বিয়ে করতো যমজ বোনকেই। বাইবেলের মতে, কাবিল ও হাবিল দুজনেই নিজেদের যমজ বোনকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু তৃতীয় বোন আকলিমাকে বিয়ে করা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হলে, এবং ঈশ্বর কাবিলের দান প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা দিলে, কাবিল একটা সময় হাবিলকে হত্যা করে। পবিত্র বাইবেলেই এটাকে উল্লেখ করেছে মানবেতিহাসের 'প্রথম হত্যা' হিসেবে। বোঝাই যায়, আদম হাওয়ার গল্প সত্যি হয়ে থাকলে পৃথিবীতে আমরা এসেছি অজাচার, কলহ, হত্যা খুন, ধর্ষণ আর প্রতারণার মধ্য দিয়ে। এসেছি ঠিক সেই পথ ধরে, যেটাকে খোদ ধর্মগুলোই 'চরম অনৈতিক' বলে মনে করে।

হাবিল কাবিলের উপাখ্যানের বাইরেও বাইবেলে আছে হাজারটা অজাচার প্রমোট করা উপাখ্যান। তার মধ্যে আব্রাহাম এবং সারার পরিণয়ের কথা উল্লেখ্য। সারা ছিলেন আব্রাহামের বোন (হাফ সিস্টার)। তাকেই বিয়ে করেছিলেন আব্রাহাম। বাইবেলে আয়াত উদ্ধৃত করি – 'সারা আমার স্ত্রী, আবার আমার বোনও বটে। সারা আমার পিতার কন্যা বটে, কিন্তু আমার মাতার কন্যা নয়'(আদি পুস্তক, ২০:১২)। বাইবেলে আছে অম্রম এবং যোকেবদের কথাও। যোকেবদ ছিলেন অম্রমের পিসি এবং একই সাথে তার স্ত্রী (যাত্রাপুস্তক, ৬:২০)। বাইবেল (সামুয়েল ২-১৩) থেকে আমরা পাই অম্নোন এবং তামরের কাহিনি। অম্নোন ছিলেন দাউদের পুত্র এবং তামর ছিল তার বোন। অম্নোন তাকে মনে মনে কামনা করতেন। শিমিয়ের পুত্র যোনাদব অম্নোনের বন্ধু ছিলেন। যোনাদবের পরামর্শে অম্নোন একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলেন, তামর তার বাসায় সেবা শশ্রুষা করতে আসলে সুযোগ বুঝে অম্নোন তাকে ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণের পর বাড়ি থেকে বের করে দেয় (সামুয়েল ২:৮ –১৫)। তবে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে লুত এবং তার কন্যাদের অজাচারের কাহিনি।এই কাহিনির সূত্রপাত হয়েছিল যখন

ঈশ্বর অনৈতিকতার অপরাধে সডোম এবং গোমরাহ নগরী ধ্বংস করেন। যদিও বাইবেলে কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই, মোল্লারা খুব নিশ্চিত হয়েই বলেন নগর ধ্বংসের কারণ ছিল 'সমকামিতা'। তা ভাল। সমকামিতার কারণে নগর ধ্বংস করলেন যে ঈশ্বর, তিনিই আবার পিতা এবং কন্যাকে অজাচারে উৎসাহিত করে মানব জাতি টিকিয়ে রাখার সুমহান উদ্যোগ নিলেন, এবং একে উদযাপিত করলেন আনন্দের সাথেই। ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় বাইবেলের আদি পুস্তকে (আদিপুস্তক ১৯: ২৯ – ৩৮)। কাহিনিটা এরকমের :

ঈশ্বর (সডোম এবং গোমরাহ) উপত্যকার সমস্ত নগর ধ্বংস করলেন। কিন্তু ঈশ্বর ঐ নগরগুলি ধ্বংস করার সময় অব্রাহামের কথা মনে রেখেছিলেন এবং তিনি অব্রাহামের ভ্রাতুষ্পুত্রকে ধ্বংস করেন নি। লুত ঐ উপত্যকার নগরগুলির মধ্যে বাস করছিলেন। কিন্তু নগরগুলি ধ্বংস করার আগে ঈশ্বর লুতকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পয়গম্বর লুত যোয়ার শহরে গিয়ে এক পাহাড়ে দুই মেয়েকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। তিনি শহরে বাস করতে ভয় পাচ্ছিলেন আর আর সেই কারণে পাহাড়ের একটি গুহায় বাস করতে লাগলেন।

বড় কন্যাটি তার ছোট বোনটিকে বললো, "আমাদের পিতা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। এবং নগরী ধ্বংস হয়ে যাবার পর আমাদের সন্তানাদি দিতে পারে এমন অন্য পুরুষ এখানে নেই। চল আমরা আমাদের বাবাকে মদ খাইয়ে করিয়ে মাতাল করে ফেলি এবং তার সাথে সঙ্গমের বন্দোবস্ত করি – যাতে করে আমরা আমাদের বাবার বীজকে সংরক্ষণ করতে পারি। আমাদের পরিবার রক্ষা করার জন্যে আমরা এইভাবে আমাদের পিতার সাহায্য নেব!"

অতঃপর তারা সেই রাত্রে তাদের বাবাকে মদ্যপান করালো এবং প্রথম কন্যাটি তার সাথে রাত্রি যাপন করলো। কখন মেয়েটি আসলো, রাত্রি যাপন করলো এবং উঠে চলে গেলো, তিনি (পয়গম্বর লুত) কিছুই জানতে পারলেন না।

পরের রাত্রে প্রথম কন্যাটি তার ছোট বোনটিকে বললো, "গত রাত্রে আমি পিতার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছি। আজ রাতে আবার তাঁকে দ্রাক্ষারস পান করিয়ে বেহুঁশ করে দেব। তাহলে তুমি তাঁর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করতে পারবে। এভাবে আমরা সন্তানাদি পেতে আমাদের পিতার সাহায্য নেব। এতে আমাদের বংশধারা অব্যাহত থাকবে"।

অতঃপর সেই রাত্রেও তারা তাদের বাবাকে মদ্যপান করালো এবং ছোট কন্যাটি তার সাথে রাত্রি যাপন করলো। কখন মেয়েটি আসলো, রাত্রি যাপন করলো এবং উঠে চলে গেলো, তিনি (পয়গম্বর লুত) কিছুই জানতে পারলেন না।

আর এভাবেই পয়গম্বর লুতের দুই মেয়ে তাদের পিতার ঔরসজাত সন্তান গর্ভে ধারণ করলো। প্রথম কন্যার গর্ভে একটি ছেলে সন্তান জন্ম হলো – যার নাম রাখা

হলো মোয়াব। তিনিই হলেন মোয়াবাইটস জাতির পিতা (অর্থাৎ তার বংশধরেরা মোয়াবাইটস নামে পরিচিতি লাভ করলো)। ছোট কন্যাটিও এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। তার নাম বিন্-অম্মি। বর্তমানে যে অম্মোন জাতি আছে তাদের আদিপুরুষ হলেন বিন্-অম্মি।

এই হচ্ছে বাইবেলের সুমহান নৈতিকতার কাহিনি। নারী নিপীড়নেও যেন ধর্মগুলো একেবারে 'আয় তব সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি।' হিন্দু ধর্ম শেখায়, নারীর অধরে পীযুষ আর হৃদয়ে হলাহল, এ জন্যই তাদের অধর আস্বাদন এবং হৃদয়ে পীড়ন করা কর্তব্য। নারীর শুধু হৃদয়ে পীড়ন করাই নয়, শারীরিক নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে, শতপথ ব্রাহ্মণের ৪/৪/২/১৩ নং শ্লোকে : "বজ্র বা লাঠি দিয়ে মেরে নারীকে দুর্বল করা উচিৎ, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার না থাকতে পারে"; বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন : "স্ত্রী স্বামীর সম্ভোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে 'কেনার' চেষ্টা করবে, তাতেও অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে" (৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪ দ্রঃ)। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই বিধানটা ইসলাম ধর্মের সাথেও যেন একেবারে মিলে যায়। নারীকে প্রহার করার জন্য আল্লাহ বিধান দিয়েছেন কোরআন শরিফের সুরা নিসায়: "ওয়াল্লা-তি তাখা-ফু-না নুশু-জাহুন্না ফাআ-জিহুন্না ওয়াহজুরু-হুন্না ফি আলমাদা-জিয়ি ওয়াদরিবুহুন।" বাংলা হচ্ছে, নারী যদি পুরুষের অবাধ্য হয়, যদি নারী বিদ্রোহ করে, তাদেরকে প্রথমে বুঝাও, তাতে যদি কাজ না হয় তাহলে তোমার বিছানায় আসতে নিষেধ করো, তাতেও যদি বশ না মানে, তাদেরকে প্রহার করো (সুরা ৪, নিসা, আয়াত ৩৪)।

নারীকে আজ বেঁচে উঠতে হবে। বেরুতে হবে এই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের নাগপাশ থেকে। নিজেকে গড়ে তুলতে হবে এই সমস্ত নারীবিদ্বেষী ভাইরাসের এন্টিবডি হিসেবে। আশার কথা বর্তমানে বহু রাষ্ট্রই এই সব মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের ভাইরাস প্রতিরোধ করে সামনে এগিয়ে গিয়েছে। পেছনে পড়ে রয়েছে কেবল কিছু মুখচেনা 'ভাইরাস আক্রান্ত রাষ্ট্র'। সেখানে মেয়েরা গৃহবন্দি থাকে। গাড়ি চালাতে পারে না, পুরুষদের সাথে বাইরে কাজ করতে পারে না, আবৃত করে রাখতে হয় সর্বাঙ্গ। কখনো চার সতীনের সাথে ঘর করে, কখনো বা থাকতে হয় কোন বাদশাহর হারেমের অংশ হয়ে। পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান, সৌদি আরবের মত রাষ্ট্রগুলোতে জেনা এবং হুদুদ আইন ধর্ষনকারীদের 'রক্ষা কবচ' হিসবে ব্যবহৃত হয়। ধর্ষণ প্রমাণ করার জন্য 'চারজন সাক্ষী' প্রায় কোন ক্ষেত্রেই মেয়েটির পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয় না, ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ধর্ষণকারীর ঘটে মুক্তি, আর 'জেনা' করার দায়ে মেয়েটার কপালে জুটে 'শরিয়ার রজম'। অনেক সময় দেখা যায়, মেয়েটির পরিবারই হতভাগ্য মেয়েটিকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয় পরিবারের 'সম্মান' রক্ষার জন্য।

ধর্মগুলোর রচয়িতা পুরুষ। কোন ধর্মই যেহেতু নারীর প্রয়োজনে বা নারীর কল্যাণে সৃষ্টি হয়নি; নারীর ধর্ম-কাতরতা আর ধর্ম-মাদকতা তাই দূর করা প্রয়োজন, তাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য। ধর্ম রচিত হয়েছে পুরুষদের দ্বারা, পুরুষদের জন্য, নারীর কল্যাণের জন্য নয়। বেগম রোকেয়া এ প্রসঙ্গে 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেন –

> 'যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। আমরা প্রথমত যাহা মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষ-গণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষোচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।'

ধর্মে বিশ্বাস রেখে পুরুষের সমান অধিকারও দাবি করাটা নারীদের জন্য অনেকটা 'সোনার পাথরবাটি'র মতোই হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ধর্ম আঁকড়ে থাকতে গেলে এর চেয়ে বিপরীত চিত্র আশা করা যায় না। কারণ ধর্ম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়নি। অশিক্ষিত মোল্লা, পুরোহিতরা দেবে এমন ভাবনা হাস্যকর। তারা নারীদের উন্নয়নের কথা ভাবে না, বরং তারা ধর্ম নামক প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সেবাদাস। নন্দিনীর মতে, 'খোদ 'ধর্ম' বিষয়টাই উপড়ে ফেলতে পারলে, মানব সভ্যতা রক্ষা পেলেও পেতে পারে'। নন্দিনীর মত অন্য সকল নারীরা এটা যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন, তত তাড়াতাড়ি হয়তো ঘটবে 'বিশ্বাসের ভাইরাস' থেকে মুক্তি।

সপ্তম অধ্যায়
ধর্মগুলো টিকে আছে কীভাবে?

একটি যুক্তি আমাকে প্রায়ই মোকাবেলা করতে হয় – ধর্ম ব্যাপারটা যদি এতো ক্ষতিকারক হয় তাহলে সেটা পৃথিবীতে টিকে আছে কীভাবে? শুধু ধার্মিকেরা নয়, এমনকি যারা বিবর্তনে বিশ্বাস করেন তাদের জন্যও ব্যাপারটা অনেকটা ধাঁধার মতো। প্রায়ই এ ধরণের বাক্য আমরা উচ্চারিত হতে দেখি –

'ধর্মের যদি কোন উপযোগিতাই না থাকে, যদি সেটা নিষ্ফল এবং ক্ষতিকারকই হয়ে থাকে, তবে লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার ছাকনিতে পড়ে সেটা কি বিলুপ্ত হয়ে যাবার কথা ছিল না?'

উপরের উক্তিটি এক ধর্মীয় ব্যঙ্গনবিশ (religious satirist) বেকি গ্যারিসনের। তবে গ্যারিসনেরটা আলোচনার জন্য তুলে দিলেও এ ধরণের উক্তি সব জায়গাতেই কমবেশি দেখা যায়। পাওয়া যায় বাংলা ব্লগ সাইটগুলোতেও। এমনকি আমাদের দেশের সম্পাদক মাহমুদুর রহমানও শাহবাগ আন্দোলনের সময় নাস্তিকদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী কিছু লেখা লিখেছিলেন, সেখানে তিনি কিছু পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেছিলেন, এবং বলতে চেয়েছেন, ধর্মের উপযোগিতা আছে বলেই সেটা পৃথিবীতে টিকে আছে।

কিন্তু সত্যই কি তাই? আমরা এই প্রবন্ধে প্রদত্ত যুক্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করব। বলা বাহুল্য, এখানে আমি নতুন কিছু পাঠকদের জন্য শোনাচ্ছি না। বহু বিশ্লেষকই অতীতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুক্তিমালা চ্যালেঞ্জ করেছেন, এর দুর্বলতাগুলো তুলে ধরেছেন। সেগুলোই মূলত আলোচনায় আনব। যেমন, এ প্রসঙ্গে ক্রেইগ এ জেমসের 'দ্য রিলিজিয়ন ভাইরাস' বইটির কথা বলা যায়। বইটির 'নাস্তিকদের ধাঁধা' শিরোনামের একটি অধ্যায়ে বেকি গ্যারিসনের যুক্তিগুলো নিয়ে জেমস পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন[164]। আসলে বেকির এই ধাঁধার উত্তর খুব সহজ। বেকি যে বলেছেন, কোন কিছু ক্ষতিকর মনে হলেই যে সেটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ছাঁকনিতে পড়ে বাতিল বা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, সেটা ঠিক নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে উলটো। বহু

---

[164] Craig A. James, The Religion Virus: Why We Believe in God: An Evolutionist Explains Religion's Incredible Hold on Humanity, John Hunt Publishing. 2010

ভাইরাস, প্যারাসাইট প্রকৃতিতে টিকে আছে তারা জীবজগতের জন্য ক্ষতিকারক প্রমাণিত হবার পরেও। সত্য বলতে কি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা জীবজগতের সামগ্রিক সংখ্যার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। আমাদের দেহেই দেহকোষের চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার বাস। আর কোন কিছু ক্ষতিকারক হলেই যদি সেটা বিলুপ্ত হয়ে যেত, তবে, আমাদের দেহে ক্যান্সারের মতো মরণরোগ বাসা বাঁধতে পারত না, এইচআইভি ভাইরাস হুমকি হয়ে দাঁড়াতো না। সোয়াইন ফ্লু, সার্স, ম্যাড কাউ সহ হাজারটা অণুজীব নিয়ে আমাদের এখনো প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হতে না। ধর্মও মানব সমাজে প্রোথিত হয়ে আছে, টিকে আছে অনেকটা ভাইরাসের মতোই।

ধর্মের উপযোগিতা?

বেকি গ্যারিসনের যুক্তিকে অন্যভাবেও মোকাবেলা করা যেতে পারে, যেটি করেছেন অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স তার বহুল বিক্রিত 'ঈশ্বর বিভ্রান্তি' গ্রন্থে[165]।

ডকিন্স মানব সভ্যতাকে অনেকটা শিশুদের মানসজগতের সাথে তুলনা করেছেন। আমরা জানি ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয় বড়দের কথা মেনে চলার, তাদের কথা শোনার। আমার মনে আছে আমি স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম যে কবিতা 'নার্সারি রাইম' হিসেবে মুখস্থ করেছিলাম সেটি ছিল এরকমের –

'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে'।।

এই যে 'গুরুজনেরা যে আদেশ করবেন' সেটা 'ভাল মনে করে যেতে হবে' সেটা ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয়। এর কারণ আছে। শিশুদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই একটা সময় পর্যন্ত অভিভাবকদের সমস্ত কথা নির্দ্বিধায় মেনে চলতে হয়। 'নদীর পাড়ে যায় না, ওখানে কুমির থাকে', 'চুলায় হাত দেয় না, হাত পুড়ে যাবে', 'না ধুয়ে আপেল খায় না, পেট খারাপ করবে' – বড়দের দেয়া এই ধরণের অভিভাবকদের দেয়া উপদেশাবলি আমরা বংশপরম্পরায় বহন করি – কারণ এ উপদেশগুলো সঠিকভাবে পালন করলে আমরা প্রকৃতিতে সফলভাবে টিকে থাকতে পারি, সেটা প্রমাণিত হয়েছে। যে শিশুরা অভিভাবকের অবাধ্য হয়ে নদীর পারে গেছে হয়তো কুমীরের খাদ্য হয়েছে, যে শিশু মায়ের উপদেশ না শুনে আগুনে হাত দিয়েছে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে, তারা কোন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রেখে যেতে পারেনি। প্রজন্ম সফলভাবে

---

[165] Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books, 2008

রক্ষা করতে পেরেছে সে সমস্ত শিশুরাই যারা অভিভাবকদের কথা বিশ্বাস করেছে, তাদের উপদেশের অবাধ্য হয়নি। ফলে বিবর্তনগতভাবে একধরণের চাপ তৈরি হয়েছে শিশুদের উপর যে অভিভাবকদের কথা, গুরুজনদের উপদেশ, গোত্রাধিপতিদের নির্দেশ পালন করতে হবে, নইলে টিকে থাকতে সমস্যা হবে। এখন কথা হচ্ছে – তারাই যখন অসংখ্য ভাল উপদেশের পাশাপাশি আবার কিছু মন্দ অর্থহীন কিংবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপদেশও দেয় – 'মঙ্গলবারে মন্দিরে পাঁঠাবলি না দিলে অমঙ্গল হবে', কিংবা গোত্রাধিপতি যখন বলেন, 'সূর্যগ্রহণের সময় নামাজে কুসূফ পড়তে হবে, নইলে সূর্য আর আকাশে উঠবে না' – তখন শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না সেই মন্দ বিশ্বাসকে অন্য দশটা বিশ্বাস কিংবা ভাল উপদেশ থেকে আলাদা করার। সেই মন্দ-বিশ্বাসও বংশপরম্পরায় সে বহন করতে থাকে অবলীলায়। গুরুজনদের উপদেশ বলে কথা! সব বিশ্বাস হয়তো খারাপ কিংবা ক্ষতিকর নয়, কিন্তু অসংখ্য মন্দ বিশ্বাস অনেক সময়ই জন্ম দিতে পারে 'বিশ্বাসের ভাইরাসের'। তখন গোত্রাধিপতিদের কথাকে শিরোধার্য করে তার একনিষ্ঠ অনুগামীরা বিধর্মীদের হত্যা করা শুরু করে, ডাইনি পোড়ানোতে কিংবা সতীদাহে মেতে উঠে, কখনো গণ-আত্মহত্যায় জীবন শেষ করে দেয় কিংবা বিমান নিয়ে সোজা হামলে পড়ে টুইন টাওয়ারের উপর।

ধর্মীয় বিশ্বাসের উদ্ভব নিয়ে আমি এবং রায়হান আবীর 'অবিশ্বাসের দর্শন' বইটিতে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম[166]। মানব সভ্যতার সূচনা পর্বে ধর্ম ছিল জাদু বিদ্যাকেন্দ্রিক, অনেক নবী পয়গম্বর ছিলেন আসলে জাদুকর। বহুকাল আগে, জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষের এক গোত্রের কথা চিন্তা করা যাক। গোত্রের সব মানুষের সামনে একজন বুদ্ধিমান পুরোহিত জ্বলন্ত আগুনে ছুঁড়ে দিলেন মুঠোভর্তি কালো গুঁড়ো। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিস্ফোরণে আগুনের শিখা উপরে উঠে গেল। গোত্রের সাধারণ মানুষদের কাছে ঘটনাটি গণ্য হলো জাদু হিসেবে। এবং এই 'অতিপ্রাকৃত ঘটনা' সবার সামনে ঘটানোর জন্য সামান নিজেকে দাবি করলেন সবার চেয়ে আলাদা একজন, বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে। উদাহরণ হিসেবে সামনে আনা যেতে পারে সামানদের দৃষ্টান্তকে। সামান গোত্রভুক্তরা তাদের মনে থাকা অসংখ্য প্রশ্ন ও বিভিন্ন ঘটনা কে ঘটাচ্ছেন এমন প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে দ্বারস্থ হতেন জাদুকর সামানদের কাছে। ইচ্ছা, পেছনে থাকা একজনকে খুঁজে বের করা – যার ইশারায় ঝড় হয়, যার ইশারায় তারা খাবারের সন্ধান পায়, যার ক্রোধে মহামারীতে তাদের অর্ধেকেরও বেশি ধুম করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সভ্যতার এই পর্যায়ে এসে আমরা দেখতে পাই, সামানরা নিজেরাও আলাদা কেউ ছিলেন না, তাদের জাদুটাও সত্যিকার অর্থে জাদু নয়, রাসায়নিক বিক্রিয়া। সামানরা নিজেদের ক্ষমতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বানিয়ে বানিয়ে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতেন, গোত্রের সবাই মাথা নত করে তার কথা মেনে নিতো।

---

[166] অভিজিৎ রায় এবং রায়হান আবীর, অবিশ্বাসের দর্শন, জাগৃতি, ২০১৫

কখনো সূর্য, কখনো দূরে থাকা কোনো পাহাড়কে পূজা করতো।

প্রথমদিকে, মানুষ ছোট ছোট গোত্রে বাস করতো। তখন থেকেই সমঝোতা, ইট-মারলে পাটকেল (tit-for-tat), সততা, সহমর্মিতা, বিনিময়ী পরার্থতা (Reciprocal Altruism) প্রভৃতি মূল্যবোধ প্রায় সবার মধ্যেই ছিল। গরিলা, শিম্পাঞ্জি, নেকড়ে এমন কি মৌমাছি, পিঁপড়ার মতো কিছু সামাজিক প্রাণীর মধ্যেও এই ধরণের কিছু মূল্যবোধের কম-বেশি উপস্থিতির ফলে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি, কোনো ঐশী প্রক্রিয়ায় মূল্যবোধগুলো মানব সমাজে উদ্ভূত হয় নি, বরং জৈবিক সামাজিক বিবর্তনের ফলাফল স্বরূপ এগুলো বিবর্তনের ধারাবাহিকতাতেই উদ্ভূত হয়েছে মানুষের মধ্যে। পরবর্তীতে সমাজ আরো জটিল হয়েছে। সেই জটিলতা স্পর্শ করেছে নৈতিকতা আর মূল্যবোধগুলোকেও। যেমন, কৃষিকাজের ব্যাপক অগ্রগতির ফলে গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল একসময়, অপরিচিতের সাথে আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হওয়ায় দেখা গেল, আগেকার সেই ছোট গোত্রের মূল্যবোধে ঠিকঠাক কাজ হচ্ছে না। এই কারণে সমাজপতি এবং নেতারা সবাইকে সংঘবদ্ধ রাখার জন্য আরও কিছু নিয়ম-কানুন সমাজে সংযুক্ত করা শুরু করলেন। তারা ভাবলেন, কেউ কিছু বললেই তো আর মানুষ শুনবে না, এই সংশয়ে কেউ কেউ সেই নিয়ম-কানুনগুলোকে 'ঈশ্বর প্রদত্ত আইন' বলে প্রচার করলেন। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘবদ্ধ ধর্মের সূচনা তাই কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরঞ্চ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই অঞ্চলগুলোয় কৃষিকাজের দ্রুত উন্নতি তৈরি করেছিল যাজক শ্রেণী। সেখানকার রাজারা নিজেদের প্রকাশ করতেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে। খ্রিস্টান রাজারা চার্চের সহায়তার কারণে যেকোনো কাজ করাকে স্বর্গীয় অধিকার বলে মনে করতেন। এ ধরণের ঘটনা আমরা অন্য অনেক জায়গায়ই দেখি। যেমন, চীনেও একটা সময় রাজাকে মানব সমাজের স্বর্গীয় প্রতিনিধি হিসেবে ভাবা হতো বহুদিন ধরে।

কীভাবে নতুন ধর্ম তৈরি হয়, কীভাবে ধর্মের অনুসারী তৈরি হয়, কীভাবে মানুষ নবী রাসুলকে বিশ্বাস করতে শেখে তা একটা চমৎকার উদাহরণের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন কার্গো কাল্ট (Cargo Cult) নিয়ে গবেষণা করে। 'কার্গো কাল্ট' হলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে বর্তমান ধর্মবিশ্বাসগুলোর একটি সম্মিলিত নাম- যারা কার্গো-জাহাজগুলোকে স্বর্গীয় দূতের পাঠানো সামগ্রী মনে করতো। জাহাজের ইউরোপিয়ান নাবিকেরা কীভাবে রেডিও শোনে, কেন কোনো সারাইয়ের কাজ করতে হয় না, রাতে কী করে আলো জ্বালায় – এ সবই দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা অদ্ভুত বিস্ময়ে দেখত। তাদের কাল্টপ্রধান জন ফ্রাম চিরতরে চলে যাবার আগে সেসময় অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন – দ্বিতীয়বারে জাহাজভর্তি সামগ্রী আনবে ও সাদা আমেরিকানদের চিরকালের মতো দ্বীপ থেকে বিতাড়িত করা হবে ইত্যাদি বলে। ঠিক যেমন আপনার পরিচিত বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ যেভাবে অপেক্ষা করে আছে পুনরুত্থিত

যিশুখ্রিস্ট কিংবা ইমাম মাহাদির জন্য, ঠিক তেমনি কার্গো কাল্টের আদিবাসীরাও দীর্ঘ পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে অপেক্ষা করে আছে জন কখন আসবে তাদের মুক্তি দিতে।

যানজট : ব্যক্তিগত সুবিধা পেতে গিয়ে সমষ্টির ক্ষতি

বিবর্তনের কথা বললেই একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমি প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দেই সবাইকে – বিবর্তন কাজ করে একক জিনের উপর, কোন দলের উপর নয়। কাজেই সমষ্টিগতভাবে প্রজাতির কল্যাণের কথা মাথায় রেখে বিবর্তন পরিচালিত হয়নি, কখনো হয় না।

এ ব্যাপারটি জনপ্রিয়ভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরার কৃতিত্ব যার, তিনি হচ্ছেন রিচার্ড ডকিন্স। তিনি ১৯৭৬ সালে একটি যুগান্তকারী বই লিখেন 'সেলফিশ জিন' নামে। এটি ছিল রিচার্ড ডকিন্সের প্রথম বই এবং তার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোর একটি। এই বইয়ের মাধ্যমেই ডকিন্স সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে, বিবর্তন কাজ করে জিনের উপর, একক কোন জীবের উপর নয়। আমাদের দেহ যাই করুক শেষ পর্যন্ত 'অত্যন্ত স্বার্থপর'ভাবে জিনকে রক্ষা করা আর জিনকে পরবর্তী প্রজন্মে পৌছে দেয়াতেই উদ্দেশ্য খুঁজে নিতে বাধ্য করে, বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের কোন 'উদ্দেশ্য' যদি থেকে থাকে তবে সেটাই সে উদ্দেশ্য। বইটির নাম 'সেলফিশ জিন' হলেও বইটির মূল লক্ষ্য ছিলো ঠিক বিপরীত। জিনগত স্বার্থপরতা থেকেই ক্রমান্বয়ে কীভাবে উদ্ভব হয় পরার্থিতার মত একটি বিপরীতমুখী অভিব্যক্তির – তা ব্যাখ্যা করাই ছিলো বইয়ের মূল উদ্দেশ্য। ডকিন্স কিন্তু নতুন কিছু লেখেননি, বরং জর্জ উইলিয়ামস এবং উইলিয়াম হ্যামিলটনের কাজগুলোকেই জনপ্রিয় বিজ্ঞানের মোড়কে মলাটবন্দি করেছেন। তথ্যে নতুনত্ব না থাকলেও নিঃসন্দেহে নতুনত্ব আর অভিনবত্ব ছিলো উপস্থাপনায়। উইলিয়ামস এবং হ্যামিলটনের কাজ ছিলো একেবারেই কাঠখোট্টা একাডেমিক লেভেলে। ডকিন্স তাদের কাজকেই সাধারণ মানুষের দরবারে নিয়ে গেলেন একাডেমিক জার্গন সরিয়ে। আসলে এমনকি একাডেমিক স্তরেও ডকিন্সের বইটি প্রকাশের আগে এত ব্যাপকভাবে উইলিয়ামস এবং হ্যামিলটনের কাজ সম্বন্ধে কারো জানাশোনা কিংবা গ্রহণযোগ্যতা ছিলো না। এই বইয়ের মাধ্যমেই আসলে জীববিজ্ঞানীরা সমাজ এবং জীবনকে ভিন্নভাবে দেখা শুরু করলেন। পরার্থিতা, আত্মত্যাগের মত যে বিষয়গুলো আগে বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন না, সেগুলো আরো বলিষ্ঠ-ভাবে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারলেন তারা। ডকিন্সের বইটি প্রকাশের আগে জীববিজ্ঞানীরা পরার্থিতা এবং আত্মত্যাগকে ব্যাখ্যা করতেন 'গ্রুপ সিলেকশন' বা দলগত নির্বাচনের মাধ্যমে। অর্থাৎ, আত্মত্যাগ ব্যাপারটি ব্যক্তির জন্য খারাপ হলেও পুরো দলের জন্য ভালো – এটাই ছিলো আত্মত্যাগের মত প্রবৃত্তিগুলো টিকে থাকার কারণ – এভাবেই ভাবতেন জীববিজ্ঞানীরা। কিন্তু ডকিন্সের সেলফিশ জিন বইটি এসে

দাবার ছক একেবারেই উলটে দিলো। ডকিন্স দেখালেন যে, দলের কথা মাথায় রেখে বিবর্তন কখনোই কাজ করে না। আসলে দলগত নির্বাচন ব্যাপারটাই বিবর্তনের পরিভাষা থেকে উঠিয়ে দেয়া উচিৎ। যে ব্যাপারগুলোকে আপাতভাবে দলগত নির্বাচনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে, তার সবগুলোকেই আসলে 'স্বার্থপর জিন' তত্ত্বের মাধ্যমে আরো অনেক ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ, নির্বাচন হয় জিন লেভেলে, গ্রুপ লেভেলে নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই জীববিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন নিজের জিনকে রক্ষা কিংবা যাদের সাথে জিনের নৈকট্য বেশি থাকে, তাদেরকেই রক্ষার তাগিদ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। আর তা থেকেই ঘটে বৃহৎ স্কেলে পরার্থিতার সূত্রপাত। পিঁপড়া, মৌমাছি,উইপোকা থেকে শুরু করে বানর, শিম্পাঞ্জি কিংবা মানুষ – সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে জিনগত স্বার্থপরতা থেকেই উদ্ভব ঘটে পরার্থিতার, যা এতদিন ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হতো দলগত নির্বাচনের মাধ্যমে। জীববিজ্ঞানে এ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। মানবসমাজের বিভিন্ন সামাজিক প্যাটার্ন ব্যাখ্যা করার নতুন এক দুয়ার খুলে দিলো ডকিন্সের স্বার্থপর জিন তত্ত্ব। স্বার্থপর জিনতত্ত্বই দলগত নির্বাচনকে সার্থকভাবে প্রতিস্থাপন করলো উইলিয়ামস-হ্যামিলটন-স্মিথের প্রস্তাবিত স্বজাতি নির্বাচন (Kin selection) দিয়ে। আমি ২০১২ সালে প্রকাশিত 'ভালবাসা কারে কয়' বইটিতে এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছিলাম[167]। উৎসাহী পাঠকেরা পড়ে নিতে পারেন। কিছু গবেষক ধর্ম, নৈতিকতা প্রভৃতির উদ্ভব এবং অস্তিত্ব ব্যাখ্যার জন্য এখনো দলগত নির্বাচনের সহায় হলেও রিচার্ড ডকিন্স, জেরি কয়েন, স্টিভেন পিঙ্কার, ওয়েস্ট, গ্রিফিন গার্ডেনার প্রমুখ নানাভাবে দেখিয়েছেন যে দলগত নির্বাচনের চেয়ে স্বার্থপর জিনতত্ত্ব এবং স্বজাতি নির্বাচন দিয়েই ব্যাপারগুলোকে আরো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায়[168]।

বিবর্তন দলগতভাবে কাজ করে না বলেই আমরা জীবজগতে অনেক উদাহরণ দেখতে পাই যেটা ব্যক্তির জন্য উপকার আনলেও সমষ্টিগতভাবে ক্ষতিকর হয়ে যেতে পারে। এটা কেবল জীববিজ্ঞানে নয় আমাদের চারপাশের সামাজিক জীবনেও দৃশ্যমান। রাস্তার যানজট এর একটি ভাল উদাহরণ। সবাই চায় অফিস যাওয়ার সময় রাস্তাঘাট যানজট মুক্ত থাকুক, কিন্তু সবাই অফিসে যাবার সময় নিজের গাড়ি হাঁকিয়ে ঠিক একই সময় বাড়ি থেকে বের হয়, আর রাস্তায় তৈরি করে অসহনীয় যানজটের। ব্যক্তিগত সুবিধা পেতে গিয়ে সমষ্টিগত অসুবিধা তৈরি করার চমৎকার দৃষ্টান্ত এটি।

আমি আমেরিকার আটলান্টার যে প্রান্তে থাকি, সেখান থেকে অফিসে যেতে (খালি রাস্তায় ড্রাইভ করে) বিশ পঁচিশ মিনিট সময় লাগার কথা। কিন্তু প্রতিদিন 'অফিস

---

[167] অভিজিৎ রায়, ভালবাসা কারে কয়, শুদ্ধস্বর, ২০১২

[168] এ প্রসঙ্গে পড়ুন অধ্যাপক জেরি কয়েনের, 'The demise of group selection' (whyevolutionistrue.wordpress.com-এ প্রকাশিত), অথবা স্টিভেন পিঙ্কারের 'The false allure of group selection' (edge.org এ প্রকাশিত) ইত্যাদি।

আওয়ারে'র সূচনালগ্নে অর্থাৎ সকাল আটটা থেকে নটার মধ্যে অফিস যাওয়ার জন্য হাইওয়ে ৪০০ এ উঠলেই দেখা যায় গাড়ির লম্বা বহর। যানজটে গাড়ি যেন নড়তেই চায় না। বিশ মিনিটের পথ পেরিয়ে অফিসে পৌঁছুতে অনেক সময় এক ঘণ্টার উপর লেগে যায় আমার। সবাই যদি নিজের ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে বের না হয়ে কেউ কেউ যদি সরকারী বাস কিংবা 'পাবলিক ট্রান্সপোর্ট' ব্যবহার করতো, তাহলে তাদের অফিসে পৌঁছুতে বিশ মিনিটের জায়গায় হয়তো ত্রিশ চল্লিশ মিনিট সময় লাগতো, কিন্তু দেড় ঘণ্টার সমষ্টিগত যানজটের এই দুর্বিপাক এড়ানো যেত সহজেই। গরীব মানুষেরা কিছুটা করে বটে, কিন্তু যাদের গাড়ি আছে, তারা কেউই তা করে না।

এর পেছনে একটা কারণ আছে। একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক, আটলান্টা কমিউনিটি থেকে ঠিক করা হল, একটা সপ্তাহ সবাই বাসে করে অফিসে যাবে। এই ব্যাপারটা ঠিক করার পর প্রথম কয়েকদিনেই যানজট একেবারেই কমে যাবে। সমষ্টিগতভাবে সবার অফিসে যেতে সামান্য দেরি হলেও, কাউকে দেড় ঘণ্টা ধরে রাস্তায় ধুকে ধুকে অফিসে পৌঁছুতে হবে না। কিন্তু এ অবস্থায় শুরু হবে আরেক সমস্যা। দেখা যাবে, কমিউনিটির সুযোগসন্ধানীরা এই ফাঁকা রাস্তার সুযোগ নিতে শুরু করেছে। ধরা যাক আটলান্টা কমিউনিটির মিস্টার জন দুদিন বাসে করে অফিস যেতে যেতে দেখল – আরে রাস্তা তো ফাঁকাই থাকে এখন। আমি বাসে যাওয়ার চেয়ে গাড়ি নিয়ে রওনা হই না কেন। জন এর পরদিন বাসের জন্য দাঁড়িয়ে না থেকে সকালে গ্যারেজ থেকে নিজের গাড়ি বের করে সাঁ সাঁ করে চালিয়ে বিশ মিনিটে অফিসে পৌঁছিয়ে গেল। জনের এই সুযোগসন্ধানী কাজ যথারীতি নজরে পড়বে অন্যদেরও। তারাও ঠিক করবে, আমরাই বা এভাবে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থেকে, এবং বাসে উঠে ধুঁকতে ধুঁকতে অফিসে যাব কেন। জন যেখানে বিশ মিনিটে অফিসে পৌঁছিয়ে যাচ্ছে, আমাদের চল্লিশ মিনিট ধরে বাসে ঝুলে ঝুলে অফিসে যাওয়ার কোন অর্থ নেই, আমাদের নিজেদের গ্যারেজেও তো গাড়ি আছে। অতএব একে একে সবাই আবার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে জনের দেখাদেখি নিজেদের গাড়ি নিয়ে বের হবে, এবং শেষ মেষ তৈরি করবে আবারো সেই আগের মতো অসহনীয় যানজটের। বিশেষত সম্পদ যখন সীমাবদ্ধ থাকে তখন ব্যক্তিগত সুবিধা পেতে গিয়ে সমষ্টির সুবিধাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর ব্যাপারটাকে চলতি ভাষায় বলে 'ট্র্যাজেডি অব দ্য কমনস'। এ ব্যাপারটাকে প্রথম একাডেমিয়ায় তুলে ধরেছিলেন প্রাণীবিজ্ঞানী গ্যারেট হার্ডিন্স ১৯৬৮ সালে একটি গবেষণাপত্রের মাধ্যমে[169]। পরবর্তীতে আরো অনেক গবেষকদের গবেষণাতেই এবং গাণিতিক মডেলে এর সত্যতা পাওয়া গেছে।

বহু গবেষকই অভিমত দিয়েছেন ধর্মের ব্যাপারটাও সেরকমের। ধর্ম মানুষকে

---

[169] Garrett Hardin , The Tragedy of the Commons, Science, 162 (3859), 1968, pp. 1243-1248.

ব্যক্তিগত সুবিধা দিতে গিয়ে সমাজের সমষ্টির ক্ষতি করে চলেছে অবিরত। অনেকেই ধর্ম পালনের পেছনে কারণ হিসেবে বলেন, তারা ধর্ম পালন করেন, কারণ ঈশ্বরকে ডেকে কিংবা ধর্মের আচার আচরণ পালন করে তারা শান্তি পান। কথাটা হয়তো ঠিকই। ব্যক্তিগতভাবে শান্তি পেলেও, সমষ্টিগতভাবে সেগুলো তৈরি করছে বর্ণবৈষম্য, ধর্মযুদ্ধ, জাতিভেদ, নিম্ন বর্ণের উপর অত্যাচার কিংবা নারীদের অন্তরিন রাখার উপকরণ সহ নানা ধরণের অরাজকতা। বিবর্তন প্রক্রিয়া যেহেতু সমষ্টির উপর কাজ করে না, বরং কাজ করে একক ব্যক্তির জিনের উপর, এ ধরণের ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য তাই বিলুপ্ত না হয়ে টিকে থাকতেই পারে।

প্যারাসাইট যখন নিয়ে নেয় জৈবিক প্রক্রিয়ার দখল

আমরা বইয়ের অনেক জায়গাতেই 'ল্যাংসেট ফ্লুক' নামের প্যারাসাইটের সাথে পরিচিত হয়েছি। এই প্যারাসাইট যখন পিঁপড়ার মস্তিষ্ক তথা জৈবিক প্রক্রিয়ার দখল নিয়ে নেয়, তখন পিঁপড়া কেবল ঘাসের গা বেয়ে উঠা নামা করতে থাকে। বহুদিন ধরে এই অদ্ভুতুড়ে ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের ধাঁধায় ফেলে রেখেছিল। যখন বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত এই ধাঁধার সমাধান করতে পারলেন, তারা বুঝলেন, পিঁপড়াগুলো আসলে একধরণের 'মধ্যবর্তী মাধ্যম' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পিঁপড়াগুলোর মস্তিষ্ককে আসলে 'হাইজ্যাক' করে ফেলেছে 'ল্যাংসেট ফ্লুক' নামধারী এই প্যারাসাইটগুলো। নিজের বংশবৃদ্ধির জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য পিঁপড়ার মাথাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে ল্যাংসেট ফ্লুক।

এরকম আরো একটা উদাহরণের সাথেও আমরা পরিচিত হয়েছি – যেটা কেবল হোস্টের মস্তিষ্কের সংক্রমণ ঘটিয়েই ক্ষান্ত হয় না, তাকে আত্মহত্যায় বাধ্য করে। নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম নামের এই ফিতাকৃমি সদৃশ প্যারাসাইট ঘাসফড়িং-এর মস্তিষ্ককে সংক্রমিত করে ফেললে ঘাসফড়িং পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। এখানেও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন নিজের প্রজননগত সুবিধা পেতে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম বেচারা ঘাসফড়িংকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে।

এবারে একটা নতুন উদাহরণ দেখি। ইকনিউমেন (Ichneumon) প্রজাতির একধরণের প্যারাসিটোয়েড বোলতা আছে। এদের নিয়ে লিখেছিলাম আমার 'ভালবাসা কারে কয়' বইটিতে। এই বোলতাগুলো শুঁয়োপোকার মস্তিষ্ককে নয়, তার দেহকে হোস্ট হিসেবে ব্যবহার করে সারা জীবনের খাদ্যের যোগান পেতে। কিভাবে করে সেটা? তারা হুল ফুটিয়ে শুঁয়োপোকাকে প্যারালাইজড করে ফেলে এবং সেটার দেহের ভিতরে ডিম পাড়ে[170]। অর্থাৎ, শিকারকে সরাসরি হত্যা না করে দৈহিকভাবে অবশ করে দিয়ে সেই শিকারের দেহকে ব্যবহার করে প্রজন্ম তৈরিতে। এই ডিম ফুটে যে শূককীট বের হয়, তা শিকারের দেহের ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খেয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। স্ত্রী

---

[170] অভিজিৎ রায়, ভালবাসা কারে কয়, শুদ্ধস্বর, ২০১২

বোলতাগুলো তার শিকারের প্রত্যেকটি স্নায়ু গ্রন্থি সতর্কতার সাথে নষ্ট করে দেয় যাতে তাদের শিকার পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকে।

চিত্র : ইকনিউমেন প্রজাতির বোলতা শুঁয়োপোকাকে হুল ফুটিয়ে দৈহিকভাবে অবশ করে দিয়ে সেই শিকারের দেহের ভেতরে ডিম পাড়ে, আর তার দেহকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।

প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার এই নির্বিচারী উন্মাদনা দেখে সময় সময় বিচলিত হয়েছেন আস্তিক, নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, প্রকৃতিবাদী, মানবতাবাদী, সংশয়বাদী – সকলেই। বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স এই ইকনিউমেন প্রজাতির বোলতার উদাহরণটিকে তার *গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ* বইয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি রবিন উইলিয়ামসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'এই প্যারাসিটোয়েড বোলতাগুলোর নিষ্ঠুরতা দেখলেই বোঝা যায় যে পরম করুণাময় ঈশ্বরের মতো কোন পরিকল্পনাকারী দ্বারা এই মহাবিশ্ব তৈরি হলে তিনি একজন স্যাডিস্টিক বাস্টার্ড ছাড়া আর কিছু হবেন না'[171]। এই ঢালাও নিষ্ঠুরতা দেখে এক সময় বিচলিত হয়েছিলেন চার্লস ডারউইনও। তিনি প্যারাসিটোয়েড বোলতাগুলোর বীভৎসতা দেখে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন[172]

'আমি ভাবতেই পারিনা, একজন পরম করুণাময় এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কোন ঈশ্বর এইভাবে ডিজাইন করে তার সৃষ্টি তৈরি করেছেন যে, ইকনিউমেনগুলোর

---

[171] Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution, Free Press, 2009; p 370.

[172] Darwin's letter to Asa Gray, 22 Mary 1860 ; Quoted in Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth, পূর্বক্ত, p 370.

খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্য একটি জীবন্ত কিন্তু প্যারালাইজড শুঁয়োপোকার প্রয়োজন হয়'।

কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল, সেই ডারউইন থেকে আজকের দিনের রিচার্ড ডকিন্স সহ সকল বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীরা সবাই জানেন, এ ধরণের প্যারাসাইটিক সংক্রমণগুলো যথাক্রমে পিঁপড়া, ঘাসফড়িং কিংবা শুঁয়োপোকার জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হবার পরেও প্রকৃতিতে টিকে আছে বিবর্তনের নিয়ম মেনেই। কাজেই কোন কিছু ক্ষতিকর হবার মানে সে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফিল্টারে কাটা পড়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবেই, এই দিব্যি কেউ দিয়ে দেয়নি।

ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোও সমাজে টিকে আছে অনেকটা এভাবেই। এ বিশ্বাসগুলো কীভাবে প্যারাসাইটের মতো মানব মস্তিষ্ককে অধিগ্রহণ করে ফেলে, কীভাবে তার অনুসারীদের শুঁয়োপোকার মতোই পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলে, তার হাজারো উদাহরণ আমরা আমাদের চারপাশে তাকালেই দেখতে পাই। প্যারাসাইটিক ধর্মগুলো তার অনুসারীদের কাছ থেকে ইকনিউমেন প্যারাসিটোয়েড বোলতার মতোই যেন সবকিছু শুষে নেয়। দেখা যায় একটি বিশেষ ধর্মের অনুসারী বান্দারা তাদের আরাধ্য এই প্যারাসাইটিক ধর্মটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বহু কিছুই করে থাকে – দিনে একাধিকবার প্রার্থনা করা, প্রতি সপ্তাহে একবার হলেও উপাসনালয়ে যোগদান করা, যতদূর সম্ভব ধর্মীয় আইন-কানুন-রীতি-নীতি মেনে চলার চেষ্টা করা, পাশাপাশি অন্য ধর্মের সংক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঈমান শক্ত করা, বহু টাকা খরচ করে মন্দিরে পশুবলি বা কোরবানি দেয়া, মৃত্যুর আগে মক্কা, মদিনা, কাশী গয়া পুরীর মতো পূণ্যস্থানে ভ্রমণ করা, চারপাশে আর দশজনকেও একই ধারণায় সংক্রমিত করতে চেষ্টা করা ইত্যাদি। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, সায়েন্টোলজি, মরমন, জেহোভাস উইটনেস, হরেকৃষ্ণ, ইউনিফিকেশন চার্চ, ড্রুজ, ইয়াজাদি, অমিসসহ সকল ধর্ম এবং কাল্টই একই কায়দায় তাদের অনুসারীদের মস্তিষ্ককে সংক্রমিত করে।

বহির্সংক্রমণ

এই অনুচ্ছেদটা লিখতে গিয়ে এমন এক ঘটনার কথা মনে পড়ছে, যা না বললেই নয়। ১৮৬৯ সালে থমাস অস্টিন নামে এক ব্যক্তি এমন একটা জিনিস করলেন যা ইতিহাসে এখন পরিচিত হয়ে আছে চরম হঠকারী একটা কাজ হিসেবে। তার সেই কাজের মাশুল হিসেবে অস্ট্রেলিয়াকে এখন প্রতিবছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের স্তন্যপায়ী জীবদের আটভাগের এক ভাগ অস্টিন সাহেবের কাজের কারণে কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উদ্ভিদজগত যেভাবে ধ্বংস হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। ভূমির অবক্ষয় হয়েছে ভীষণ, জমির উর্বরাশক্তির উপর প্রভাব পড়েছে, প্রভাব পড়েছে জলবায়ুর উপরে। অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

সীমাহীন। ক্ষতির পরিমাণ এতোই বেশি যে সরকার এমনকি সবটুকু হিসেব করে উঠতেও পারেনি।

তা কী করেছিলেন থমাস অস্টিন? শুনলে খুব নিরীহ ব্যাপার বলে মনে হবে। তিনি তার বন্ধুকে দিয়ে জাহাজে করে বারো জোড়া অর্থাৎ চব্বিশটি খরগোশ আনিয়েছিলেন ইংল্যান্ড থেকে। থমাস সেই চব্বিশটি খরগোশ ১৮৫৯ সালের অক্টোবর মাসে খাঁচা খুলে উন্মুক্ত করে দেন।

কেন এ কাজ করলেন অস্টিন? কারণ হচ্ছে, অস্টিন আগে খুব শিকার করতে পছন্দ করতেন। অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসন নেবার পর থেকে শিকার করার আনন্দ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সেই আনন্দধারা আবার নিজের জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য এই খরগোশগুলো এতদূর পাড়ি দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, আর উঠোনে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ইংল্যান্ডের পুরনো দিনগুলো আবার বুঝি ফিরে আসবে – যে সময়টাতে তিনি মধ্যাহ্নভোজনের আগে বন্দুক নিয়ে বের হয়ে গোটা কয়েক খরগোশ শিকার করে বস্তাবন্দি করে ফিরতেন। সে কথা মনে করে ইংল্যান্ডে তার ভাগ্নেকে চিঠি লিখলেন, ইংল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় কিছু খরগোশের চালান আনা যায় কিনা।

সেই আনাই তার কাল হল। অস্ট্রেলিয়ায় এর আগে খরগোশ বলে কিছু ছিল না। ১৮৫৯ সালে মাত্র চব্বিশটা খরগোশ উঠোনে ছেড়ে দেবার পর, 'Breeding like rabbits' এর পুরনো উপমাকে সত্য প্রমাণিত করে দশ বছরের মধ্যে সারা অস্ট্রেলিয়া এমনভাবে খরগোশে ছেয়ে গেল যে এখন প্রতি বছর অস্ট্রেলীয় সরকারকে প্রায় বিশ লক্ষ খরগোশ মেরে ফেলতে হয়। খরগোশের জন্য নিত্যনৈমন্তিক ভূমি ক্ষয়, ফসলের ক্ষতি, অন্য প্রজাতির ধ্বংস এগুলো লেগেই আছে। সরকার খরগোশ মারার মিশন নিয়ে নামলেন। গুলি করে করে খরগোশ মেরে ফায়দা হচ্ছে না দেখে সরকার একসময় কৃত্রিমভাবে 'খরগোশের প্লেগ' তৈরি করলেন। ১৯৫০ সালে সরকারের তরফ থেকে বিধ্বংসী মাইক্সোমা ভাইরাস প্রবিষ্ট করে খরগোশের প্রজাতিতে মহামারী তৈরি করা হল। ১৯৯৬ সালে প্রযুক্ত হল ক্যালসিভাইরাস যেটাকে চলতি ভাষায় বলা হয় 'Rabbit hemorrhagic disease'। তাতেও কোন লাভ হয়নি। খরগোশের প্রজাতির বিস্তার এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে পরিবেশবিদরা রীতিমত শঙ্কিত। জীবজগতের সামগ্রিক ভারসাম্যই হুমকির মুখে।

অস্ট্রেলিয়ার খরগোশের উদাহরণটি জীবজগতের হাজারো উদাহরণের একটি – যেখানে 'এলিয়েন ইনভেশন' বা বহিস্থ সংক্রমণের ফলে আঞ্চলিক পরিবেশ প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে গেছে। এ ধরণের আরো অনেক উদাহরণ আছে। যেমন, ভূমধ্যসাগরীয় ফলের মাছির প্রকোপে হাওয়াই অঞ্চলের শস্যের বড় একটা অংশ বিলীন হয়ে যাওয়া, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কলার্পা শৈবালের প্রকোপে ভূমধ্যসাগরের পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন হওয়া, আমেরিকার হ্রদে রাশিয়ান জেব্রা ঝিনুক আশঙ্কাজনকভাবে ছড়িয়ে পড়া

প্রভৃতির কথা বলা যায়।

বিশ্বাসের ব্যাপারগুলোও তেমনি। যেভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত অঞ্চলে ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের বীজ প্রবিষ্ট করিয়ে জনগণকে বিশ্বাসের আওতায় আনা হয়েছে তা বহির্সংক্রমণ ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামের নবী মুহম্মদ জীবনের শেষ বছরগুলোতে নাখলার যুদ্ধ, বদরের যুদ্ধ, বানু কাইনুকা, বানু নাদির, বানু মুস্তালাক, আহজাব, বানু কোরাইজা, খাইবারের যুদ্ধ করেছিলেন, কিংবা পরবর্তী চার খলিফার নেতৃত্বে ওমান, ইয়েমেন, ইয়ামাহ, সিরিয়া, পারশিয়া, বাসরা, দামাস্কাস জেরুজালেম, মিশর, আজারবাইজান, সাইপ্রাস, বাইজেন্টাইন সিসিলি, কনস্টানটিপোল, উত্তর আফ্রিকা ফ্রান্স এবং স্পেন আক্রমণ করে সে সমস্ত জায়গাকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়েছে তা এক ধরণের বহির্সংক্রমণই বলা যায়। ভারতবর্ষেও মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল এভাবেই। এ প্রসঙ্গে গবেষক আবুল কাশেম মুক্তমনায় প্রকাশিত 'ইসলামে বর্বরতা' নামক প্রবন্ধে লেখেন[173] –

'মোহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুর দেবাল বন্দর জয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইসলামের শক্ত ও স্থায়ী ভিত্তি রচনা করে। বিখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ আল-বিরাদুরী লিখেছেন: 'দেবাল আক্রমণ করে সেখানে তিনদিন ধরে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালানো হয়; মন্দিরের যাজকদের সবাইকে হত্যা করা হয়।' কাসিম ১৭ বছরের অধিক বয়সী পুরুষদেরকে তলোয়ারের ডগায় হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাস বানায়। দেবালে কত লোককে বন্দি করা হয়েছিল সে সংখ্যা লিখিত হয়নি, তবে 'চাচনামা' থেকে জানা যায়, বন্দিদের মধ্যে ছিল মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণকারী ৭০০ রমণীও[174]। লুণ্ঠিত মালামাল ও ক্রীতদাসদের মধ্যে খলিফার এক-পঞ্চমাংশের হিস্যায় ছিল পঁচাত্তর জন কুমারী, যাদেরকে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশিষ্টদেরকে কাসিম তার সেনাদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়।

চাচনামা থেকে আরো জানা যায়, রাওয়ারে কাসিমের আক্রমণের সময় প্রায় ৩০,০০০ বন্দিকে ক্রীতদাস বানানো হয়, যাদের মধ্যে ছিল সেনাধ্যক্ষদের কন্যারা ও একজন ছিল রাজা দাহিরের বোনের মেয়ে।' বন্দি ও লুণ্ঠিত মালামালের এক-পঞ্চমাংশ হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করা হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ যখন মুসলিম আক্রমণে পতিত হয়, জানায় 'চাচনামা': ৮,০০০ থেকে ২৬,০০০ লোককে নিধন করা হয়; 'এক-পঞ্চমাংশ বন্দিকে আলাদা করে গণনা করা হলে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ হাজার; অবশিষ্টদেরকে যোদ্ধাদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়।' তার অর্থ দাঁড়ায়: এ আক্রমণে প্রায় ১০০,০০০ নারী ও শিশুকে ক্রীতদাস করা হয়েছিল।

---

[173] আবুল কাশেম, ইসলামে বর্বরতা (দাসত্ব-অধ্যায়—৩), মুক্তমনা, অক্টোবর ৬, ২০১১

[174] The Chach-Nama. English translation by Mirza Kalichbeg Fredunbeg. Delhi Reprint, 1979

খলিফার হিস্যা হিসেবে একবার প্রেরিত লুণ্ঠন দ্রব্য ও ক্রীতদাসদের মধ্যে ছিল ৩০,০০০ নারী ও শিশু এবং নিহত দাহিরের ছিন্ন মস্তক। সেসব বন্দির মধ্যে ছিল সিন্ধুর বিশিষ্ট মর্যাদাবান পরিবারের কিছু তরুণী কন্যা। হাজ্জাজ লুণ্ঠন দ্রব্য ও ক্রীতদাস বহনকারী বহর দামেস্কে খলিফা আল-ওয়ালিদের নিকট পাঠিয়ে দেন। 'সে সময়ের খলিফা যখন চিঠিটি পড়েন', লিখেছে চাচনামা: 'তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা করেন। তিনি সেনাধ্যক্ষদের কন্যাদের কিছুকে বিক্রি করে দেন এবং কিছু উপহার হিসেবে প্রদান করেন। তিনি রাজা দাহিরের ভগ্নির কন্যাদেরকে যখন দেখেন, তাদের সৌন্দর্য ও মনোহর রূপে এতই অভিভূত হন যে, হতবাক হয়ে আঙ্গুল কামড়াতে থাকেন।'

আল-বিলাদুরী লিখেছেন, মুলতান আক্রমণে বন্দি হওয়া লোকদের মধ্যে 'মন্দিরের পুরোহিতদের সংখ্যাই ছিল ৬ হাজার'। এ সংখ্যাটি আমাদেরকে একটা ধারণা দিতে পারে মুলতান আক্রমণে মোট কত সংখ্যক নারী ও শিশুকে ক্রীতদাস করা হয়েছিল। কাসিম একই রকমের অভিযান চালিয়েছিল সেহওয়ান ও ধালিলায়। সংক্ষিপ্ত তিন বছরের (৭১২-১৫) নেহাতই ছোট কৃতিত্বে কাসিম সম্ভবত সর্বমোট তিন লাখের মতো লোককে ক্রীতদাস বানিয়েছিল'।

ইসলামের এই আগ্রাসনের মতোই খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরাও একই কায়দায় সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের বিশ্বাসের সংক্রমণ ঘটিয়েছিল। মার্টিন লুথারের খ্রিস্টীয় ভাইরাস ১৫০০ সালের দিকে জার্মানির অশিক্ষিত, কুশিক্ষিত এবং অজ্ঞ জনগণের মধ্যে সস্তা জনপ্রিয়তা পেয়ে ভাইরাসের মতোই ছড়িয়ে গিয়েছিল। লুথারের এই প্রটেস্টান্ট ভাইরাস এতোই শক্তিশালী ছিল যে তার সংক্রমণ আগেকার ক্যাথলিক ভাইরাসের সংক্রমণকে পর্যুদস্ত করে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ইউরোপের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই 'সংক্রমণ' যে সবসময় শান্তিপূর্ণ ছিল তা নয়। সে সময় ত্রিশ বছরের সহিংসতা ইতিহাসের সমস্ত হত্যাযজ্ঞকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ১৬১৮ সালে লুথারের অনুসারী প্রটেস্টান্ট নেতারা প্রাগের দুইজন ক্যাথলিক মিশনারিকে জানালা দিয়ে বিল্ডিং এর বাইরে ফেলে দেয়। এর পর থেকে ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টান্টদের মধ্যে সহিংসতা জার্মানি থেকে শুরু করে স্পেন, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফ্রান্স এবং ইতালি সহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

সুইডেনের প্রটেস্টান্ট সৈনিকেরা লুথারের 'Ein 'Feste Burg' (আমাদের ঈশ্বরই আমাদের দুর্গ) ধ্বনি দিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিল। তিন দশক পরে মধ্য ইউরোপ যেন মৃতদেহের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছিল। একটা পরিসংখ্যানে দেখা যায় জার্মানির জনসংখ্যা এই সহিংসতার কারণে ১ কোটি আশি লক্ষ থেকে কমে চল্লিশ লাখে নেমে এসেছিল। ক্যালভিনিস্ট ভাইরাস ছিল আবার লুথেরান ভাইরাসের মিউটেশন। এরকম আরো অনেক মিউটেশন তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টধর্ম থেকে, তারা সবাই নিজেদের

অনুগামীদের সাহায্যে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল একে অপরের সাথে[175]।

অন্যদিকে ভারতবর্ষে একটা সময় আবার হিন্দু ধর্মের মিউটেশনে তৈরি হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম যা খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৮০ শতক পর্যন্ত শীর্ষ ভাইরাস হিসেবে পরিচালিত হয়েছিল। পরে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ভাইরাসের দাপটে ভারতবর্ষ থেকে প্রায় বিতাড়িত হতে হয় বৌদ্ধদের। শুধু হিন্দুরাই নয়, পরবর্তীকালে বখতিয়ার খিলজি সহ মুসলিম জিহাদি ভাইরাসের হাতে নালন্দা বিদ্যানিকেতন ধ্বংস হওয়াও বৌদ্ধধর্মের বিলীন হবার পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

সিকেল সেল অ্যানিমিয়া: ক্ষতিকর প্রকরণ কীভাবে টিকে থাকে

ওয়াল্টার ক্লেমেন্ট নোয়েল ১৮৮৪ সালে গ্রেনেডা দ্বীপপুঞ্জে জন্মেছিলেন। আফ্রিকান বংশোদ্ভূত এই ব্যক্তি পরিণত বয়সে আমেরিকা চলে আসেন। তিনি যখন আমেরিকা এসেছিলেন, সে সময় কালো মানুষদের নানা ধরণের সামাজিক বৈষম্যের শিকার হতে হত। খুব কমই সুযোগ পেতেন সাদাদের সাথে মিলে একাডেমিয়ায় এবং অন্যত্র একসাথে কাজ করার। কিন্তু নোয়েল ছিলেন সেই বিরল সংখ্যালঘু মানুষদের অন্যতম। নোয়েলের শিক্ষা, কর্মদক্ষতা এবং তার মেধার প্রতিদান হিসেবে 'শিকাগো কলেজ অব ডেন্টাল সার্জারি' তে যোগ দিলেন ১৯০৪ সালে।

কিন্তু আমেরিকান বিদ্যায়তনে যোগদানের পর নোয়েল যে খুব সুখে ছিলেন তা নয়। কারণ তার সদা ভঙ্গুর স্বাস্থ্য। তার মাথা ব্যথা, গাঁটে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট সহ একগাদা সমস্যা লেগেই ছিল।

তিনি হাসপাতালে জেমস বি হেনরিক নামে এক নামকরা চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা শুরু করেন। তার রক্তের নমুনা পর্যবেক্ষণ করে ডাক্তার সাহেব এক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলেন। তার রক্তকণিকাগুলোর আকার গোলাকার না হয়ে কেমন যেন চিকন কাস্তের মত দেখতে। এই ধরণের ঘটনা ডাক্তারবাবুর জন্য নতুন। এর মধ্যে নোয়েল বেশ কয়েকবারই 'মাংসপেশির খিঁচুনি' এবং 'বিলিয়াস অ্যাটাক'-এ ভুগে প্রেসবেটেরিয়ান হাসপাতালে ভর্তি হলেন। কিন্তু কেন এগুলো হচ্ছে তার খুব একটা কুল কিনারা করতে পারছেন না ডাক্তারেরা।

ওয়াল্টার ক্লেমেন্ট নোয়েল ১৯০৭ সালে ডেন্টাল স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট হন, এবং সেন্ট জর্জ সিটিতে প্রফেশনাল দন্ত-চিকিৎসক হিসেবে কাজ শুরু করেন। কিন্তু নোয়েলের স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে তার জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অবশেষে ১৯১৬ সালে মাত্র ৩২ বছর বয়সে নোয়েলকে মারা যেতে হয়। যদিও তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে সেসময় লেখা হয়েছিল 'আনডিটেকটেড পালমোনারি হাইপারটেনশন' এখন

---

[175] James A. Haught, Holy Horrors: An Illustrated History of Religious Murder and Madness, Prometheus Books, 1990

সবাই জানে, নোয়েল আসলে ছিলেন আমেরিকার 'প্রথম সিকেল সেল অ্যানিমিয়া রোগী'।

সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার ব্যাপারটা আসলে অনেকদিন ধরেই বিজ্ঞানীদের কাছে 'ধাঁধার মত' ছিল। এটা একধরণের ত্রুটিপূর্ণ হিমগ্লোবিনজনিত রোগ, আফ্রিকার ম্যালেরিয়া-প্রবণ অঞ্চলে টিকে আছে কারণ, বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার রোগীরা সুস্থ কোষের চেয়ে একটু বেশি ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে সক্ষম। আফ্রিকার যে অঞ্চলগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি, সেসমস্ত জায়গাগুলোতেই সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার রোগী অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে। কোন একসময় মিউটেশনের ফলে আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে এই বিকৃত রোগের উৎসের জিনটা ছড়িয়ে পড়েছিলো। প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম মেনে দেখা গেলো, যে অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী সেখানে সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার একটা জিন ধারণকারী লোকের টিকে থাকার ক্ষমতাও বেড়ে যাচ্ছে, কারণ হিমোগ্লোবিনের এই রোগ বহনকারী জিন ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধে বেশী কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে। অন্যদিকে যাদের মধ্যে দু'টিই সুস্থ জিন রয়েছে তারা ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে অনেক বেশী হারে। সেজন্যই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম মেনে এখানে এই ত্রুটিপূর্ণ জিন বহনকারী মানুষগুলোই শেষ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া রোগের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে বেশীদিন টিকে থাকতে পারছে এবং বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। এই টিকে থাকার দায়েই শত শত প্রজন্ম পরে দেখা গেলো আফ্রিকাবাসীদের একটা বিশাল অংশের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে বিকৃত সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার জিন। বিবর্তনের মাথায় কিন্তু সিকেল সেল অ্যানিমিয়াকে রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা আগে থেকে ছিলো না। এটা স্রেফ টিকে গেছে আফ্রিকায় ম্যালেরিয়ার উপদ্রবের কারণেই। নোয়েল ছিলেন এমনই একজন সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার রোগ বহনকারী। এই রোগ থাকার কারণে তার দেহ আফ্রিকায় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে সক্ষম ছিল, কিন্তু আমেরিকায় এসে অপরিণত বয়সে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

কাজেই জেনেটিক ট্রেইট খারাপ বা ভাল – দুইই হতে পারে। জিনের 'সারভাইভাল' বা উদ্বর্তন নির্ভর করে 'নীট' বা সামগ্রিক ফলাফলের উপর – কেবল যে কোন এক দিকের ভাল বা খারাপ ফলাফলের উপর নয়। সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার উপযোগিতা পাওয়া যায় যখন কোন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বিদ্যমান থাকে। এর ফলে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে হয়তো বাঁচা যায়, কিন্তু সেটা আবার রোগজনিত কষ্টভোগ এবং অকাল প্রয়াণের মাধ্যমে অনেকটাই প্রশমিত হয়ে যায়।

ধর্মের এই টিকে থাকাও অনেকটা সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার মতোই পরিস্থিতি নির্ভর হতে পারে। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে এক ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে আরেক বিশ্বাসের জন্ম হতে পারে এবং ছড়িয়ে পড়তে পারে দ্রুত গতিতে।

এগুলো সমাজে টিকে থাকতে পারে এমনকি এদের ট্রেইট খারাপ প্রমাণিত হবার পরেও।

ধর্ম তাহলে কীভাবে টিকে আছে?

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বেকি গ্যারিসনের 'ধর্ম যদি ক্ষতিকারক হলে টিকে আছে কি করে?' এই বিখ্যাত ধাঁধাটির অন্তত পাঁচটি সমাধান দেখতে পাচ্ছি:

১) বিবর্তন কাজ করে ব্যক্তির জিনের উপর, সমষ্টির উপরে নয়। ফলে সমষ্টির জন্য আপাত ক্ষতিকারক অনেক বৈশিষ্ট্যই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বাতিল না হয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা দিতে গিয়ে টিকে থাকতে পারে।

২) প্যারাসাইটগুলো মস্তিষ্ক এবং দেহের জৈবিক প্রক্রিয়ার দখল নিয়ে নিতে পারে, যদিও তাদের উদ্ভব হয়তো একটা সময় ঘটেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রয়োজনে।

৩) জিন কিংবা মিমের বহির্সংক্রমণ ঘটতে পারে এবং যে কোন সময় আঞ্চলিক পরিবেশের কিংবা মানস-কাঠামোর ধ্বংসসাধন ঘটতে পারে।

৪) জিন কিংবা মিমের ভাল কিংবা মন্দ বৈশিষ্ট্য পরিস্থিতিভেদে বিলুপ্ত হতে পারে কিংবা সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার মতো টিকে থাকতে পারে।

এবং সর্বোপরি –

৫) ধর্মীয় বিশ্বাস বিলুপ্ত না হয়ে টিকে থাকে, কারণ এগুলো আসলে ভাইরাস।

ভাইরাসের মতোই এরা দেহকোষ কিংবা মস্তিষ্কের দখল নিতে পারে, এবং পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এক হোস্ট থেকে অন্য হোস্টে। একটি ভাইরাস যখন কোথাও সংক্রমণ ঘটায় তখন যেমন কখনো চিন্তা করে না একটি দেহের জৈব রাসায়নিক উপাদান কত সুষম বা সুন্দর, কিংবা কখনোই ভেবে দেখে না সে মোটা দাগে জীবদেহের, সমাজের কিংবা পরিবেশের ক্ষতি করছে না উপকার, সে কেবল ওটাকে ব্যবহার করে যেতে থাকে। মানব মনে প্রোথিত বিশ্বাসগুলোও তেমনি। যদিও ধর্ম বর্তমান এবং আগামী সভ্যতার জন্য এক ধরণের বোঝা কিংবা অভিশাপের মতো হয়ে উঠেছে, কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য ক্ষতিকর হলেও এটা টিকে থাকতে পারে চিরায়ত বিবর্তনের নিয়ম মেনেই। ভাইরাস বা প্যারাসাইটগুলো যেভাবে প্রকৃতিতে টিকে থাকে।

অ ষ্ট ম অ ধ্যা য়
ভাইরাস থেকে মুক্তি

২০০৮ সালের একটি ঘটনা। আমি তখন সবেমাত্র সিঙ্গাপুরের পাট চুকিয়ে আমেরিকা এসে বসেছি। একটি খবর দাবানলের মতো আমেরিকার পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে পড়ল। উইসকনসিনের এক দম্পতি বাইবেলের উপর আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস রাখতে গিয়ে নিজের মেয়েকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

ঘটনাটা এরকমের। মেডেলিন কারা নিউম্যান নামের ১১ বছরের এক কিশোরী। একটা কিশোরীর যা কিছু থাকার কথা সবই ছিল কারার। চপলতা, কপট গাম্ভীর্য, দুষ্টুমি, পড়াশুনা, খেলাধুলা থেকে ঢেউ খেলানো চুলের মাঝে বেণী করার ইচ্ছা – সবই। কিন্তু তারপরেও একটা জায়গায় একটু সমস্যা ছিল। ডায়াবেটিসের সমস্যা। সাধারণত এই বয়সে ডায়াবেটিস হবার কথা নয়, কিন্তু কারার সেটা ছিল। আমেরিকায় প্রতি চারশো জন শিশুর একজন এ ধরণের ডায়াবেটিস থাকে। প্রচলিতভাবে একে বলে 'আনডায়াগনোসড ডায়াবেটিস'। কিন্তু এটা কোন জীবন ঝুঁকি তৈরি করে না, যদি সঠিক চিকিৎসা নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ মত চলা যায়। কারার ক্ষেত্রেও ভিন্ন কিছু হবার কথা ছিল না, যদি তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু সেটা হয়নি। কারণ, কারার বাবা মা ছিলেন খ্রিস্টধর্মে প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাসী দুজন মানুষ। তারা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার চেয়ে প্রার্থনাকেই পছন্দনীয় বলে মনে করলেন। তাদের বিশ্বাস ছিল, কেবল প্রার্থনার মাধ্যমে যে কোন রোগীকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করে দেয়া সম্ভব।

কারার বাবা নিজেও একটা সময় খ্রিস্টধর্মের পেন্টেকোস্টাল মিনিস্টার হিসেবে কাজ করেছিলেন, এবং তিনি অন্য সব বাবা মার মতোই তার কন্যাকে অনেক ভালবাসতেন। তিনি কখনোই চাননি তার কন্যা মারা যাক। বরং তিনি সবসময়ই ভেবেছেন তার কন্যার মাথায় একটু তেল মালিশ করে যীশুর কাছে প্রার্থনা করলে যীশু তার কথা শুনবেন এবং তার মেয়েকে সুস্থ করে দেবেন। না বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই; বাইবেল যে সাক্ষ্য দিচ্ছে –

> 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি অসুস্থ হয়েছে? তবে সে মণ্ডলীর প্রাচীনদের ডাকুক। তারা প্রভুর নামে তার মাথায় একটু তেল দিয়ে তার জন্য প্রার্থনা করুক। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা সেই অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করবে, প্রভুই তাকে সুস্থতা দেবেন'। (বাইবেল, যাকোবের পত্র, ০৫:১৪ –১৫)

কারার বাবা কারার জন্য কেবল মাথায় তেল দিয়ে প্রার্থনা করে গেছেন, এমনকি তার কন্যার ওজন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, উদ্দীপনা কমে যাচ্ছে, ঘন ঘন তৃষ্ণা পাচ্ছে, অবসাদ এসে গ্রাস করেছে, এমনকি মাঝে মধ্যে চোখে অন্ধকার পর্যন্ত দেখেছে – এগুলো দেখেও গা করেননি। যে কোন ডাক্তারই এই সমস্ত লক্ষণ দেখে এক মিনিটের মধ্যেই বুঝে যেত যে মেয়েটার সম্ভবত ডায়াবেটিস আছে। একটা সময় কারা এতোই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, হাটা চলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এমনকি কথাও। তারপরেও তার অভিভাবকেরা ডাক্তারের কাছে নেয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি। তাদের চোখের সামনেই মেডেলিন কারা নিউম্যান মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। দিনটি ছিল ২০০৮ সালের মার্চ মাসের ২৩ তারিখ।

মৃত্যুর পর কারার অভিভাবকদের অভিযুক্ত করা হয় সন্তানকে অবহেলা এবং হত্যার অভিযোগে। মামলা চলাকালীন সময়ে কারার বাবা ডেল নিউম্যান আদালতে দাঁড়িয়ে নিরুত্তাপ গলায় বলেন – 'প্রার্থনা বাদ দিয়ে রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়াকে আমি ঠিক মনে করি না। এটা করলে ডাক্তারকে খোদার উপর খোদকারি করার অধিকার দেয়া হয়'।

'বিশ্বাসের ভাইরাস' মনকে কতটা আচ্ছন্ন করে ফেললে কোন বাবা এভাবে চিন্তা করতে পারে কে জানে। ছেলে মেয়ে অসুস্থ হলে বাবা মা প্রথমেই ভাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর ডেল নিউম্যানের মনে হয়েছিল এটা 'খোদার উপর খোদকারি'র মতন। ডাক্তারের কাছে না নিয়ে কারার অভিভাবকেরা শরণাপন্ন হয়েছিলেন এক ওঝার। ওঝা আর কেউ নয়, তার এক প্রিয় চার্চের প্রতিষ্ঠাতা ফাদার – ডেভিড ইলস। ইলস তার লেখা থেকে উদ্ধৃত করে শোনালেন,

> 'যীশু কখনোই কাউকে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে পাঠাননি। যীশু কেবল একটি মাধ্যমেই সকলের চিকিৎসা করেছেন। সেটা হচ্ছে বিশ্বাসের মাধ্যমে–হিলিং বাই ফেইথ'।

এই স্টেটমেন্ট চার্চের ওয়েবসাইটেও একসময় লেখা ছিল। নিউম্যান দম্পতি প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির স্মরণ না নিয়ে প্রার্থনা করায় যে ঈশ্বরের কত ভালবাসার পাত্র হয়েছেন তার উল্লেখ ছিল সেখানে। অবশ্য আমরা এখন জানি সেই ভালবাসার প্রতিদান। ভালবাসার চোটে কারাকে একেবারে বিনা চিকিৎসায় পরপারেই চলে যেতে হয়েছে। কারার মৃত্যুর পর ডেভিড ইলস ঈশ্বরের ভালবাসার 'প্রমাণ'গুলো সাইট থেকে গায়েব করে দিয়েছিলেন।

আদালতে কারা নিউম্যানের পিতা মাতা দ্বিতীয় মাত্রার হঠকারী নরহত্যার দায়ে (second degree reckless homicide) অভিযুক্ত হন। তাদের ২৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারত, কিন্তু আইন কানুনের জটিলতা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিবেচনায় বিচারে বাবা মা দুজনকেই শেষপর্যন্ত ১০ বছরের প্রবেশন এবং ৬ বছর ধরে ৬ মাস করে কারাদণ্ড ভোগ করার বিধান দেয়া হয়।

সাধারণত অপরাধ করলে মানুষের অনুতাপ আসে। কিন্তু কারার বাবা মা ছিলেন দুজনই অনুতাপহীন। কারণ বাইবেল নামক 'বিশ্বাসের ভাইরাসে' তাদের মন ছিল সংক্রমিত। অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য ঠিক কি করতে হবে, বাইবেল এ ব্যাপারে খুব স্পষ্ট – 'যদি বিশ্বাস থাকে, তবে প্রার্থনায় তোমরা যা চাইবে তা পাবে।' (মথি ২১:২২)। লক্ষ্য করুন – এখনে বলা হয়নি, 'হয়তো' কিংবা 'মাঝে সাঝে' কিংবা 'যদি ঈশ্বর চান'। বরং 'বিশ্বাস থাকলে প্রার্থনা করলেই সব পাওয়া যাবে' – এটাই বাইবেলের এ শ্লোকের বক্তব্য। উপরে যাকোবের পত্র এবং মথি সহ বাইবেলের শ্লোকের সত্যতা সম্বন্ধে কারার বাবা মা – ডেল এবং লেইলানি নিউম্যান এতোটাই নিঃসন্দেহ ছিলেন যে সেগুলো নিয়ে ন্যূনতম সংশয় করেননি। নিউম্যান দম্পতি সত্যই বিশ্বাস করেছিলেন যে প্রার্থনা করলে ঈশ্বর সাড়া দেবেন, এবং মেয়েকে সুস্থ করে দেবেন। যীশু নিজেও অলৌকিক উপায়ে বহু অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত কিংবা পক্ষাঘাতগ্রস্তকে সুস্থ করে দিয়েছেন (মার্ক ৮:২২ –২৬, মথি ৮:১ –৪, মার্ক ১:৪০ –৪৫, মথি ৯:১ –৮ ইত্যাদি), কারার ক্ষেত্রেই বা হবে না কেন।

বাইবেলে বর্ণিত অন্যান্য যে শ্লোকগুলো ডেল এবং লেইলানি নিউম্যানকে প্রভাবিত করেছিল, তার মধ্যে –

> 'চাইতে থাক, তোমাদের দেওয়া হবে। খুঁজতে থাক, পাবে। দরজায় ধাক্কা দিতে থাক, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। কারণ যে চাইতে থাকে সে পায়, যে খুঁজতে থাকে সে খুঁজে পায়, আর যে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়' (মথি ৭:৭ –৮, যীশুর উপদেশ)।

কিংবা –

> 'তোমরা মন্দ হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জানো, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের কাছে যাঁরা চায়, তাদের তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট জিনিস দেবেন' (মথি ৭:১১, যীশু সুবর্ণ উপদেশ দেওয়ার ঠিক আগেকার বক্তব্য)।

অথবা –

> 'আমি তোমাদের আবার বলছি, পৃথিবীতে তোমাদের মধ্যে দুজন যদি একমত হয়ে কোন বিষয় নিয়ে প্রার্থনা কর, তবে আমার স্বর্গের পিতা তাদের জন্য তা পূরণ করবেন' (মথি ১৮:১৯)।

এ ধরণের অসংখ্য বাইবেলের আয়াত থেকে নিউম্যান দম্পতি নির্দেশনা পেয়েছিলেন যে, প্রার্থনায় সত্যই সুস্থ হয়ে উঠে অসুস্থ রোগী। যীশু উপদেশ দিয়েছেন সবাইকে প্রার্থনা করার, কেবল প্রার্থনা করলেই তিনি শুনবেন, ডাক্তারের কাছে গেলে নয় –

> 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, আমি যে কাজই করি না কেন, সেও তা করবে, বলতে কি সে এর থেকেও মহান মহান কাজ করবে,

> কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। আর তোমরা আমার নামে যা কিছু চাইবে, আমি তা পূর্ণ করব, যেন পিতা পুত্রের দ্বারা মহিমান্বিত হন। তোমরা যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু চাও, আমি তা পূর্ণ করব' (যোহন ১৪:১২ –১৪)।

এখানে কোন 'আউট অফ কন্টেক্সট' কিংবা 'মিসইন্টারপ্রিটেশনের' সুযোগ নেই। যীশু বলছেন, 'যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু চাও, আমি তা পূর্ণ করব'। খুব সোজাসাপ্টা কথা। যীশু নিজে বহু সময়েই অসুস্থকে সুস্থ করেছেন। তার কাছে প্রার্থনা করলে আপনিও অসুস্থকে সুস্থ করতে পারবেন।

বাইবেল থেকে জানা যায়, যীশু একবার বৈথনিযা ছেড়ে আসার সময় একটা ডুমুর (ফিগ) গাছকে অভিসম্পাত করেছিলেন, কারণ তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন, কিন্তু গাছটি ফলবতী ছিল না সেসময়। যীশু অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, 'এখন থেকে তোমার ফল আর কেউ কোন দিন খেতে পারবে না!'। পরদিন তার শিষ্যরা গাছটির কাছে গিয়ে দেখল ডুমুর গাছটি মূল থেকে শুকিয়ে গেছে। শিষ্যরা অবাক হয়ে তাকে এই অলৌকিক ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, যীশু বললেন,

> 'ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ! আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কেউ যদি ঐ পাহাড়কে বলে, 'উপরে যাও এবং সমুদ্রে গিয়ে পড়,' আর তার মনে কোন সন্দেহ না থাকে এবং সে যদি বিশ্বাস করে যে সে যা বলছে তা হবে, তাহলে ঈশ্বর তার জন্য তাই করবেন। এইজন্য আমি তোমাদের বলি, তোমরা যা কিছুর জন্য প্রার্থনা কর, যদি বিশ্বাস কর যে, তোমরা তা পেয়েছ, তাহলে তোমাদের জন্য তা হবেই (মার্ক, ১১:২২ –২৪)।

এখন কথা হচ্ছে বাইবেল সত্য হলে কারাকে মৃত্যুবরণ করতে হল কেন? যেখানে বাইবেলের ছত্রে ছত্রে বিশ্বাসের মাধ্যমে অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করার 'প্রমাণ' আছে, কেন ঈশ্বর কারার বিশ্বাসী বাবা মার ডাকে সারা দিয়ে তাদের সন্তানকে সুস্থ করে তুললেন না? আমার মত সংশয়বাদীরা বলবেন, এর একটা বড় কারণ, প্রার্থনা আসলে কোন কাজে আসে না। মুক্তমনার একসময়কার মডারেটর ফরিদ আহমেদ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে?' শিরোনামে। লেখাটি মুক্তমনার বহুল আলোচিত 'বিজ্ঞান ও ধর্ম – সংঘাত নাকি সমন্বয়?' শিরোনামের গ্রন্থটির অনলাইন সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। প্রবন্ধটি তিনি শুরু করেছিলেন আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহম্মদ এরশাদের সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ করে[176] –

'অনেকেরই স্বৈরাচারী এরশাদের সময়কার একটা বিশেষ ঘটনার কথা মনে থাকার কথা। সন তারিখ অবশ্য খুব ভাল করে মনে নেই আমার। তবে এইটুকু মনে

---

[176] ফরিদ আহমেদ, প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে? 'বিজ্ঞান ও ধর্ম – সংঘাত নাকি সমন্বয়?', মুক্তমনা ইবুক, ২০০৮

আছে যে, বাংলাদেশে তখন বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠের ভয়াবহ দাবদাহ। খরায় পুড়ছে সারাদেশ। বৃষ্টির নাম নিশানাও নেই অনেকদিন ধরে। আল্লাহ প্রেমিক এরশাদ বেশ ঘটা করে একদিন ঢাক ঢোল পিটিয়ে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ইসতিশকা নামাজ (বৃষ্টির জন্যে এই নামাজ পড়া হয়) পড়ার ঘোষণা দিল। নির্দিষ্ট দিনে সকালের দিকে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে সেই নামাজ পড়াও হলো। আর কি আশ্চর্য! দুপুর গড়াতে না গড়াতেই কাল বৈশাখীর ঝড় হয়ে বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়লো ঢাকাসহ মোটামুটি প্রায় সারা দেশে। এরশাদ যে আল্লাহর খুব পেয়ারের বান্দা এবং খোদা যে মুমিন মুসলমানের ডাকে সাড়া দেন সে ব্যাপারে মানুষের আর কোন সন্দেহই রইলো না। দুর্মুখেরা অবশ্য বলে থাকেন যে আবহাওয়া অফিস থেকে ওইদিন বিকালে বৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনার পূর্বাভাস পেয়েই এরশাদ জনগণকে নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। অনেকে হয়তো ভাবছেন বাংলাদেশের মত অশিক্ষিত এবং ধর্মভীরু মানুষের দেশে এটাইতো স্বাভাবিক। তাদের জন্য বলছি, এ ধরণের অন্ধবিশ্বাস শুধুমাত্র যে শুধুমাত্র আমাদের মতো পশ্চাৎপদ দেশেই রয়েছে তা কিন্তু নয়। এই সেদিনও পোলিশ পার্লামেন্টে যখন সরকারী দলের পক্ষ থেকে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করার প্রস্তাব করা হয় তখন পার্লামেন্টে বেশ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, সত্যি সত্যিই বিশ জনেরও বেশী এমপি সংসদীয় চ্যাপেলে ঈশ্বরের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছিল। যারা এই ঘটনাকে কৌতুক হিসাবে নিয়ে বেশ মজা পাচ্ছেন তাদের জন্য তথ্য হচ্ছে পোল্যান্ড ক্যাথলিক দেশ এবং প্রয়াত পোপ দ্বিতীয় জন পল ক্যাথলিকদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন 'তৃষ্ণার্ত ধরিত্রীকে বৃষ্টির সুশীতল পরশ দেওয়ার জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট আকুল অনুরোধ করতে।'

স্বাস্থ্য, নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা, ভাল রেজাল্ট, চাকুরীর প্রমোশন, বিত্ত বা আরো বৃহৎ কোন লক্ষ্য যেমন বিশ্ব শান্তি ও মানব জাতির দুর্দশার অবসান ইত্যাদি হাজারো নানান বিষয়ে প্রতিদিন মানুষ সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করে থাকে। প্রার্থনা যে সবসময় ভাল কিছুর জন্যই করা হবে তা কিন্তু নয়। খারাপ উদ্দেশ্যেও প্রার্থনা করা হতে পারে। কেউ কেউ দেখা যায় চুরি চোট্টামি, ডাকাতি, প্রতারণা, ধান্ধাবাজি বা ভয়ংকর প্রতিশোধের জন্যও 'ঈশ্বরের' হস্তক্ষেপ কামনা করে থাকে'।

ফরিদ আহমেদ ভুল বলেননি। প্রার্থনা বর্তমানে সারাবিশ্বে যেন এক 'নয়া কুটির শিল্পে' পরিণত হয়েছে যেন। প্রার্থনার ফলে রোগ নিরাময় হয়ে যায় — এই ভ্রান্ত ধারণার উপর নামী দামী সব জার্নালে অসংখ্য তথাকথিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ছাপার কথা বলা হয় মিডিয়ায়। গত দশ বছরে 'প্রার্থনার সাহায্যে অনেক জটিল রোগীদের নিরাময় করা গিয়েছে' ধরণের দাবী সম্বলিত কমপক্ষে আধ ডজন বই বেস্ট-সেলারের তালিকায় উঠেছে। নিউজ উইকের মত আরো অনেক ম্যাগাজিনের কভার স্টোরিও হয়েছে এই বিষয়কে নিয়ে। ডেটলাইন এনবিসি-র মত টেলিভিশনের কোন

কোন প্রোগ্রামের পুরোটাই প্রার্থনাকে কেন্দ্র করে হয়েছে। বিশেষ করে চিকিৎসক ল্যারি ডোসি তার 'Prayer is Good Medicine: How to Reap the Healing Benefits of Prayer' এবং 'Healing Words: The Power of Prayer and Practice of Medicine' প্রভৃতি ছদ্মবৈজ্ঞানিক বইয়ে প্রার্থনা যে রোগ নিরাময়ে দারুণভাবে কাজ করে তার অনেক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে – এই ধারণাকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করতে যেন উঠে পড়ে লেগেছেন।

কিন্তু আদৌ কি প্রার্থনা কি কাজ করে? আসলে প্রার্থনা কাজ করার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ তো পাওয়া যায়ই নি, বরং কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সম্পূর্ণ উলটো ফলাফল বেরিয়ে এসেছে। যেমন, ডিউক ইউনিভার্সিটির চিকিৎসকদের তিন বছর ধরে পরিচালিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ফলদায়ক প্রার্থনার প্রভাব যাচাইয়ের জন্য আমেরিকার নয়টি হাসপাতালের ৭৪৮ জন রোগীর উপর গবেষণা চালানো হয়। লে এবং মোনাস্টিক ক্রিশ্চিয়ান, সুফি মুসলিম এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ সারা বিশ্বের বারোটি প্রার্থনা গ্রুপ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রার্থনা ই-মেইলের মাধ্যমে জেরুজালেমেও পাঠানো হয়েছিল। করোনারি আর্টারি অবস্ট্রাকসনের রুগীদের কম্প্যুটারের সাহায্যে এলোপাথাড়ি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয় এবং বারোটি প্রার্থনা গ্রুপের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গ্রুপগুলো রোগীদের সম্পূর্ণ আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করে। এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ছিল দ্বৈত অন্ধ (Double blind)। হাসপাতালের স্টাফ বা রোগী কেউই জানতো না কার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। *The Lancet* জার্নালে প্রকাশিত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, দুই গ্রুপের নিরাময় হওয়া এবং স্বাস্থ্যের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ কোন পার্থক্য নেই।

একই রকম আরেকটা স্টাডি হয়েছিল হার্ভার্ড এবং মায়ো ক্লিনিকের তত্ত্বাবধানে – যেটা 'স্টেপ স্টাডি' নামে পরিচিত। ১৮০২ জন রোগীর উপর পরীক্ষার ফলাফল আরো চমকপ্রদ। স্টেপ স্টাডি থেকে পাওয়া ফলাফলে দেখা গেছে, প্রার্থনা তো কোন কাজে আসেই না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রার্থনা বরং মানসিক উদ্বেগ বড়িয়ে তোলে। যাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে, দেখা গিয়েছিলো পরবর্তীতে তাদের অনেকেরই শারীরিক অবস্থার অবনমন ঘটেছে। এটা কেন হল গবেষকেরা হলফ করে বলতে পারেননি, তবে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসেবে তারা বলেছেন, 'যে সমস্ত রোগী জানতে পেরেছে যে তাদের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, তারা ভেবে নিয়েছে তাদের অবস্থা এতোটাই গুরুতর যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রার্থনার দরকার পড়ছে। ফলে তাদের মধ্যে উদ্বেগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, আর সেই সাথে ঘটেছে শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি'[177]। তবে 'নেগেটিভ' ফলাফলের

---

[177] Herbert Benson MD et al, Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer (STEP) in Cardiac Bypass Patients – A Multi-Center Randomized Trial of Uncertainty and Certainty of Receiving Intercessory

ব্যাপারটা যদি আমরা বাদও দেই এটা নিশ্চিত, প্রার্থনার কোন সুপ্রভাব নেই, অন্তত নিরপেক্ষ গবেষণায় তা পাওয়া যায়নি।

আর রোগাক্রান্ত রোগীকে ডাক্তারের কাছে না নিয়ে কেবল প্রার্থনা করলে কি দুর্ভোগ রোগী এবং পরিবারের জন্য বয়ে আনতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কিশোরী মেডেলিন কারা নিউম্যান নিজের জীবন দিয়ে সেটা আমাদের দেখিয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও আমাদের চারিদিকের বিশ্বাসের ভাইরাসাক্রান্ত মন অনেক সময়েই সেটা বুঝতে সক্ষম হয় না।

বিশ্বাসের কি আদৌ দরকার আছে?

অনেকেই মনে করেন বিশ্বাস না থাকলে জীবনের কোন অর্থ থাকে না। শিক্ষা, যুক্তি, জ্ঞান প্রভৃতির যেমন দরকার হয় জীবনে, বিশ্বাসেরও দরকার আছে। নইলে জীবন নাকি 'পরিপূর্ণ' হয় না। আমি মনে করিনা সেটা সত্য। 'বিশ্বাস' ব্যাপারটিই দাঁড়িয়ে আছে একটি 'অপ-বিশ্বাসমূলক' প্রক্রিয়ার উপর। ড. হুমায়ুন আজাদের একবার একটি উক্তি করেছিলেন সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে, যা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক:

> 'যে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই, যার কোনো অস্তিত্ব নেই যা প্রমাণ করা যায় না, তাতে মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়। মানুষ ভূতে বিশ্বাস করে, পরীতে বিশ্বাস করে বা ভগবানে, ঈশ্বরে বা আল্লায় বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস সত্য নয়, এগুলোর কোনো বাস্তবরূপ নেই। মানুষ বলে না, আমি গ্লাসে বিশ্বাস করি বা পানিতে বিশ্বাস করি, মেঘে বিশ্বাস করি। যেগুলো নেই সেগুলোই মানুষ বিশ্বাস করে। বিশ্বাস একটি অপবিশ্বাসমূলক ক্রিয়া। যা সত্য, তাতে বিশ্বাস করতে হয় না; যা মিথ্যে তাতে বিশ্বাস করতে হয়। তাই মানুষের সব বিশ্বাস ভুল বা ভ্রান্ত, তা অপবিশ্বাস'।

কথাটি মিথ্যে নয়। বিশ্বাস অপ্রয়োজনীয় তো বটেই উপরন্তু এটা ক্ষতিকর, এবং এমনকি তা তৈরি করতে পারে ভাইরাসের এবং মহামারীর; এবং সেটা করেও। বিশ্বাসের একনিষ্ঠ অনুগামীরা বিধর্মীদের হত্যা করা শুরু করে, ডাইনি পোড়ানোতে কিংবা সতীদাহে মেতে উঠে, কখনো গণ-আত্মহত্যায় জীবন শেষ করে দেয় কিংবা বিমান নিয়ে সোজা হামলে পড়ে টুইন টাওয়ারের উপর।

কিন্তু তারপরেও কি বিশ্বাস বলে কি কিছু লাগে না? এমনকি আমরা মুক্তমনারাও যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, প্রগতিতে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি মানবতায় বলি, সেগুলো? প্রশ্নটি করেছিলেন এক পাঠক আমাকে ফেসবুকে। সত্যই তো আমরা বহু কিছুতেই 'বিশ্বাস করি' বলি। তাহলে বিশ্বাস বাবাজিকে এড়ানো যাচ্ছে কই? কিন্তু আমার মতে, সে 'বিশ্বাস'গুলো আসলে বিশ্বাস নয়, আস্থার বহিঃপ্রকাশ। আমাদের

Prayer, American Heart Journal, 151(4), 2006, pp 934-42.

আস্থা আছে গণতন্ত্রে, প্রগতিতে কিংবা মানবতায়। এই আস্থা আমাদের এমনিতে গড়ে ওঠেনি। উঠেছে বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে। আমরা আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্রপরিচালনার যে উপাত্ত পাচ্ছি – সে অভিজ্ঞতায় জেনেছি স্বৈরতন্ত্র কিংবা মোল্লাতন্ত্রের চেয়ে গণতন্ত্র অনেক বেশি কার্যকরী। তেমনি, প্রগতি কিংবা মানবতাবাদকেও আমরা বিভিন্নভাবে পাওয়া উপাত্তের কষ্টিপাথরে যাচাই করেছি বলেই এগুলোতে আমাদের আস্থার প্রতিফলন ঘটছে। এখানে বিশ্বাসের আসলে কোন স্থান নেই।

আমরা অনেক সময়ই না ভেবে কিছু বাক্য বলে ফেলি, যা থেকে মনে হতে পারে বিশ্বাসটাই মুখ্য। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়, এই ধরণের বাক্যে ব্যবহৃত 'বিশ্বাস করা' (believe) শব্দটি সহজেই অন্য কোন শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায়। যেমন এই বাক্যটি – 'আমি *বিশ্বাস* করি আজ রাতে বৃষ্টি হবে।'

এটাকে আসলে সহজেই 'মনে করি' (think) দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায় – 'আমি *মনে করি* আজকে বৃষ্টি হবে।'

এরকম অনেক কিছুই আমরা চলতি কথায় বলি। এমনকি বিজ্ঞানের সাথে জড়িত ব্যক্তিরাও মাঝে সাঝে এ ধরণের বাক্য ব্যবহার করে বসেন – 'আমরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি *বিশ্বাস* করব ততক্ষণই, যতক্ষণ সেটা সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে সমর্থিত হবে'।

উনি আসলে বলতে চাইছেন – 'আমরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি *ব্যবহার* করব ততক্ষণই, যতক্ষণ সেটা সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে সমর্থিত হবে।'

কাজেই এ ব্যাপারেও বিশ্বাসের কোন দরকার পড়ছে না। বিশ্বাস বলতে আসলে সাক্ষ্য প্রমাণহীনভাবে কোন ধারনা কিংবা সত্ত্বার উপর নির্ভরতা বোঝায়, বোঝায় স্রেফ অন্ধ আনুগত্য। আর এ ধরণের অন্ধ আনুগত্যের কুফল সম্বন্ধে নতুন কিছু আর বোধ হয় দরকার নেই। প্রতিটি বিশ্বাস-নির্ভর গ্রন্থের বিভিন্ন আয়াত এবং শ্লোকে বিধর্মীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে ঢালাওভাবে, কখনো দেয়া হয়েছে হত্যার নির্দেশ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ধর্ম আসলে জ্বিহাদ, দাসত্ব, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, হোমোফোবিয়া, অসহিষ্ণুতা, সংখ্যালঘু নির্যাতন, নারী নির্যাতন এবং সমঅধিকার হরণের মূল চাবিকাঠি হিসেবে প্রতিটি যুগেই ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু অতীতে হয়, আজকের এই প্রযুক্তিময় একবিংশ শতকেও এটা ভয়াবহ রকমের বাস্তব। বইয়ের এই অংশটা লেখার সময় বিভিন্ন খবরে চোখ বোলাচ্ছিলাম। ফলাফল মোটেই শুভ হল না, বলাই বাহুল্য –

- বিবর্তনীয় পথে কুকুর কিভাবে মানুষের পোষা জীবে পরিণত হয়েছে তা সবার জানা থাকলেও ইসলামী 'শরিয়া বিজ্ঞান' বলছে 'কুকুরকে পোষ মানানো যায় না'[178]

[178] Islamic report: Sharia science proves dogs can't be kept as pets, Examiner.com.

- বাংলাদেশে মাত্র ছয় বছর বয়সী এক মেয়ে জামে মসজিদের ইমামের যৌন হয়রানীর শিকার[179]।
- ১৯ জনকে হত্যা করে 'শান্তি প্রতিষ্ঠা' করছে নাইজেরিয়ার ইসলামিস্টদের দল[180]।
- বাগদাদে একটি আত্মঘাতী বোমা হামলায় মারা গেছে কমপক্ষে ৩৮ জন[181]।
- যৌন নিপীড়নের অভিযোগে দিল্লি পুলিশ আটক করেছে আশ্রমের নারায়ণ সাঁইকে[182]।
- পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে ট্রেন হামলায় শান্তিবিরোধী ৭ জনকে হত্যা করা হয়েছে[183]।
- ক্যাথলিক চার্চ তাদের যৌনকুকীর্তির কাহিনি জাতিসংঘকে জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে[184]।
- অযোধ্যার সাধু সন্ন্যাসীরা হত্যা, চোরাচালান, মাদকসেবন সহ নানা অপরাধচক্রের সাথে জড়িত বলে রিপোর্টে প্রকাশ[185]।
- খ্রিসমাসের সময়ে ইরাকে দু'টি পৃথক হামলায় ইসলামিস্টরা ৩৭ জন খ্রিষ্টানকে হত্যা করেছে[186]।
- মাজারে যাওয়ার অপরাধে ছয় ব্যক্তির গলা কেটে ফেলেছে পাকিস্তানী তালিবানরা[187]।
- আফগানিস্তানে আট বছর বয়সী শিশুদের আত্মঘাতী বোমারু হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে[188]।

---

[179] কালিগঞ্জে যৌন হয়রানীর অভিযোগে ইমামের কারাদণ্ড, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ডিসেম্বর ২৫, ২০১৩

[180] 'Boko Haram' gunmen kill 19 motorists in Nigeria, BBC Report, 20 October 2013

[181] Baghdad cafe bombing kills at least 38, Mon Oct 21, 2013

[182] Asaram's son Narayan Sai arrested by Delhi Police, Hindustan Times, December 04, 2013

[183] Pakistan train blast 'kills seven' in Balochistan, BBC Report, 21 October 2013

[184] Vatican rebuffs United Nations sex abuse inquiries, BBC Report, 3 December 2013.

[185] The Guns & Godmen Of Ayodhya, Tehelka.com, 2013-12-07 , Issue 49 Volume 10

[186] Bomb attacks on Christians in Baghdad kill 37, Fox News, December 25, 2013

[187] 6 men found with throats cut at Pakistan shrine, AFP, Tuesday, January 07, 2014

[188] Afghanistan girl wearing suicide vest detained, BBC Report, 6 January 2014

- সিরিয়ার রিফিউজি মেয়েদের দশ হাজার রিয়ালের বিনিময়ে ক্রয় করতে চাওয়ার বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে সৌদি আরবের পত্রিকায়[189]।
- নারী-পুরুষের অনলাইন চ্যাট নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে ইরানে[190]।
- আই.এইচ.ইউ'র রিপোর্ট অনুযায়ী, তেরটি দেশে নাস্তিকতার 'অপরাধে' মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে, সবগুলোই মুসলিম প্রধান[191]।
- নির্বাচনে পরাজয়ের পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে ঋষিপল্লীর দুই গৃহবধূকে ধর্ষণ করেছে মৌলবাদীরা[192]। সারা দেশেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে বিভিন্ন স্থানে বিধর্মী জনগণের উপর এরকম হামলা চালিয়েছে মৌলবাদী শক্তি। নির্যাতনের মাত্রা এতোটাই আশঙ্কাজনক পর্যায়ে চলে গেছে যে, সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিচারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে[193]।

এ খবরগুলো মূলত ডিসেম্বর (২০১৩) – জানুয়ারি (২০১৪) মাসের কয়েকদিনের পত্রিকায় খবর। প্রতিদিনই বিশ্বাসের ভাইরাস সংক্রমিত করছে মানুষকে, আমাদের সমাজকে। নানা ভাবে। এর বলি হচ্ছে অজস্র নিরীহ প্রাণ।

বিজ্ঞানও কি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত?

বিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের কথা কারো অজানা নয়। বর্তমানে যদিও খুব ফলাও করে ধর্ম-বিজ্ঞানের সমন্বয় কিংবা সম্প্রীতির কথা বলা হয়, বিজ্ঞান এবং ধর্মের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাসের সাথে সবাই কমবেশি পরিচিত। খ্রিস্ট-জন্মের পাঁচশ বছর আগে পিথাগোরাস, এনাক্সিমন্ডের মতো অনুসন্ধিৎসু দার্শনিকেরা জানিয়েছিলেন পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ মাত্র, সূর্যকে ঘিরে অন্য সকল গ্রহের মতো পৃথিবীও ঘুরছে। ধর্মবিরোধী এই মতামত প্রকাশের জন্য এদের অনেককেই সেসময় সইতে হয়েছিল নির্যাতন। এই 'কুফরি' মতবাদকে দুই হাজার বছর পরে পুস্তকাকারে তুলে ধরেছিলেন পোল্যান্ডের নিকোলাস কোপার্নিকাস। বাইবেল বিরোধী এই সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রচারের

---

[189] Syrian girls advertised for selling in Saudi Arabia, December 12, 2013 4:50 http://en.alalam.ir/news/1543829

[190] Latest fatwa from Iran: No online chatting between sexes, FoxNews.com, January 07, 2014

[191] IHEU Study Finds Atheists Face Death Penalty In 13 Nations, http://www.atheistrepublic.com/news/iheu-study-finds-atheists-face-death-penalty-13-nations-all-muslim

[192] ঋষিপল্লীর দুই গৃহবধূকে ধর্ষণ, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, জানুয়ারি ১০, ২০১৪

[193] সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিচারে বিশেষ ট্রাইবুনাল, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, জানুয়ারি ৯, ২০১৪

'অপরাধে' কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও আর ব্রুনোর ওপর কী রকমভাবে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিল সে এক লজ্জাকর ইতিহাস। গ্যালিলিওর সাথে চার্চের দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা আরেকবার স্মরণ করা যাক।

সেটা সেই ১৬৩৩ সাল। মানুষের মনে পৃথিবী নয়, সূর্য তখন পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। কিন্তু গ্যালিলিও তাঁর নতুন তৈরি করা টেলিস্কোপটির পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করে, যুক্তি-তর্ক দিয়ে আস্ত একটা বই লিখে ফেললেন বাইবেলীয় মতবাদের বিরোধিতা করে। তিনি বললেন, সূর্য নয়, বরং পৃথিবীই ঘুরছে সূর্যকে কেন্দ্র করে। ব্যাস চার্চের চোখে করে ফেললেন ব্লাসফেমি[194]।

গ্যালিলিও তখন প্রায় অন্ধ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ। অসুস্থ ও বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে জোর করে ফ্লোরেন্স থেকে রোমে নিয়ে যাওয়া হলো, হাঁটু ভেঙে সবার সামনে জোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে বলতে বাধ্য করা হলো, এতদিন গ্যালিলিও যা প্রচার করেছিলেন তা ধর্মবিরোধী, ভুল ও মিথ্যা। বাইবেলে যা বলা হয়েছে সেটিই আসল, সঠিক। পৃথিবী স্থির-অনড়, সৌর জগতের কেন্দ্রে। গ্যালিলিও প্রাণ বাঁচাতে তাই করলেন। স্বীকারোক্তি ও প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে গ্যালিলিও বলেছিলেন[195] –

> '...সূর্য কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ও নিশ্চল – এরূপ মিথ্যা অভিমত যে কীরূপ শাস্ত্রবিরোধী সেসব বিষয় আমাকে অবহিত করা হয়েছিল; এ মিথ্যা মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে এর সমর্থন ও শিক্ষাদান থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত থাকতে আমি এই পবিত্র ধর্মসংস্থা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে একই নিন্দিত ও পরিত্যক্ত মতবাদ আলোচনা করে ও কোনো সমাধানের চেষ্টার পরিবর্তে সেই মতবাদের সমর্থনে জোরালো যুক্তিতর্কের অবতারণা করে আমি একটি গ্রন্থ রচনা করেছি। এজন্য গভীর সন্দেহ এই যে আমি খ্রিস্ট ধর্মবিরুদ্ধ মত পোষণ করে থাকি। ... অতএব সঙ্গত কারণে আমার প্রতি আরোপিত এই অতি ঘোর সন্দেহ ধর্মাবতারদের ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকের মন হতে দূর করার উদ্দেশ্যে সরল অন্তঃকরণে ও অকপট বিশ্বাসে শপথ করে বলছি যে পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ও ধর্মবিরুদ্ধ মত আমি ঘৃণা ভরে পরিত্যাগ করি।...'

---

194 পবিত্র বাইবেলে আছে,

'আর জগৎও অটল- তা বিচলিত হবে না' (ক্রনিকল্‌স ১৬/৩০)

'জগৎ ও সুস্থির, তা নড়াচড়া করবে না।' (সাম ৯৩/১)

'তিনি পৃথিবীকে অনড় এবং অচল করেছেন' (সাম ৯৬/১০)

'তিনি পৃথিবীকে এর ভিত্তিমূলের উপর স্থাপন করেছেন, তা কখনো বিচলিত হবে না' (সাম ১০৪/৫) ইত্যাদি।

195 অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৬

ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ নিয়েই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয় ১৬৪২ সালে, নিজ গৃহে, অন্তরিন অবস্থায়। গ্যালিলিও তো তাও প্রাণে বেঁচেছিলেন, কিন্তু ব্রুনোকে তো পুড়িয়েই মারলো ঈশ্বরের সুপুত্ররা। তারপরও কি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা ঠেকানো গেল?

শুধু গ্যালিলিও কিংবা ব্রুনোই নন, তাদের সমসাময়িক লুচিলিও ভানিনি, টমাস কিড, ফ্রান্সিস কেট, বার্থোলোমিউলিগেট সহ অনেককেই ধর্মান্ধদের হাতে নিগৃহীত এবং নির্যাতিত হয়ে নিহত হতে হয়েছিল। খ্রিস্টের জন্মের চারশো পঞ্চাশ বছর আগে এনাক্সোগোরাস বলেছিলেন চন্দ্রের নিজের কোনো আলো নেই। সেই সঙ্গে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি আর চন্দ্রগ্রহণের কারণ। এনাক্সোগোরাসের প্রতিটি আবিষ্কারই ছিল ধর্মবাদীদের চোখে জঘন্য রকমের অসত্য। ঈশ্বর বিরোধী, ধর্ম বিরোধী আর অসত্য প্রচারের অপরাধে দীর্ঘ আর নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। ষোড়শ শতকে সুইজারল্যান্ডের বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্র এবং ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক ফিলিপ্রাস প্যারাসেলসাস ঘোষণা করলেন— মানুষের অসুস্থতার কারণ কোনো পাপের ফল কিংবা অশুভ শক্তি নয়, রোগের কারণ হলো জীবাণু। ওষুধ প্রয়োগে জীবাণু নাশ করতে পারলেই রোগ ভালো হয়ে যাবে। প্যারাসেলসাসের এই 'উদ্ভট' তত্ত্ব শুনে ধর্মের ধ্বজাধারীরা হা রে রে করে উঠলেন। সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ধর্মবিরোধী মতবাদ প্রচারের জন্য প্যারাসেলসাসকে হাজির করা হয়েছিল 'বিচার' নামক এক প্রহসনের মুখোমুখি। ধর্মান্ধ বিচারকেরা ব্রুনোর মতোই প্যারসেলসাসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। প্যারাসেলসাসকে সেদিন জীবন বাঁচাতে মাতৃভূমি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। অত্যাচার আর নির্যাতন শুধু খ্রিস্টানদের একচেটিয়া ভেবে নিলে ভুল হবে – আজকে মুসলিমরা ইবনে খালিদ, যিরহাম, আল দিমিস্কি, ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, ইবনে বাজা, আল কিন্দী, আল রাজি কিংবা ইবনে রুশদের মতো দার্শনিকদের জন্য গর্ববোধ করে, সেসব দার্শনিকদের সবাই কিন্তু - তাদের সময়ে বৈজ্ঞানিক সত্য কিংবা মুক্তমত প্রকাশের কারণে মৌলবাদীদের হাতে নিগৃহীত, নির্যাতিত কিংবা নিহত হয়েছিলেন।

আজকের দিনের পরিবর্তিত পরিবেশে বিজ্ঞানীদের উপর এত ঢালাওভাবে অত্যাচার করা কিংবা ডাইনি পোড়ানোর মতো তাদের পুড়িয়ে মারা না গেলেও ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের দল সুযোগ পেলে এখনো বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঠেকাতে মুখিয়ে থাকে। যখনই বিজ্ঞানের কোনো নতুন আবিষ্কার তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বিশ্বাসের বিপরীতে যায়, খোদ বিজ্ঞানকে ফেলে দিতে চায় আস্তাকুঁড়ে। তাতে অবশ্য লাভ হয় না কিছুই। অযথা গোলমাল বাধিয়ে নিজেরাই বরং সময় সময় হাস্যাস্পদ হন। অধিকাংশ ধার্মিকেরাই এখনো বিবর্তন তত্ত্বকে মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি কারণ ডারউইন প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবস্থান ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টির কল্পকাহিনিগুলোর একশ আশি ডিগ্রী বিপরীতে। এখনো সুযোগ পেলেই ধর্মান্ধ মোল্লার দল প্রগতিশীল দার্শনিক,

বিজ্ঞানী কিংবা সাহিত্যিকদেরকে 'মুরতাদ' আখ্যা দেয়, চাপাতি দিয়ে কোপায় কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করে। এ তো গেল আমাদের মতো দেশগুলোর অবস্থা। তথাকথিত 'উন্নত বিশ্বে' এখনো অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিত পাদ্রি আর মোল্লারা উপযাজক সেজে বিজ্ঞানীদের পরামর্শ দিতে আসে বিজ্ঞানীদের কোন গবেষণা নৈতিক, আর কোনটা অনৈতিক।

ইদানীং আবার কোন কোন মহল থেকে এক ধরণের কুযুক্তি বাজারে এসেছে, বিজ্ঞানও নাকি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আগে ব্লগে বা ফোরামে ধর্মবাদীরা এ যুক্তি দিতেন, ইদানীং কিছু বিজ্ঞানীও যুক্ত হয়েছেন এই ধরণের প্রচারে। পল ডেভিস এমন একজন। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে ভালো তাত্ত্বিক কাজ আছে তার। সেইসাথে তিনি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখকও বটে। কিন্তু পল ডেভিস মাঝে মধ্যেই পদার্থবিজ্ঞানের বইপত্তরগুলো পাশে তুলে রেখে ঢুকে পড়তে চান আধ্যাত্মিক জগতে। পল ডেভিস ২০০৭ সালে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এ লেখা একটি প্রবন্ধে বিজ্ঞানকে আখ্যায়িত করেন ধর্মের মতো নতুন এক ধরণের বিশ্বাস ব্যবস্থা হিসেবে।

ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তিনি বলেন[196], 'প্রকৃতি যৌক্তিক এমন একটি বিশ্বাসকে পুঁজি করে বিজ্ঞান এগিয়ে চলে'। তিনি আরও বলেন, 'যদি ঈশ্বর থেকেই থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করে পাওয়া সিদ্ধান্ত নয় বরঞ্চ ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাই পারবে তা জানতে।'

কেন? বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কাজ করে। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, সেটা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। আর যখনই কিছু পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে তখনই বিজ্ঞান সেটি নিয়ে কাজ করতে সক্ষম। পল ডেভিসের 'বিজ্ঞানও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত' –এই বক্তব্য যথারীতি তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার সহকর্মী অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মাঝে।

Edge পত্রিকার পক্ষ থেকে পল ডেভিসের এই প্রবন্ধের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল[197]। সে সমালোচনাগুলো করেছিলেন জেরেমি বার্নস্টেইন, শন ক্যারল, স্কট অ্যাট্রান, লরেন্স ক্রাউস, নেথান মার্ভোল্ড, জেরি কয়েন প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা। বহু বিজ্ঞানীই আবার নিউইয়র্ক টাইমসে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন পল ডেভিসের এই ধারনা একেবারেই ভ্রান্ত। যেমন, নিউইয়র্ক সিটি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক অ্যালেন সোকাল পাঠানো চিঠিতে লিখেছিলেন,

প্রিয় সম্পাদক,

পল ডেভিসের দাবীকৃত(সম্পাদকীয়, নভেম্বর ২৪) 'বিজ্ঞান এবং ধর্ম উভয়েই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত' খুবই ভ্রান্ত অনুধাবন বলে আমার মনে হয়েছে।

---

[196] Paul Davies, *'Taking Science on Faith,'* New York Times, November 24, 2007।

[197] Reality Club Discussion. Edge, Jan 13, 2014

বিজ্ঞান কার্যকরী অনুকল্পের উপর উপর ভিত্তি করে কাজ করে, এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এর সত্যতা নির্ধারণ করে। এটি আমাদের বিগত চার শতকের প্রায়োগিক প্রক্রিয়া, যেটা সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এটাকে ধর্মীয় বাণী এবং বিশ্বাস নির্ভর কাঠামোর সাথে তুলনা করাটা বালখিল্যই। দুটো বিপরীত মেরুর জিনিসকে 'একই রকম' হিসেবে চালিয়ে দেয়াটা এবং দুটোর ভিত্তিই 'বিশ্বাস' বলে দাবী করাটা বোকামি। বিশেষত সমগ্র মানবতা যখন বিভিন্ন ধারার বিশ্বাসের পদাঘাতে প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত হয়ে চলেছে, তখন এ ধরণের দাবী পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করে তুলবে। এই ধরণের দাবী সম্বলিত লেখা অপরিণামদর্শী এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনও বটে।

অ্যালেন সোকাল

সোকাল মিথ্যে কিছু বলেন নি। সোকালের কথার মর্মার্থ বুঝতে হলে আমাদের বিজ্ঞান কীভাবে কাজ করে সেটা ভালমতো বোঝা চাই। বিজ্ঞান কিন্তু বিশ্বাসের উপর টিকে নেই, টিকে আছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। মোটা দাগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতির অনুক্রমটি হল এরকম –

১) প্রাকৃতিক ঘটনা বা প্রপঞ্চের পর্যবেক্ষণ করা
২) প্রপঞ্চের কারণ অনুমান করে একটা সাময়িক বা অস্থায়ী ব্যাখ্যা বা অনুকল্প প্রদান।
৩) কৃত্রিম পরিবেশে পরীক্ষা করা। পরীক্ষা থেকে পাওয়া যায় ডেটা বা উপাত্ত।
৪) প্রাপ্ত উপাত্ত পূর্বোক্ত অনুকল্প বা অনুসিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা যাচাই করা।
৫) প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণ অনুকল্পটির সাথে মিলে গেলে বার বার পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করা হয়। এতে কোন ব্যতিক্রম না পাওয়া গেলে অনুকল্পটিকে 'তত্ত্ব' হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। আর অনুকল্পের সাথে উপাত্তের বিশ্লেষণ না মিললে পূর্বের অনুকল্পটি বাতিল করা হয় এবং শুরু হয় নতুন অনুকল্পের অনুসন্ধান।
৬) তত্ত্ব থেকে আরো নতুন নতুন অনুসিদ্ধান্তে বা অবরোহে উপনীত হওয়া, পূর্বাভাস প্রদান করা। নতুন পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ দ্বারা বারংবার এগুলো সঠিক বলে প্রমাণিত হলে, প্রপঞ্চটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কিছু প্রপঞ্চকে তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে পারলে, তত্ত্বটিকে প্রাকৃতিক আইনের (Natural Law) মর্যাদা প্রদান করা হয়।

কাজেই উপরের পয়েন্টগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারছি – বিজ্ঞান ভাববাদ ভাগ্যবাদ কিংবা বিশ্বাস কোন কিছুর উপরই টিকে নেই – টিকে আছে এবং থাকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নির্ভর নিগূঢ় পদ্ধতির উপরে। বিজ্ঞানে তত্ত্বের ভাঙ্গা চোরা চলে নিয়ত, হয়

পুরনো তত্ত্বের পতন, কিংবা নতুন তত্ত্বের উত্থান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয়মাল্য যায় বিজ্ঞানের গলাতেই। বিজ্ঞানে কোন কিছুই পাথরে খোদাই করে লেখা হয় না। বরং বিজ্ঞান নির্দয়ভাবে সংশয়ের তীর হানতে থাকে সর্বক্ষণ তা যে রথী মহারথীর তত্ত্বই হোক না কেন।

অনেকেরই হয়তো মনে আছে ২০১১ সালে সার্নের "অপেরা" প্রজেক্টের একটি গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফলে আলোর চেয়ে বেশি বেগে নিউট্রিনো আসার আলামত পাওয়া যাচ্ছিল, যা কিনা আইনস্টাইনের তত্ত্বের লঙ্ঘন বলে মনে হচ্ছিল[১৯৮]। বিজ্ঞানের এই সংশয়, এই পরিবর্তনশীলতাই বিজ্ঞানের এগিয়ে চলার শক্তি। অনেকেই সেটার মর্ম না বুঝে একে ধর্মবিশ্বাস কিংবা রাজনৈতিক বিশ্বাসের মতোই এক ধরণের বিশ্বাস বলে মনে করেন। এটি সত্য নয়। বিজ্ঞান সংশয় করে বলেই আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীকেও পর্যবেক্ষণবিদেরা সেসময় ছাড় দেয়নি। তারা সততার সাথে নিজেদের পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং প্রশ্ন করেছিলেন সত্যিই আইনস্টাইন ভুল প্রমাণিত হবার দ্বারপ্রান্তে কিনা। সেসময় (২০১১ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর) গার্ডিয়ান পত্রিকায় একটি ব্যতিক্রমী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'Faster than light story highlights the difference between science and religion' শিরোনামে। সেখানে লেখক স্পষ্ট করেছেন, বিজ্ঞান কখনোই কোন কিছুকে 'বিশ্বাস' করে বসে থাকে না, বরং পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত 'জ্ঞান' এর আলোয় নিজেকে আলোকিত করে এগিয়ে যেতে চায়। বিজ্ঞান স্থবির নয়, প্রগতিশীল। পরে অবশ্য দেখা গিয়েছিল সার্নের সেই পরীক্ষায় জিপিএস ইউনিটের সাথে কম্পিউটার কানেকশনের ঝামেলার কারণে ভুল ফলাফল এসেছিল, আইনস্টাইনের তত্ত্বে আসলে ভুল নেই[১৯৯]।

কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, আইনস্টাইনের তত্ত্বের ভুল পাওয়া গেলে সেই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যাত হতে সময় লাগত না। পর্যবেক্ষণের সাথে তত্ত্ব না মিললে, প্রাচীন কালের কোন পয়গম্বরের কিংবা দেবদূতের বাণীর মতো আঁকড়ে ধরে ফুল চন্দন যোগে কারো পুজো চলে না বিজ্ঞানে। বিজ্ঞানে 'পবিত্র তত্ত্ব' বলে কিছু নেই। এখনে পল ডেভিস কিংবা 'একশ জন বিশেষজ্ঞের' অভিমতের মূল্য নগণ্য। বরং নিগূঢ় এবং নির্ভুল পরীক্ষণ, এবং সেই পরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, যা আবার অন্যদের দ্বারা পুনঃ-পরীক্ষিত এবং সমর্থিত হবে – সেটাই 'বিজ্ঞানের রায়' বলে বিবেচিত। তাই আমাদের আস্থা থাকবে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ার প্রতি, সেখান থেকে পাওয়া নির্মোহ রায়ের উপরেই, বিশ্বাসের উপরে নয়।

---

[১৯৮] অভিজিৎ রায়, আলোর চেয়ে বেশি বেগে ভ্রমণরত নিউট্রিনো- আইনস্টাইন কি তবে ভুল ছিলেন?, মুক্তমনা, নভেম্বর ৩০, ২০১১

[১৯৯] Error Undoes Faster-Than-Light Neutrino Results, http://news.sciencemag.org।

নাস্তিকতাও কি এক ধরণের বিশ্বাস?

ব্লগে তর্ক বিতর্ক করতে গিয়ে অনেককেই বলতে শুনি, আস্তিক্যবাদের মতো নাস্তিক্যবাদও নাকি এক ধরণের বিশ্বাস। আস্তিকরা যেমন 'ঈশ্বর আছে' এই মতবাদে বিশ্বাস করে, তেমন নাস্তিকরা বিশ্বাস করে 'ঈশ্বর নেই' – এই মতবাদে। দুটোই নাকি বিশ্বাস। যেমন, একবার মুক্তমনা ব্লগে এক ভদ্রলোক তর্ক করতে গিয়ে বলে বসলেন –

> 'নাস্তিক মানেই বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর নেই। কিন্তু 'ঈশ্বর নেই' এটি প্রমাণিত সত্য নয়। শুধু যুক্তি দিয়েই বোঝানো সম্ভব 'ঈশ্বর নেই' বিবৃতিটি আসলে ফাঁকিবাজি'।

নাস্তিক মানেই বিশ্বাসী, কিংবা নাস্তিকতাবাদও একটি বিশ্বাস – এগুলো ঢালাওভাবে আউরে দিয়ে নাস্তিকতাবাদকেও এক ধরণের 'ধর্ম' হিসেবে হাজির করার চেষ্টাটি আমরা বহু মহলেই দেখেছি। নাস্তিকদের এভাবে সংজ্ঞায়ন সঠিক কি ভুল, তা বুঝবার আগে 'নাস্তিক' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি আমাদের জানা প্রয়োজন। 'নাস্তিক' শব্দটি ভাঙলে দাঁড়ায়, নাস্তি + কন বা নাস্তি+ক। 'নাস্তি' শব্দের অর্থ হলো নাই, অবিদ্যমান। 'নাস্তি' শব্দটি মূল সংস্কৃত হতে বাংলায় এসে 'ক' বা 'কন' প্রত্যয় যোগে নাস্তিক হয়েছে যা তৎসম শব্দ হিসেবে গৃহীত। ন আস্তিক = নাস্তিক – যা নঞ তৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ এবং আস্তিকের বিপরীত শব্দ। আরো সহজ বাংলায় বললে বলা যায়, না + আস্তিক = নাস্তিক। খুবই পরিষ্কার যে, সঙ্গত কারণেই আস্তিকের আগে 'না' প্রত্যয় যোগ করে নাস্তিক শব্দটি তৈরি করা হয়েছে। আস্তিকরা যে ঈশ্বর/আল্লাহ/খোদা ইত্যাদি পরম সত্তায় বিশ্বাস করে এ তো সবারই জানা। কাজেই নাস্তিক হচ্ছে তারাই, যারা এই ধরণের বিশ্বাস হতে মুক্ত। তাই সংজ্ঞানুযায়ী নাস্তিকতা কোনো বিশ্বাস নয়, বরং 'বিশ্বাস হতে মুক্তি' বা 'বিশ্বাসহীনতা'। ইংরেজিতে নাস্তিকতার প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Atheist'। সেখানেও আমরা দেখছি theist শব্দটির আগে 'a' প্রিফিক্সটি জুড়ে দিয়ে Atheist শব্দটি তৈরি করা হয়েছে। নাস্তিকতা এবং মুক্তচিন্তার উপর বহুল প্রচারিত গবেষণাধর্মী একটি ওয়েব সাইটে শব্দটির সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে এভাবে –

> Atheism is characterized by an ***absence of belief*** in the existence of gods. This absence of belief generally comes about either through deliberate choice, or from an inherent inability to believe religious teachings which seem literally incredible. It is not a lack of belief born out of simple ignorance of religious teachings.

সহজেই অনুমেয় যে, 'absence of belief' শব্দমালা চয়ন করা হয়েছে 'বিশ্বাসহীনতা'কে তুলে ধরতেই, উল্টোটি বোঝাতে নয়। Gordon Stein তার বিখ্যাত

'An Anthology of Atheism and Rationalism' বইয়ে নাস্তিকতার (Atheism) সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে বলেন –

> 'When we examine the components of the word 'atheism,' we can see this distinction more clearly. The word is made up of 'a-' and '-theism.' Theism, we will all agree, is a belief in a God or gods. The prefix 'a-' can mean 'not' (or 'no') or 'without'. If it means 'not,' then we have as an atheist someone who is not a theist (i.e., someone who does not have a belief in a God or gods). If it means 'without,' then an atheist is someone without theism, or without a belief in God'. (*Atheism and Rationalism, p. 3. Prometheus, 1980*)

আমরা যদি atheist শব্দটির আরো গভীরে যাই তবে দেখব যে, এটি আসলে উদ্ভূত হয়েছে গ্রিক শব্দ 'a' এবং 'theos' হতে। গ্রিক ভাষায় 'theos' বলতে বোঝায় ঈশ্বরকে, আর 'a' বলতে বোঝায় অবিশ্বাস বা বিশ্বাসহীনতাকে। সেজন্যই Michael Martin তার 'Atheism: A Philosophical Justification' বইয়ে বলেন –

> According to its Greek roots, then, atheism is a negative view, characterized by the absence of belief in God. (*Atheism: A Philosophical Justification', p. 463.,Temple University Press, 1990*)।

আসলে নাস্তিকদের বিশ্বাসী দলভুক্ত করার ব্যাপারটি খুবই অবিবেচনাপ্রসূত। ব্যাপারটাকে আরেকটু পরিষ্কার করা যাক। ধরা যাক, এক মুক্তমনা যুক্তিবাদী ব্যক্তি ভূতে বিশ্বাস করেন না। তবে কি সেজন্য তিনি 'না-ভূতে' বিশ্বাসী হয়ে গেলেন? উনাদের যুক্তি অনুযায়ী তাই হবার কথা। এভাবে দেখলে, প্রতিটি অপ-বিশ্বাস বিরোধিতাই তাহলে উল্টোভাবে 'বিশ্বাস' বলে চালিয়ে দেওয়া যায়, তা সে ভূতই হোক, পঙ্খিরাজ ঘোড়াই হোক, অথবা ঘোড়ার ডিমই হোক। যিনি পঙ্খিরাজ ঘোড়া বা চাঁদের চরকা-বুড়ির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তিনি আসলে তার সংশয় এবং অবিশ্বাস থেকেই তা করেন না, তার 'না-বিশ্বাসে' বিশ্বাসী হবার কারণে নয়। যদি ওই ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন ওগুলোতে তিনি বিশ্বাস করেন না, তিনি হয়তো জবাবে বলবেন, ওগুলোতে বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি বলে। কিংবা হয়তো বলতে পারেন, এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওগুলো সত্তার বাস্তব অস্তিত্ব কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি, তাই ওসবে বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না। এটি পরিষ্কার যে, এই বক্তব্য থেকে তার মনের সংশয় আর অবিশ্বাসের ছবিটিই

আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে, বিশ্বাসপ্রবণতাটি নয়। ঈশ্বরে অবিশ্বাসের ব্যাপারটিও কিন্তু তেমনি। নাস্তিকেরা তাদের সংশয় আর অবিশ্বাস থেকেই 'নাস্তিক' হন, 'না-ঈশ্বরে' বিশ্বাস থেকে নয়। সে জন্যই মুক্তমনা ড্যান বার্কার তাঁর বিখ্যাত 'Losing Faith in Faith: From Preacher to Atheist' গ্রন্থে পরিষ্কার করেই বলেছেন – 'Basic atheism is not a belief. It is the lack of belief.'। জুবায়ের অর্ণব বাংলা ব্লগে যে উক্তিটি করেছেন, সেটা সবসময়ই নাস্তিকতাকে বোঝার জন্য একটি মাইলফলক:

> 'নাস্তিক্যবাদ ধর্ম হলে বাগান না করাও একটি শখ, ক্রিকেট না খেলাও একটি ক্রীড়া, কোকেইন সেবন না করাও একটি নেশা'।

প্যাস্কেলের ওয়েজার

> 'ভাই আমি আপনে সবাই একদিন মইরা যামু। ধরেন ঈশ্বর থাকা না থাকার সম্ভাবনা ফিফটি ফিফটি। ঈশ্বর যদি না থাকে তাইলে আস্তিক নাস্তিক কারোরই কোন সমস্যা নাই। হগগলেই তো মাটির তলায়। কিন্তু ঈশ্বর যদি থাকে আমরা যামু বেহেস্তে আর আপনেরা খাইবেন হের কোপানি। তাই আস্তিক হওয়াটাই নিরাপদ না?'

অবিশ্বাসী হওয়ার জ্বালা অনেক। এ ধরণের প্রশ্ন অহরহ শুনতে হয়। আমার মনে হয় এমন কোন নাস্তিক এই ধরাধামে নেই যিনি জীবনের কখনো না কখনো এই প্রশ্নের বিশাল ধাক্কা হজম করেননি। একটা সময় আমি এগুলো হেসে উড়িয়ে দিতাম। ভাবতাম – এই হাবিজাবি কথায় এতো গুরুত্ব দেওয়ার কী আছে! এটা তো ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নয়, কেবল বাচ্চাদের যেমন ভুতের ভয় দেখানো হয়, সেরকমের কিছু। পরে দেখি, আমার বহু ধার্মিক বন্ধুই ঈশ্বরের অস্তিত্বের পেছনে সত্য সত্যই এটাকে একটা বিরাট দাবী বলে মনে করেন। যে কোন আড্ডায় গেলেই দেখা যায়, প্যালের ঘড়ি, হয়েলের বোয়িং, কিংবা হাল আমলের হুমায়ুনের নাইকন ক্যামেরা সহ অনেক ধরণের 'যুক্তির' পাশাপাশি[200] শেষ পর্যায়ে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে হাজির হয়ে যায় তাদের এই 'নিরাপদ বাজির' যুক্তি – 'ভাই আমি মরলে তো সমস্যা নাই, আপনে নাস্তিক হইয়া মরলে তো খবর আছে! দোজখে পুড়বেন। হ্যানো ত্যানো'।

এই যুক্তিটা আসলে পুরানো। বলা হয় ফরাসী দার্শনিক কাম গণিতবিদ ব্লেই প্যাস্কেল (১৬২৩ – ১৬৬২) নাকি এই যুক্তিটা একসময় দিয়েছিলেন, তাই একে বলে প্যাস্কেলের ওয়েজার বা প্যাস্কেলের বাজি। বলা হয়, যে সমস্ত অবিশ্বাসীরা ঈশ্বরের

---

[200] এ যুক্তিগুলোর খণ্ডন পাওয়া যাবে আমার এবং রায়হান আবীরের লেখা 'অবিশ্বাসের দর্শন' (জাগৃতি, ২০১৫) এবং রায়হান আবীররের মানুষিকতা, (শুদ্ধস্বর, ২০১৩) গ্রন্থে।

অস্তিত্বের প্রথাগত 'যুক্তি'গুলোতে সন্তুষ্ট নন, তাদের জন্য সম্ভাবনার গণিত ব্যবহার করে যুক্তিমালা সাজিয়েছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী প্যাস্কেল। ভেবেছিলেন এটা হবে নাস্তিকদের কফিনে শেষ পেরেক। প্যাস্কেলের ভাষাতেই –

> 'If you believe in God and turn out to be incorrect, you have lost nothing – but if you don't believe in God and turn out to be incorrect, you will go to hell. Therefore it is foolish to be an atheist'.

নাস্তিকেরা যে কত বড় 'গাধা' সেটা আবার নানা ধরণের ছক টক কেটে দ্বিমাত্রিক ম্যাট্রিক্স বানিয়ে একেবারে গাণিতিকভাবে 'প্রমাণ' করে দেন প্যাস্কেল।

কিন্তু তার গণিতের শুভঙ্করের ফাঁকি তিনি ধরতে না পারলেও অন্যরা ঠিকই ধরে ফেলেছিল। আসলে তার সম্ভাবনার সূত্রে ফাঁক ফোকর এতই বেশি যে একে গণিত না বলে গোঁজামিল বলাই ভাল। যে ব্যক্তিকে 'ফাদার অব মডার্ন প্রোবাবিলিটি' বলে উপাধি দেয়া হয়েছে তার মাথা থেকে এমন দুর্বল গণিতে খোঁজা যুক্তি বেরিয়ে এসেছিল, যে ভাবতেই এখন অবাক লাগে। চলুন দেখা যাক এই প্যাস্কেলীয় (মামদো)বাজির দুর্বলতাগুলো কী কী ...

<u>*কোন ধর্ম সত্য ধর্ম? আর সত্যিকার ঈশ্বরটাই বা কোনটা?*</u> এক্ষেত্রে প্রথম সমস্যাটা হল – কি করে বোঝা যাবে কোন ধর্মটা সঠিক, আর সত্যিকার ঈশ্বরই বা কোনটা? প্যাস্কেল সাহেব ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। তার কাছে ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মের ঈশ্বরই ছিলেন সত্যিকার ঈশ্বর। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে তার ক্যাথলিক ধর্মের ঈশ্বরকে সত্য প্রমাণের জন্য কষ্ট টষ্ট করে যে যুক্তিমালা সাজিয়েছিলেন, তা দেদারসে এখন ব্যবহার করেন প্রটেস্টাণ্ট, ইসলামিস্ট, বুদ্ধিস্ট, হিন্দু, জৈন – সবাই, তারা সবাই নিজ নিজ ধর্মের ঈশ্বরকে সত্যিকারের ঈশ্বর মনে করেন। প্যাস্কেলীয় যুক্তিতে 'ঈশ্বর যদি থাকে আমরা যামু বেহেস্তে আর আপনেরা খাইবেন হের কোপানি' – এই হুমকি থাকলেও হুমকিতে বলা নাই, কোন ধর্ম অনুসরণ করলে কোপানি থেকে শেষ পর্যন্ত বাঁচা যাবে। এটাকে ইংরেজিতে বলে 'Avoiding the wrong hell dilemma'। হ্যাঁ, আপনি সঠিক ধর্ম অনুসরণ করলে স্বর্গে যাবেন, কিংবা নরকের আগুন থেকে হয়তো বাঁচবেন; কিন্তু আপনি যদি ভুল ধর্মের অনুসারী হয়ে মারা যান, কোন উপায় নাই – সেই নরকই হবে আপনার ভবিতব্য।

এখন কথা হল, সব ধর্মবিশ্বাসীরাই হুক্কা-হুয়া রব তুলে ঘোষণা দেয়, তার নিজের ধর্মটাই সঠিক। তাদের কখনোই মনে হয় না যে, সারা জীবন ধরে মিথ্যা একটা ধর্ম পালন করে মারা যাচ্ছেন আর মরার পর নরকে যাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। এটাই

হল সমস্যা। জনপ্রিয় কার্টুন সিরিজ সিম্পসনের একটি চরিত্র হোমার সিম্পসনের একটা ক্লাসিক উক্তি – 'Suppose we've chosen the wrong god. Every time we go to church we're just making him madder and madder.' আপনি এই দার্শনিক সমস্যাটা ধর্মবাদীদের ধরিয়ে দিলে একটুক্ষণের জন্য হয়ত তারা থমকাবেন, কিন্তু আবার সম্বিত ফিরে পেয়ে আপনাকে বুঝিয়ে দিবে, আরে 'আমার ধর্মই যে সঠিক সেটা তো দেখলেই বুঝা যায়'।

একবার এক খ্রিষ্টান পাদ্রী কি কারণে যেন আমার বাসায় এসেছিল। এসেই 'যীশু' 'যীশু' করে মুখে ফ্যানা তুলে ফেললো আর আমাকে 'হেদায়েত' শুরু করে দিল, আমদের দেশের 'তবলীগ পার্টি'র মতন অনেকটা। যখন খুব একটা সুবিধা করতে পারছিলেন না, এবং শুনলেন আমি নাস্তিক, ওমনি যীশুর মহিমা কীর্তন বাদ দিয়ে প্যাস্কেলের (কু)যুক্তি হাজির হয়ে গেল ... "ঈশ্বর যদি সত্যি সত্যি একজন থাকেন এবং ... তখন আপনারা ... দোজখে ..."। আমি বললাম কিন্তু সত্যিকারের ঈশ্বর যে যীশুই হবেন এটা স্বতঃসিদ্ধভাবে বুজে গেলেন কীভাবে, মা-কালী বা গণেশ বাবা সত্যিকার ঈশ্বর হলে কিন্তু ভাই 'আপনার খবর আছে'! এত যীশু যীশু করার পরেও তো সেই নরকের আগুনে পুড়বেন। পাদ্রী সাব একটু থমকালেন, তারপরেই একগাল হেসে বললেন – 'আহ! আরে গণেশ টনেশ আবার ঈশ্বর হৈতে পারে নাকি, যীশুই আসল ঈশ্বর'। তা তো বটেই, পেট মোটা হাতীর শুরওয়ালা মোটা মাথা গণেশ আসল ঈশ্বর হতেই পারে না, যীশুই হচ্ছেন প্রকৃত ঈশ্বর, যিনি অলৌকিক উপায়ে কুমারী মাতা মেরির গর্ভে হাজির হয়েছিলেন, এবং পরিণত বয়সে, বোবা কালা খঞ্জ পঙ্গু সবাইকে হাতের ছোঁয়ায় নীরোগ করে দিয়েছিলেন, আর ক্রুশবিদ্ধ করার পরেও পুনরুত্থিত হয়েছিলেন কবর থেকে!

এখন পাদ্রীকে কীভাবে বোঝাই – এই পৃথিবীতে হাজারটা ধর্ম, হাজারটা বিশ্বাস পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে। সবাই যে যার মত নিজেদের 'সহি ধর্ম' বলে জিকির তুলছে আর নিজের ঈশ্বরকে আসল ঈশ্বর বলে দাবী করছে। বহু ধর্ম আবার একটা আরেকটার সাথে আক্ষরিক অর্থেই দায়ে-কুমড়ায় সম্পর্ক, এক ধর্মের বিশ্বাসের সাথে আরেক ধর্মবিশ্বাসের আকাশ পাতাল তফাত। রাহুল সাংকৃত্যায়নের উদ্ধৃতি দিয়েই বলি[201] –

> 'এমনিতে তো ধর্মগুলির পরস্পরের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একটি যদি পূবদিকে মুখ করিয়া পূজা করিবার বিধান দেয় তো অপরটি পশ্চিম দিকে। একটি যদি মাথার চুল বড় রাখিতে বলে, অপরটি বলে দাড়িকে বড় করিতে। একটি যদি গোঁফ কাটিতে নির্দেশ দেয় তো অপরটি বলে গোঁফ রাখিতে। একটি যদি জবাই করিয়া

[201] রাহুল সংকৃত্যায়ন, নতুন মানব সমাজ (প্রবন্ধ সংকলন), অনুবাদ শম্ভুনাথ দাস, বুকস এণ্ড পিরিয়ডিকালস, ১৯৬৮। মূল গ্রন্থটি ১৯৩৯ সালে জেলখানা থেকে 'তুমহারি ক্ষয়' নামে হিন্দিতে লেখা।

পশু হত্যা করিতে বলে তো অপরটি বলে এক কোপে কাটিয়া ফেলিতে। এক যদি জামার গলা দক্ষিণদিকে রাখে তো অপরটি বামদিকে। একটি এঁটোর বিচার করে না, অপরটির একটি জাতির মধ্যেও অনেক ভাগ। একটি একমাত্র খোদাতালা ছাড়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় কাহারো নাম নিতে রাজি নয়, অপরটিতে দেব দেবতাদের সীমা নাই। একটি গাভীর জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে বলে তো অপরটি গো-কোরবানিকে পুন্যকার্য বলিয়া মনে করে'।

পাদ্রী সাহেবকে বললাম, আপনারা যেমন যীশুকে ঈশ্বর মনে করেন, মুসলিমরা তা মনে করে না। তাদের চোখে ঈশা নবী ঈশ্বর নয়, কেবল মানুষ। আপনেরা যে সূর্যমুখী ফুলের পাপড়ির মতো রং বেরঙের 'হোলি ট্রিনিটি'র ঝাঁপি খুলে বসেছেন –গড দ্য ফাদার, জেসাস দ্য সন, আর হোলি স্পিরিট – এই ধরণের ত্রৈমাত্রিক ঈশ্বরে মুসলিমরা বিশ্বাস করে না। এখন ইসলাম ধর্ম যদি সত্যি হয়, তাহলে তো 'আপনের খবরাছে'। কোরআনে (সূরা সূরা আল ইমরান) আল্লাহ স্পষ্টই বলছে –

'যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত'। (৩: ৮৫)

কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, ইসলাম সত্য হলে খ্রিষ্টান বাবা, হিন্দু বাবা, সাঁই বাবা, মঙ্গা বাবা সবাই গুষ্টিশুদ্ধ দোজখের আগুনে বেগুন-পোড়া হবে – নাস্তিক হওয়ার জন্য নয়, বরং না জেনে ভুল একটা ধর্ম পালন করে যাবার জন্য। চিন্তা করে দেখুন – আজ যে শিশুটি সুদূর উত্তর মেরুর কাছাকাছি Inuit Religion মানে এস্কিমো পরিবারে জন্মেছে, সে কেমন করে জানবে, শত সহস্র মাইল দূরে আরব মরুর বুকে চোদ্দশ বছর আগে জন্ম নেওয়া এক বেদুইনের প্রচারিত ধর্মটার ঈশ্বরই 'আসল ঈশ্বর'? ছেলেটি না জেনে না বুঝেই মরার পরে বেগুন পোড়া হয়ে যাবে, পরম করুণাময়ের করুণ কারসাজিতে।

কিন্তু মুসলিম ভাইদের এত শান্তিতে থাকার কারণ নেই। খ্রিষ্ট ধর্মের ঈশ্বর – হলি ট্রিনিটির সেই থ্রিসাম গড – মুসলমানদের আল্লাহ থেকে অনেক আলাদা। কাজেই যদি মরার পর যদি দেখা যায় সেই খ্রিষ্টানদের ঈশ্বরই প্রকৃত ঈশ্বর – তখন কিন্তু মুসলিম ভাইদের কম্ম সাবাড়। বাইবেলে আছে –

'আমি এ জগতে আলো রূপে এসেছি যাতে যে আমায় বিশ্বাস করে তাকে যেন অন্ধকারে থাকতে না হয়। আর যে কেউ আমার কথা শোনে অথচ তা মেনে চলে না, তার বিচার করতে আমি চাই না, কারণ আমি জগতের বিচার করতে আসিনি, এসেছি জগতকে রক্ষা করতে। যে কেউ আমাকে অগ্রাহ্য করে ও আমার কথা গ্রহণ না করে, তার বিচার করার জন্য একজন বিচারক আছেন। আমি যে বার্তা দিয়েছি শেষ দিনে সেই বার্তাই তার বিচার করবে' (যোহন ১২: ৪৬ –৪৮)।

এর মানে হচ্ছে, খ্রিষ্টান ধর্মের দেওয়া ঈশ্বরের ফরম্যাটে আপনি বিশ্বাস না করলে আপনি যতই ধর্মমানেওয়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া কামেল আদমি হন না কেন, দোজখের আগুনে পুড়বেন নিশ্চিত। কিন্তু মুসলিমদের মাথায় সেই লজিক ঢুকে না। তাদের কাছে কাছে 'আল্লাহই প্রকৃত ঈশ্বর'। কোরআনে আছে না! তারা বরং অনুসরণ করে তাদের মনমতো 'ইসলামী যুক্তি'[202] –

আচ্ছা, কোরআন যে খাঁটি তা কিভাবে জানি আমরা?

- সোজা। কারণ মহান আল্লাহ তালা বলেছেন যে।

আল্লাহ যে মিথ্যে বলছেন না বুঝবো কি করে?

- খুব সহজেই। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন যে।

মোহাম্মদই যে সত্যি বলছে তারই বা নিশ্চয়তা কি?

- কেন? কোরআন সাক্ষী দিয়েছে না।

বাহ! কোরআনই যে সত্যি কথা বলছে সেটাই বা কে বললো?

- কেন? জান না বুঝি? আল্লাহইতো বলেছেন যে কোরআন সত্যি।
- এতো ত্যানা প্যাঁচাও ক্যান শুনি?

এখন ইহুদী, খ্রিষ্টান আর মুসলমানদের অনাদি উৎস আব্রাহামিক ধর্মগুলো সব একেশ্বরবাদ শিক্ষা দেয়। একজন ঈশ্বরই আসমানের আরশে বসে আছেন, তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু তৈরি করছেন ছয় দিন ধরে। আবার অন্য দিকে প্যাগান উৎস থেকে আসা হিন্দুরা লক্ষ কোটি দেব দেবীতে বিশ্বাস করে। মুসলমানেরা মূর্তি পূজাকে শিরক সমতুল্য অপরাধ মনে করে। আর অন্যদিকে হিন্দুরা বুকে পেটে গলায় ঘণ্টা বেঁধে মূর্তির সামনে জপ করতে বসে যায়। মুসলমানেরা গরু খেয়ে সাফ করে ফেলে তো হিন্দুরা তাকে মা ডেকে কূল পায় না। অন্য ধর্মের আচার ব্যবহার তুক তাক আর মন্ত্র-টন্ত্রে এত ধরণের পরস্পরবিরোধিতা থাকলে কী হবে, বিধর্মীদের ক্ষেত্রে তার হুশিয়ারি একই রকমের –

'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।'

মানে সোজা কথা হল হিন্দু ধর্মে থেকে জুতার বারি খাওয়াও বোধ হয় ভাল, অন্য ধর্মে যাওয়ার চেয়ে। কাজেই মুসলিমরা যদি পরপারে গিয়ে দেখেন, আখেরাতের ময়দানে আল্লাহ সুবানআল্লাহ তায়লা বসে নেই – বরং পীনোন্নত কালা পাহাড়সম মা-কালী খড়গ উঁচিয়ে রয়েছে এবং মোল্লা দেখলেই সমানে কোপাচ্ছে – তখন আক্কেল প্যাস্কেল কিংবা হুজুরেআলমপনা মুহম্মদ (সঃ) কারো নাম নিয়েই বোধ করি বাঁচতে পারবেন না। বলা বাহুল্য, তারা শাস্তি পাবেন নাস্তিকতার জন্য না, আগাগোড়া ভুল একটি ধর্মে বিশ্বাসের কারণে।

---

[202] মুক্তমনায় নাস্তিকের ধর্মকথার একটি পোস্টে ফরিদ আহমেদের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

এত কথার ক্যাচকেচির আর দরকার নেই, গাণিতিকভাবেই না হয় ব্যাপারটা দেখি বরং। ''ভাই আমি আপনে সবাই একদিন মইরা যামু। ধরেন ঈশ্বর থাকা না থাকার সম্ভাবনা ফিফটি ফিফটি ...'' এই সমস্যার একটা সুন্দর উত্তর অপার্থিব অনেক আগে একটা ফোরামে দিয়েছিলেন ইংরেজিতে। আমি মুক্তমনা ব্লগে বিখ্যাত 'প্যাস্কেলের ওয়েজার' নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, সেখানে এর বাংলা করেছিলাম এভাবে[203] –

> 'এই মৃত্যুর পর ঈশ্বর থাকা না থাকা – ফিফটি-ফিফটি (এটা শ্রেফ সম্ভাবনা, কোন 'ফ্যাক্ট' নয়) ব্যাপারটা আসলে কী মিন্ করে? প্রথমতঃ একজন বিশ্বাসীর কাছে এই সম্ভাবনাটাই শতকরা ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা নিয়ে হাজির হয়। আর একজন অবিশ্বাসীর কাছে তা শতকরা ০ ভাগ। অজ্ঞেয়বাদী কিংবা হাল্কা ধরণের বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা ০ থেকে ১০০এর মধ্যে যে কোন জায়গায় থাকতে পারে। এখন এই শতকরা হিসেব যাই হোক না কেন, এটা নির্দেশ করে একজন বিশ্বাসীর মনোজগতে তার (ঈশ্বরে)বিশ্বাসের স্তরকে, কোনভাবেই মৃত্যুর পর প্রকৃত ঈশ্বর থাকা বা না থাকার কোন সত্যিকার প্রোবাবিলিটি নয়। কারণ, এই সম্ভাবনার হিসেব এসেছে বিশ্বাসীদের মানসপটে থাকা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যেটা বস্তুনিষ্ঠভাবে গণনা করাই সম্ভব নয়, প্রমাণ তো পরের কথা। কাজেই এই 'ফিফটি-ফিফটি' এনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ বড় সড় হেত্বাভাস দোষে দুষ্ট, কারণ, মানসজগতে বিশ্বাসের স্তরের উপর ভিত্তি করে কোন কিছু অস্তিত্ব প্রমাণের যুক্তি নির্মিত হওয়া উচিৎ নয়, সেটা বরং হওয়া উচিৎ বৈজ্ঞানিক কিংবা বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ সাপেক্ষে।
>
> এখানে ধরেই নেয়া হচ্ছে ফিফটি-ফিফটি চান্স-এর যুক্তি (যেটা আসলে কুযুক্তি উপরেই দেখান হয়েছে) উপস্থাপন করলেই বিশ্বাসের উপকারিতা বুঝা যাবে আর অবিশ্বাসের বিপদের আলামত পাওয়া যাবে। সেই কত শতক আগে প্যাস্কেলের এই বাজিকে খণ্ডন করে দেয়া হয়েছে, অথচ সেটা এই শতাব্দীতেও বিশ্বাসীদের হৃদয়ে সেটা দোলা দিয়ে চলেছে অবলীলায়। প্যাস্কেলের বাজির আরেকটা বড় ত্রুটি হল – যদি ধরেও নেয়া হয় মৃত্যুর পরে পরকাল বলে কিছু একটা আছে, তারপরেও প্রমাণিত হয় না যে একটা নির্দিষ্ট ধর্মই (religion-X) প্রকৃত ধর্ম। যেহেতু ঐ ধর্মের বাইরেও আরো ধর্ম (religion-Y, Z etc..) আছে আর সেগুলো ও তাদের মত করে পরকালকে নির্দেশ করে, কাজেই যে কোন একটা ধর্মকে সত্য মনে করে সার্বজনীন ভীতি তৈরি করা আর এর প্রেক্ষিতে মনের মাধুরী মিশিয়ে যুক্তি সাজানো আসলে প্রতারণার নামান্তর।'

---

[203] অভিজিৎ রায়, প্যাস্কালের ওয়েজার- আস্তিক হওয়াটাই কি একমাত্র নিরাপদ বাজি?, মুক্তমনা, জুন ২৮, ২০১২

কিন্তু মুশকিল হল কোন বিশ্বাসীকেই এই লজিকের দুর্বলতা বোঝানো যাবে না। তারা প্যাস্কেলের মতোই ধরে নেন তাদের ধর্মের ঈশ্বরই প্রকৃত ঈশ্বর; আর বাকি সব ঝুটা হ্যায়। ইংরেজিতে এই ধরণের হেত্বাভাসকে বলে 'fallacy of false dilemma/false dichotomy/bifurcation'। অন্য সব অপশনকে বাতিলের খাতায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরটাকে উপরে তুলে ধরা। বাংলা ব্লগে এই প্রজাতির একটা মজার নাম আছে – 'আল্লামা তালগাছবাদী'!

এই (চাপা)বাজির ক্রাইটেরিয়াই বা কী? কেউ বাজি ধরতে চান, সে ভালা কথা। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট 'ক্রাইটেরিয়া' ছাড়া বাজি ধরার তো কোন মানে নাই। আস্তিকতা একটা ব্যাপক আর বিস্তৃত বিষয়। একটা হিন্দুকেও আমরা আস্তিক বলি, একটা মুসলিমকেও বলি আস্তিক। এখন হিন্দুর আস্তিকতা আর মুসলমানের আস্তিকতা তো এক না। অথচ প্যাস্কেলের বাজিতে সবাইকেই এক করে দেখানো হয়েছে আর ধরে নেয়া হয়েছে নাস্তিক হলেই যেন পরপারে 'গরম অগ্নিকুণ্ড'। এক আস্তিকের সাথে আরেক আস্তিকের বিশ্বাসের বিরোধগুলো চেপে যাওয়া হয়েছে। এটা কোন বাজির ক্রাইটেরিয়া হল নাকি? আরো গুরুতর সমস্যা হইল, নাস্তিক হলেই সর্বনাশ, এই বিশ্বাসেরই বা হেতু কী? মনে পড়ে, আমি একবার ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম, এরকমের –

> 'ভেবে দেখলাম, আমাদের মহান ঈশ্বর হচ্ছেন নাস্তিককূলশিরোমনি, মানে সবচেয়ে বড় নাস্তিক (কারণ উনি বিশ্বাস করেন না যে কোন সৃষ্টিকর্তা তাকে বানিয়েছে),আমি নিবিষ্ট মনে তার দেখানো পথই অনুসরণ করছি মাত্র'।

সত্যিই তো দুর্মুখেরা বলবেন, যে সৃষ্টিকর্তা নিজেই নাস্তিক, তিনি নাস্তিকদের গরম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন, আর আস্তিক-মোল্লাদের মাথায় করে রাখবেন, এটা কি এত সহজেই মেনে নেয়া যায়?

আর তাছাড়া যাকে আমরা এত ঘটা করে 'ঈশ্বর' উপাধি দিচ্ছি, তার ঘটে তো একটু বুদ্ধিশুদ্ধিও আমরা আশা করি, নাকি! যে মোল্লারা নির্বিবাদে জিহাদ, জাতিভেদ, শরিয়া, ক্রুসেড সব কিছু বিশ্বাস করছে, নারীদের শস্যক্ষেত্র বানিয়ে রেখেছে, নাইন ইলেভেন ঘটিয়েছে, গুজরাতে দাঙ্গা লাগিয়েছে, পয়লা বৈশাখে রমনা বটমূলে গিয়া বোমা মেরেছে, চার্চে বসে শিশুকামিতা করেছে, গাছের মগডালে বসে ননী চুরি আর কৃষ্ণলীলা করেছে, নাবালিকা আর পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করে আদর্শ স্থাপন করেছে, বিধর্মীদের মুরতাদ আখ্যা দিয়েছে, চোখ বন্ধ করে হুমায়ুন আজাদকে কিংবা থাবা বাবাকে কুপিয়েছে, পুরো পৃথিবীটাকে আবর্জনার গোডাউন বানিয়ে রেখেছে – মহান ঈশ্বর পঙ্গপালের মতো তাদেরকে বেহেস্তে পাঠাবে, আর যারা যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করে এই অমানবিকতা আর নাফরমানির বিরোধিতা করল, তাদের স্থান নাকি হবে

দোজখে। এতো বড় অন্যায় কি 'প্রকৃত ঈশ্বর' করতে পারেন? সহজ বোধশক্তিতেই সেটা অসম্ভব বলে মনে হয়। কে জানে – তাঁর কাছে হয়তো যুক্তিবাদীরাই সবচেয়ে আপন, কারণ তারা এই পৃথিবীতে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করেছে, ভেড়ার পালের মতোন গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় নাই। তাদেরই তো ঈশ্বরের পরীক্ষায় ফুলমার্ক পেয়ে পাশ করার কথা। সংশয়বাদী রিচার্ড ক্যারিয়ার ২০০২ সালে একটা প্রবন্ধ লিখছিলেন, শিরোনাম 'প্যাস্কেলের ওয়েজারের সমাপ্তি – কেবল অবিশ্বাসীরাই স্বর্গে যাবেন'। সেই প্রবন্ধ থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ বয়ান করা যাক[204] –

> "Therefore only intellectually committed but critical nontheists (nonbelievers) are genuinely good and will go to heaven. Therefore, if a god exists, his silence and allowance of evil are explained and justified by his plan to discover the only sorts of people who deserve to populate heaven: sincere nontheists. And this makes perfect sense of many mysteries, thus explaining what theists struggle to explain themselves."

একই কথা বলেছেন ম্যাসিমো পাগ্লিউসি তার 'Pascal's Wager: Is It Safer To Believe In God Even If There Is No Proof That One Exists?' প্রবন্ধে একটু ভিন্নভাবে[205]। এই প্রবন্ধ থেকে কিছু লাইন –

> "Many Agnostics, for example, have evaluated all the "proofs" for God's existence, and all of the 'proofs' of God's non-existence. They conclude that neither belief can be substantiated. They feel that they cannot rationally believe in the existence or non-existence of God; they must remain Agnostic. Under these conditions, a person can only believe in God if they violate their honesty. And God might punish a lack of honestly more severely than not being able to believe in God.
>
> It can also be argued that if people believe something on insufficient evidence, that the result is the promoting of credulity – something that harms society. Again, that could be a sin that God is particularly concerned about punishing."

---

[204] Richard Carrier, The End of Pascal's Wager: Only Nontheists Go to Heaven (2002), http://infidels.org/library/modern/richard_carrier/heaven.html

[205] Massimo Pigliucci, Pascal's Wager: Is It Safer To Believe In God Even If There Is No Proof That One Exists?, http://www.religioustolerance.org/pascal_w.htm

সারমর্ম হল – আসল ঈশ্বরের নিশ্চয় মাথা খারাপ না যে, কেউ বিনা প্রমাণে সমাজের যাবতীয় অপবিশ্বাস আর কুবিশ্বাসে বিশ্বাসী বলেই তাকে আদর করে বেহেস্তে পাঠিয়ে দেয়া হবে, আর নাস্তিক যুক্তিবাদীদের জায়গা হবে নরকে। বরং আমিতো বলব, অবিশ্বাসীরা ইহজগতে সে কাজটাই ভালমতো করছে যা ঈশ্বরের পছন্দ – মানবিকতা, যুক্তিবাদ আর মুক্তবুদ্ধির চর্চা। কাজেই, অবিশ্বাসী নাস্তিকেরাই 'ঈশ্বরের পরীক্ষা'য় পাশ করে বেহেস্তে যাওয়ার দাবীদার!

ঈশ্বরের পরীক্ষাটা আসলে কি ধরণের পরীক্ষা? ঈশ্বরের পরীক্ষার কথা যখন আসলোই আরো একটা মজার ব্যাপার মনে হল। আরজ আলী মাতুব্বর তার 'সত্যের সন্ধান' গ্রন্থে লিখছিলেন –

> 'বলা হয় যে, ঈশ্বরের অনিচ্ছায় কোন ঘটনা ঘটে না। এমনকি গাছের পাতাটিও নড়ে না। বিশেষত তাঁর অনিচ্ছায় যদি কোন ঘটনা ঘটতে পারে তাহা হইলে তাঁহার 'সর্বশক্তিমান' নামের সার্থকতা কোথায়? আর যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই সকল ঘটনা ঘটে তবে জীবের দোষ বা পাপ কী?'

এখন ঈশ্বরের অনিচ্ছায় যদি কোন ঘটনা না ঘটে, তাইলে প্যাস্কেলের পুরো বাজিই একটা তামাসায় পর্যবসিত হয়ে যায়। ঈশ্বর যেহেতু সর্বজ্ঞ, তিনি নিশ্চয় জানেন কে আস্তিক হবে আর কে নাস্তিক। যে লোকটা নাস্তিক হচ্ছে, সে আসলে কিন্তু প্রকারান্তরে কোন না কোনভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা আর উদ্দেশ্যই পূরণ করছে। কারো সাধ্য আছে কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার? নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে গেলে তো তার 'সর্বশক্তিমান' খেতাবটাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। তাই ঈশ্বর হয়তো সত্যই চান যে নাস্তিকেরা নাস্তিকই থাকুক। এই দিক দিয়ে চিন্তা করলে প্যাস্কেলের বাজি কিন্তু ভোজবাজি মিলিয়ে যেতে বেশি দেরী লাগে না।

আসলেই কি বিশ্বাসে কিছুই হারানোর নেই? এখন কথা হচ্ছে যদি কোন ঈশ্বর কেবল অন্ধবিশ্বাসী হবার কারণে কাউকে পুরস্কৃত করে, আর অবিশ্বাসীকে কঠিন শাস্তি দেয়, তাহলে সেই ঈশ্বর তো আসলে স্তাবকতাপ্রিয় ঈশ্বর। ইনি চাটুকারিতা পছন্দ করেন। একটা লোক ইহজীবনে কেমন ছিল, কী করল, মানুষের জন্য ভালো কাজ করেছে নাকি করেনি, সেগুলো বিবেচনা না করে সারা জীবন ধরে চাটুকারিতা করেছে কিনা এইটাই যদি হয় একমাত্র ক্রাইটেরিয়া – তাহলে কোন সুস্থ-বুদ্ধির লোক তাকে 'ঈশ্বর' নামে ডাকার চেয়ে বিশ্ববেহায়া স্বৈরাচারী এরশাদের মত কিছু একটা নামেই হয়তো ডাকবে।

অনেকেরই মনে আছে বোধ করি আশির দশকে এরশাদের শাসনামলে মওদুদ, শাহ মোয়াজ্জেম এবং কাজী জাফরের মতো লোকজন মধুর লোভে মধুমক্ষিকার মতোন

সারাটা সময় এরশাদকে ঘিরে থাকতেন। কিন্তু বুদ্ধিবিবেচনা সম্বলিত মানুষজনের কাছে তিনি ছিলেন একজন দুর্নীতিবাজ পতিত স্বৈরশাসক। পতিত স্বৈরশাসকের প্রতি অন্ধ আনুগত্য যেমন নিজের বিচারবুদ্ধি, বিবেচনাবোধ এবং মানবিকতাকে ধ্বংস করে দেয়, ঠিক তেমনি প্যাস্কেল এবং তার অনুসারীদের 'স্তাবকতাপ্রিয় ঈশ্বরে' বিশ্বাস করলে, তার প্রতি অন্ধ আনুগত্য আনলে আসলেই সমস্যা। 'পরকালে কিছুই হারানোর নাই' বলে কেউ নিজেকে প্রবোধ দিলেও তিনি মূলত মানুষ হিসেবে চিন্তা করার ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলবেন এরকমের অন্ধ আনুগত্যের ফলে। চাটুকারিতার কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ করে তিনি তার সততা হারাবেন, সাহস হারাবেন, নিষ্ঠা হারাবেন, হারাবেন সুস্থ বিচারবোধ। তারপরেও কেউ বলবেন তার কিছুই হারানোর নেই? দার্শনিক জর্জ স্মিথ তার 'Atheism: The Case Against God' বইয়ে সেজন্যই বলেছেন[206] –

> '[ঈশ্বরের প্রতি অন্ধ আনুগত্যে] আমরা কী হারাবো? আমরা হারাবো বৌদ্ধিক সততা, আত্মসম্মানবোধ, হারাবো একটা চৌকস জীবন-দর্শন। সংক্ষেপে, জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাতে যা যা লাগে, সবই হারিয়ে ফেলব আমরা। না প্যাস্কেলের ওয়েজার কোন নিরাপদ বাজি নয়, বরং এটি জীবন আর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে কেনা ছলনা।'

বিশ্বাস ও শিশু নিপীড়ন

একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। শিশুদের প্রসঙ্গে। আমরা কথায় কথায় আমাদের শিশুদের পরিচয় উদ্ধৃত করে বলি 'মুসলিম শিশু', 'খ্রিস্টান শিশু', 'হিন্দু শিশু' ইত্যাদি। অথচ, যে শিশুটিকে মুসলিম, খ্রিস্টান বা হিন্দু পরিচয়ে বড় করা হচ্ছে তার পুরোটুকুই আসলে ছোটবেলা থেকে অভিভাবকের জোর করে চাপানো। স্বাধীনভাবে বুঝে শুনে শিশুকে ধর্ম গ্রহণের অধিকার দেয়া হয়নি, বরং ছোটবেলা থেকে বুদ্ধি শুদ্ধি হবার আগেই ধর্মীয় সবক শুনিয়ে করা হয়েছে ব্রেন ওয়াশ! চিন্তা করে দেখুন, প্রাত্যহিক জীবনে অন্য অনেক কিছুই আমরা শিশুদের থেকে দূরে রাখি – তার পর্যাপ্ত বয়স হয়নি বলে, অথচ ধর্মের বেলায় নিয়ম কানুন একদম উল্টো। সঠিকভাবে চিন্তা করলে বলতেই হয় – 'মুসলিম শিশু' বলে কিছু নেই, বলা উচিৎ 'মুসলিম অভিভাবকের শিশু'। ঠিক তেমনি 'খ্রিস্টান সন্তান' না হয়ে হওয়া উচিৎ 'খ্রিস্টান পিতামাতার সন্তান'। হিন্দুদের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু কে বুঝবে সেটা! নিজের 'বিশ্বাসের ভাইরাস' শিশুদের মানসজগতের উপর জোর খাটিয়ে প্রবেশ করানো যে একধরণের পীড়ন – এই বোধটুকুই আমাদের সমাজে গড়ে উঠেনি। তবে, আশার কথা যে, পশ্চিমা বিশ্বে মানবতাবাদী এবং যুক্তিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে এ নিয়ে কিছুটা

---

[206] George H. Smith, Atheism - The Case Against God, Prometheus Books, 1979

প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন, বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক রিচার্ড ডকিন্স এই জোর করে অভিভাবকদের নিজেদের (অপ)বিশ্বাস এবং ধর্মীয় আচার আচরণ ও প্রথা শিশুর উপর চাপিয়ে দেয়াকে খুব সঠিকভাবেই এক ধরণের 'শিশু নিপীড়ন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন তার 'গড ডিলুশন' বইয়ে[207], এবং এ নিয়ে সবাইকে সচেতন হতে পরামর্শ দিয়েছেন।

মুক্তমনা সদস্য অভীক দাশ একবার একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন মুক্তমনায় 'ধর্ম:শিশু নির্যাতনের এক স্বীকৃত হাতিয়ার' শিরোনামে। প্রবন্ধটির, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি শব্দ এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে পুরো প্রবন্ধটি এখানে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি[208] –

শিরোনাম দেখে আপনাদের অনেকেই ভাবছেন আমি হয়তো পশ্চিমা চার্চগুলোর যাজকদের দ্বারা শিশু নির্যাতনের কথা বলছি। আসলে তা নয়। আমি এখানে বোঝাচ্ছি শিশুকে মানসিকভাবে পরিণত হওয়ার আগেই একটি ধর্মীয় বিশ্বাস চাপিয়ে দেয়াও এক প্রকারের 'শিশু নির্যাতন'। আমেরিকা, ইউরোপের বিভিন্ন চার্চে শিশুদের উপর যাজকদের চালানো যৌন নির্যাতনের ভয়াল কাহিনি আমরা প্রায় সবাই শুনেছি। পাশের দেশ ভারতেও ফাঁস হয়ে গেছে প্রভাবশালী ধর্মগুরু নিত্যানন্দের যৌন কেলেঙ্কারির কথা। আমাদের দেশেও মাদ্রাসায় হুজুর কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীদের যৌন নির্যাতিত হওয়ার ঘটনার খবর কদিন পরপরই পত্রপত্রিকায় আসে। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় পাপের ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে এসব শিশুদের ঘটনা চেপে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কখনো আবার হুজুর নিজের পক্ষে সাফাই গাইতে থাকেন এভাবে, "আমার উপর শয়তান ভর করেছিল। এতে আমার কি দোষ"। আমরা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টকেও দেখেছি ভ্যাটিকানের যাজক, কার্ডিনালদের কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দেয়ার জন্য ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে। তারা এমনও দাবি করেছে যে শিশুরাই যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পছন্দ করে। নির্যাতনকারী নরপশুরা ভালভাবেই জানে, শিশুদের মনে এই ভয় কতটা প্রবলভাবে কাজ করে। এমন ঘটনা ওই শিশুদেরকে মানসিকভাবে যে আঘাত হানে, সে আঘাত অনেক ক্ষেত্রে তারা সারা জীবনেও কাটিয়ে উঠতে পারে না। একইভাবে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল কোন শিশুর মস্তিষ্কে, কোন কিছু বোঝার মত বয়স হওয়ার আগেই কোন ধারণা বা বিশ্বাস চাপিয়ে দেয়াটাও কিন্তু শিশুদের জন্য কম ক্ষতিকর নয়।

কারও ধ্যান-ধারণাকে নিজের সন্তানের উপর চাপিয়ে দেয়ার কোন অধিকার যে কারও নেই সেটা লেবাননের বিখ্যাত কবি কাহলিল জিবরান তার 'On Children' কবিতায়ও উল্লেখ করেছেন –

---

[207] Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt, 2006

[208] অভীক, ধর্মঃ শিশু নির্যাতনের এক স্বীকৃত হাতিয়ার, মুক্তমনা, ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১২

'তোমার সন্তানেরা তোমার সন্তান নয়।
জীবনের নিজের প্রতি নিজের যে তৃষ্ণা, তারা হলো তারই পুত্রকন্যা।
তারা তোমাদের মাধ্যমে আসে, তোমাদের থেকে নয়।
এবং যদিও তারা থাকে তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু তাদের মালিক তোমরা নও।
তুমি তাদের দিতে পারো তোমার ভালোবাসা,
কিন্তু দিতে পারো না তোমার চিন্তা, কারণ তাদের নিজেদের চিন্তা আছে।
তুমি তাদের শরীরকে বাসগৃহ জোগাতে পারো, কিন্তু তাদের আত্মাকে নয়।
কারণ তাদের আত্মা বাস করে ভবিষ্যতের ঘরে। যেখানে তুমি যেতে পারো না,
এমনকি তোমার স্বপ্নের মধ্যেও নয়।

তুমি তাদের মতো হওয়ার সাধনা করতে পারো, কিন্তু
তাদের তোমার মতো বানানোর চেষ্টা কোরো না।
কারণ জীবন পেছনের দিকে যায় না, গতকালের জন্যে বসেও থাকে না।
তোমরা হচ্ছ ধনুক, আর তোমাদের সন্তানেরা হচ্ছে ছুটে যাওয়া তির।
ধনুর্বিদ অনন্তের পথে চিহ্নের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যেন তার তির ছোটে
দ্রুত আর দূরে।

তুমি ধনুক, তুমি বাঁকো, ধনুর্বিদের হাতে তোমার বেঁকে যাওয়া যেন আনন্দের জন্য হয়।
তিনি কেবল চলে যাওয়া তিরটিকে ভালোবাসেন তা-ই নয়,
তিনি তো দৃঢ় ধনুকটিকেও ভালোবাসেন।'

ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা যেখানে তাদের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে শিশুদের অধিকার রক্ষায়, সেখানে আমরা দেখতে পাই ধর্মীয় প্রভাবের কারণে বিভিন্নভাবে সারা বিশ্বেই শিশু নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে চলেছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার ধর্মাচারণে বাধ্য করানোর মাধ্যমেই এই ধরণের নির্যাতন শুরু হয়। ধর্মানুষ্ঠান, ধর্ম প্রচার, ধর্মীয় পুস্তকাদির মাধ্যমে সব ধর্মেই চেষ্টা চালানো হয়, কীভাবে ছোট থাকতেই শিশুদের দিয়ে নিয়মিত ধর্মচর্চা চালানো যায়। মস্তিষ্কে শুরুতেই এমন বেড়ি পড়িয়ে দেয়ার পরিণতি এতটাই ভয়ানক হতে পারে যে, মানুষ বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুক্তিপূর্ণ নিয়মনীতি দেখলেও অনেক সময় নিজের পূর্ববর্তী ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা এভাবেই তাদের মাথায় তখন জাঁকিয়ে বসে। শিশুরা তাদের পিতামাতা, আপনজনদের কাছ থেকে যা শোনে তাই বিশ্বাস করে। ঈশ্বর ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, যীশু ঈশ্বরের পুত্র, যীশু পানির উপর হাঁটতে পারতেন, যীশু মৃত্যুর তিন দিন পর আবার বেঁচে উঠেছিলেন, রামায়ণ-মহাভারত হল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, গীতা হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাক্য, দশাবতারচরিত, জন্মান্তরবাদ (মৃত্যুর পর কর্মফল অনুযায়ী আবার জন্ম

হওয়া), কোরআন আল্লাহর বাণী, নবী মুহাম্মদের উপর কোরআন নাজেল হয়েছিল, নবীর আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি; বলা যায় বড়রা নিজেরা যেটাই বিশ্বাস করে সেটাকেই শিশুদের মনে ঢুকিয়ে দিতে না পারলে শান্তি পায় না। প্রাপ্তবয়স্করা তখন নিজেদের জাতি, বর্ণ, গোত্র বা ধর্ম রক্ষার নামে শিশুদেরকে যুদ্ধের ময়দানে সহজেই টেনে আনতে পারে। আল কায়েদা তাদের বাহিনীতে শিশুদের আকৃষ্ট করানোর জন্য এখন জিহাদি কার্টুন পর্যন্ত প্রচার শুরু করেছে। শুধু ২০০৪ সালেই সারা বিশ্বে প্রায় ৩ লক্ষ শিশু বিভিন্ন বাহিনীতে যোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু দেখা গেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে শিশুদের ব্যবহার যখন ধর্মের নামে করা হয় তখন জাতিসংঘ, এর অঙ্গ সংগঠন ও প্রায় সকল দেশের সরকারই নিশ্চুপ হয়ে থাকে।

ধর্মীয় শিক্ষা যে আরেকটি ক্ষেত্রে শিশু নির্যাতনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে, সেটা হল লিঙ্গ বৈষম্য সৃষ্টি। এর মাধ্যমে ছেলে ও মেয়েদের অধিকারের মধ্যে অসমতা তৈরি হয়। জাতিসংঘ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলো কিভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারী শিক্ষার প্রসারের কথা ভাবতে পারে যেখানে মেয়েশিশুদের ঘরের বাইরেই যেতে দেয়া হয় না। পাকিস্তান, আফগানিস্তানের তালিবান অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে মেয়েদের স্কুলে নিয়মিত বোমা হামলা চালানো হয়। কখনো বা ছড়িয়ে দেয়া হয় বিষাক্ত গ্যাস, যাতে পিতামাতারাও মেয়ে সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহ হারায়। কেবল নারী শিক্ষার পক্ষে কথা বলার কারণে পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকার মিনগোরাতে ১৪ বছর বয়সী মালালা ও তার দুই বান্ধবীকে তাদের স্কুলের সামনে গুলি করেছিল তালেবান জঙ্গিরা ২০১২ সালে, এটা বিশ্ববাসী দেখেছে। একথা মানতে অনেকেই নারাজ যে ধর্মগুলো তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের প্রচার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। হোক সেটা পশ্চিমের সানডে স্কুল বা আমাদের দেশের মক্তব, মাদ্রাসা। আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় মাদ্রাসায় পুলিশ তল্লাশি করলেই পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন রকম দেশীয় অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম। জেএমবির মত জঙ্গি সংগঠনগুলো মাদ্রাসাগুলোকেই বেছে নিয়েছিল তাদের ট্রেনিং ক্যাম্প হিসেবে। তাই মাদ্রাসার প্রতিশব্দই হয়ে গিয়েছিল 'জঙ্গি তৈরির কারখানা'। এখন কোন শিশুকে যদি শিশুকালেই পাঠিয়ে দেয়া হয় কোন মাদ্রাসায় তবে মাদ্রাসা থেকে বের হওয়ার সময় তার মানসিকতা কেমন হতে পারে তা অনুমান করা কঠিন কিছু নয়।

কোন কাজটি ভাল আর কোন কাজটি মন্দ, একটা শিশুকে এমনটা শেখানো খুব কঠিন কোন কাজ নয়। আর মন্দ কাজটি কেন মন্দ এটাও বুঝিয়ে বললে একটা শিশুর মন খুব সহজেই তা গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ অন্যের কোন জিনিস তার অজান্তেই নিয়ে আসা বা চুরি করা কেন খারাপ কাজ এবং এমনটা করা কেন উচিত না তা খুব সহজেই একটি শিশুকে বুঝিয়ে বলা যায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার পরিবর্তে শিশুকে যদি শুধু এমন শিক্ষা দেয়া হয়, "খবরদার, চুরি করবি না। তাইলে আল্লাহপাক গুনাহ

দিবে'' বা ''চুরি করলে মৃত্যুর পর দোযখে গিয়ে আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হতে হবে'' তাহলে ওই শিশুর মানসিক অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে। সেই সাথে চুরি করাটা কেন একটি খারাপ কাজ বা কেন এ ধরণের কাজ করা উচিত নয় তা সম্পর্কেও কিন্তু শিশুটি অজ্ঞই থেকে যাচ্ছে। একটা শিশুর মনের বিকাশ হওয়ার আগেই নরক বা দোযখের মত ভয়ঙ্কর একটি বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কী প্রয়োজন থাকতে পারে? তাছাড়া নরক, জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে কারও নৈতিকতার উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। ''এরকম কাজ কোরো না, কেউ একজন তোমাকে দেখছে। তোমাকে পরে শাস্তি পেতে হবে'', এটা নৈতিকতা শেখানোর কোন গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হতে পারে না। একবার ভেবে দেখেছেন কি? বৌদ্ধধর্মে তো স্বর্গ-নরক, বেহেশত-দোযখ বলে কিছু নেই। তাহলে তারা তাদের শিশুদের কিসের ভয় দেখিয়ে খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে? শিশুকাল থেকেই যখন ভয়ের মধ্য দিয়ে কোন শিশু বড় হতে থাকে, সে আর দশজন সাধারণ শিশুর মত স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। আমরা কয়েক বছর আগে পাঁচ কি ছয় বছরের শিশু ফাহাদের ঘটনা দেখেছিলাম। এক মাদ্রাসা শিক্ষক 'কবরের আযাব' শীর্ষক একটি ভিডিও ফাহাদকে দেখিয়েছিল। যেখানে দেখানো হয় মৃত্যুর পর আত্মাকে কতটা ভয়ঙ্কর উপায়ে শাস্তি দেয়া হয়। ওই ভিডিওটি দেখার পর ফাহাদ তার মানসিক ভারসাম্য পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছিল। ভিডিওটিতে ভয়ঙ্করভাবে চিত্রায়িত অত্যন্ত ভায়োলেন্ট দৃশ্যগুলি তাকে সবসময় তাড়িয়ে বেড়াতে থাকে। তার সমবয়সী খেলার সাথীরা যখন মাঠে খেলত, তখন সে নিজের বাসাতেই বসে থাকত। অসহায় বাবা-মারও তখন আর কিছুই করার ছিল না। তারা নিজেরাই যে নিজেদের সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠানোর মাধ্যমে এমন বিভীষিকাময় পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। যখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন, ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রিচার্ড ডকিন্সের উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠির মাধ্যমে আমরা আরও একজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মহিলার কাহিনি জানতে পারি। যিনি বড় হয়েছিলেন একটি রোমান ক্যাথলিক পরিবারে, আর সাত বছর বয়সেই এক যাজকের লালসার শিকার হয়েছিলেন। তার কাছ থেকে জানা যায় ওই তিক্ত অভিজ্ঞতা যেমন তার জীবনে বিভিন্ন সময়ই তাড়িয়ে বেড়িয়েছে তেমনি আরও একটি ঘটনা তাকে শিশুকালে আরও বেশি আঘাত করেছিল। ছোটবেলাতেই তার সবচেয়ে কাছের বন্ধুটি মারা যায়। বন্ধু হারানোর বেদনা তাকে যতটা ব্যথিত করেছিল তার চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক ছিল তখন, যখন সে জানল তার বন্ধুটিকে যেতে হয়েছে নরকের অগ্নিকুণ্ডে। কারণ সে ক্যাথলিক ছিল না। তার ভাষায়, ''প্রায়ই রাতে দুঃস্বপ্ন হয়ে এটা আমার কাছে আসত, ভাবতে খুব কষ্ট হত যে আমার অত্যন্ত কাছের মানুষদের নরকে যেতে হচ্ছে''। একবার ভাবুন তো, কোন মা তার সন্তানকে বলছে, ''বাবা, তোমার সেলিম চাচা খুব ধার্মিক ছিলেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, নিয়মিত রোজা

রাখতেন। বেশ কয়েকবার হজ্ব করে এসেছেন। উনি মারা যাওয়ার পর আল্লাহ উনাকে সোজা বেহেশতে নিয়ে গেছেন। কিন্তু তোমার হালিম চাচা বেনামাজি ছিলেন। তিনি রোজাও ঠিকমত রাখতেন না। তাই উনি মারা যাওয়ার পর তাকে দোযখে যেতে হয়েছে"। এমন কথা শোনার পর শিশুটির মনের অবস্থা কিরূপ হতে পারে তা আপনিই অনুমান করুন। বিশেষ করে শিশুটি সেলিম চাচা অপেক্ষা তার হালিম চাচাকেই যদি বেশি পছন্দ করে তখন?

শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রদান নিয়ে যত অনাকাঙ্ক্ষিত সব ঘটনা ঘটে থাকে সেগুলো বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। যেহেতু ধর্ম এগুলোর সাথে লেগে আছে তাই এই ধরণের অনাচার নিয়ে কেউই নিজের মুখ খুলতে চায় না। শিশুদের শৈশবের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো কেড়ে নেয়ার মাধ্যমে ধর্ম তাদের কতটা ক্ষতিসাধন করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী কেটি পেরি ছোটবেলার কথা স্মৃতিচারণ করে একবার বলেছিলেন,

> "ধার্মিক ও রক্ষণশীল ক্যাথলিক পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে যে বয়সে আমার ডিজনি বা হ্যান্স অ্যান্ডারসনের ফেইরি টেল পড়ার কথা ছিল, সেই সময়টার পুরোটাই আমার পরিবার নষ্ট করিয়েছে আমাকে বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তক পড়িয়ে।"

এমন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি জীবনের পরবর্তী সময়ে অনেকেরই হয়েছে। শিক্ষাবিদ টিনা ব্রুস এ প্রসঙ্গে বলেন –

> "আপনি যদি আপনার শিশুর মাথায় ধর্মীয় কুসংস্কার প্রবেশ না করান তবে প্রকৃত জ্ঞান রাখার জন্য অনেকখানি জায়গা পাওয়া যায়"।

মানসিক নির্যাতনের সাথে ধর্ম শিশুদের শারীরিক নির্যাতনকেও উৎসাহ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রথমেই যে উদাহরণটি আসে সেটি হল ইসলাম ও ইহুদি ধর্মের Genital Mutilation বা Circumcision বা খৎনা প্রথা। ধর্মগুলো চায় শুধু মানসিকভাবে নয়, বরং শারীরিকভাবেও নিজের অনুসারীদেরকে ধর্মীয় চিহ্ন বহন করতে হবে। কোন শিশুর শরীরের সংবেদনশীলতম অঙ্গে ছুরি চালানোকে একটি সভ্য সমাজ কিভাবে গ্রহণ করে তা বুঝতে পারা আসলেই কষ্ট সাপেক্ষ। কিন্তু ধর্মীয় নির্দেশ বলে কথা। এই বীভৎস প্রথাটির শিকার কিন্তু শুধু ছেলে শিশুরাই হয় না। সোমালিয়া, সুদান, গিনি, চাদসহ আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম দেশে আজও মেয়ে শিশুদের উপর ধর্মের নামে এমন নারকীয় নির্যাতন চালানো হয়। ধর্মীয় নির্দেশ যত বর্বরই হোক না কেন, এটাকে গ্রহণযোগ্যভাবে উপস্থাপন করার জন্য, এটাকে শরীরের জন্য উপকারী দাবি করে ধর্মবাদীরা এই বীভৎস প্রথাটির পিছনেও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা নিয়ে আসে। এখানে একটি প্রশ্ন তোলা যায়। শরীর-স্বাস্থ্যের উন্নতির উদ্দেশ্যে জন্মের পর যদি এই ধরণের অঙ্গহানি ঘটাতেই হয়, ঈশ্বর তবে কি মানুষের শরীরকে যথেষ্ট নিখুঁত করে

ডিজাইন করেন নি? নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষ ধর্মের অনুসারীদের যাতে আলাদা করতে সুবিধা হয় সেরকম দূরদর্শী চিন্তা মাথায় রেখেই এই ধরণের অঙ্গহানির নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন?

ধর্মগুলো মানুষকে শিশুকালেই এমন শিক্ষা দিয়ে দেয় যে তার ধর্মই একমাত্র সত্য। একমাত্র তার ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারীরাই মৃত্যুর পর স্বর্গে বা বেহেশতে পৌঁছতে পারবে। বাকি সবার স্থান হবে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে। সে এবং তার ধর্মের জাতভাইরা উৎকৃষ্ট, বাকিরা সবাই নিকৃষ্ট। শুরু থেকেই অন্যদের প্রতি এমন ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়াই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। আমরা কি পারি না শিশুদের অন্যদেরকে ভালবাসতে শেখাতে বা মানুষ-মানুষের মধ্যে বৈষম্য না করতে?

আমরা শিশু বিবাহের (বাল্যবিবাহ) বিরুদ্ধে অবস্থান নেই, কারণ বিবাহের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হতে হয়। আবার আমরা শিশুদের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডেও (যেমন নির্বাচন) অংশ নিতে দিই না, কারণ ভোট দেয়া বা নির্বাচনে অংশ নেয়ার মত পরিপক্কতা তাদের মধ্যে আসে নি। আমাদের এখন সময় এসেছে শিশুদের বলপূর্বক ধর্মীয় শিক্ষাপ্রদানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর। অনেকেই হয়তো বলবেন যে, এটা পিতামাতার উপর ছেড়ে দেয়া উচিত। কিন্তু, ধর্মীয় শিক্ষার কারণে উদ্ভূত শিশু নির্যাতনের বিষয়টি আমাদের চিন্তার উদ্রেক করে, সমাজে শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দেয়ার জন্য ধর্ম নামক প্রতিষ্ঠানটির আদৌ কোন প্রয়োজন বা উপযোগিতা আছে কি? এর ফলে যে একটি বিতর্কিত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। স্রেফ 'স্পর্শকাতর' বলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর এবং সাধারণ মানুষের এক্ষেত্রে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকলে বা এই বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে চলবে না। সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিশুদের অধিকার রক্ষায় অবশ্যই রক্ষণশীলতার খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে হবে। কিন্তু বাস্তবমুখী হলে আমরা দেখতে পারি আশা করা যত কঠিন আশার বাস্তবায়ন করাটা আরও অনেক বেশি কঠিন। তবে আমি স্বপ্ন দেখি যে একদিন সমাজের মানুষ জন গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিয়ে সচেতন হবে। আরও বেশি চিন্তা করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে আসবে।

ততদিনে হয়তো সারা বিশ্বের কোটি শিশুকে ধর্মের নামে নির্মম নির্যাতন নীরবে, নিভৃতে সহ্য করে যেতে হবে।

বিশ্বাসের ভাইরাস রুখতে হলে অব্যাহত রাখা দরকার ধর্মের কঠোর সমালোচনা

অনেকের মনেই এরকম একটা ধারণা জন্মে গেছে যে, ধর্ম ব্যাপারটা খুব স্পর্শকাতর, তাই কঠোর ভাষায় এর 'ব্যাশিং' করা যাবে না, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, নিন্দা করা যাবে না, সমালোচনা করা যাবেনা, এমনকি আলোচনাও করা যাবে না, করলেও করতে হবে বুঝে শুনে, মাথায় ফুল চন্দন দিয়ে।

ব্যাপারটা হাস্যকর। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যার সমালোচনা হয় না। ছাত্রদের ইতিহাস পড়াতে গিয়ে কোন ঐতিহাসিক ভয় পান না এই ভেবে যে, চেঙ্গিস খানের সমালোচনা করা যাবে না, পাছে 'চেঙ্গিসানুভূতি' আহত হয়! কেউ ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে ভাবেন না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিদের অত্যাচারের কথা কিংবা জাপানী বর্বরতার কথা অথবা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক বাহিনীর নৃশংসতার কথা বলা যাবে না। কেউ বলেন না, এতে করে কারো ইতিহাসানুভূতিতে আঘাত লাগছে, মামলা করে দেবে! প্রথম আলো কিংবা কালের কণ্ঠের মত পত্রিকা যখন প্রতিদিনই বিজ্ঞানের নামে নানা ধরণের 'আগডুম বাগডুম' পরিবেশন করে, আমরা বলি না আমরা আদালতের শরণাপন্ন হব, আমাদের 'বিজ্ঞানুভূতি' বিপন্ন। অথচ ধর্মের ক্ষেত্রে সব কিছু হয়ে যায় ব্যতিক্রম।

ধার্মিকদের ভঙ্গুর অনুভূতি সামান্যতেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ধর্মযুদ্ধের নামে বিধর্মীদের উপর কি ধরণের অত্যাচার করা হয়েছিলো তা বললে তাদের ধর্মানুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হয়, পয়গম্বর-নবী-রসুল আর ধর্মের দেবদূতদের অমানবিক কার্যকলাপ তুলে ধরলে ধর্মানুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হয়, নারীদের অন্তরিন করে তাদের অধিকার হরণ করা হয় তা বললে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত অবৈজ্ঞানিক আয়াত বা শ্লোক তুলে ধরলেও তারা আহত হন। আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হলে তো কথাই নেই; ঈশ্বর যে 'খুঁটি ছাড়া আকাশকে ছাদ স্বরূপ ধরে রাখেন' তা যেন চৌচির হয়ে তাদের মাথায় তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে পড়ে। ধর্ম সব সময়ই কৌতুকের বড় উৎস হলেও ব্যঙ্গ এবং কৌতুকবোধের ব্যাপারটা ধার্মিকদের সাথে সবসময়ই কেন যেন বিপরীত। অথচ, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি চলচ্চিত্র, খেলাধুলা বা অন্যান্য যাবতীয় বিষয়কে সমালোচনা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে তাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কেবল ধর্মের বেলাতেই গণেশ উল্টে যায় বরাবরই।

সমালোচনার ব্যাপারটা আরেকটু খোলসা করা যাক। আমাদের চারিদিকের সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখব, আওয়ামীলীগ বিএনপির সমালোচনা করছে, বিএনপি আওয়ামীলীগের। আমেরিকায় রিপাবলিকানরা করছে ডেমোক্রেটদের দর্শনের সমালোচনা কিংবা বিরোধিতা, আবার অন্যদিকে ডেমোক্রেটরা রিপাবলিকানদের। সমাজতান্ত্রিক আর পুঁজিবাদী ঘরনার লোকেরা যে যার দৃষ্টিকোণ থেকে পরস্পরের সমালোচনা করছে। সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ক্রীড়াতত্ত্ব, প্রযুক্তি – কোনটাই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়, কিন্তু ধর্মের বেলাতেই ধর্মবাদীরা যেন তালগাছটি বগলে নিয়ে বসে থাকার পণ করেছেন। তারা ধর্মের যে কোন প্রাসঙ্গিক সমালোচনা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কিংবা সংশয়কে চিরতরে নিষিদ্ধ করতে চান, কখনো ধর্মানুভূতির দোহাই দিয়ে, কখনো জনমতের দোহাই দিয়ে, কখনোবা আবার জনশৃংখলা রক্ষার ধোয়া তুলে। তারা চান ধর্মকে 'মোমের পুতুল' বানিয়ে হাতের তোলায় রেখে কিংবা পোষা বিড়ালের মতো

কোলে নিয়ে অবিরত মাথায় হাত বুলিয়ে যেতে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার অপছন্দনীয় বিষয়ের নির্দয় সমালোচনা ধর্মবাদীরা করেন না তা নয়। খুব ভালভাবেই করেন। যেটা পছন্দ না সেটা বলে ফেলেন এক নিমেষেই। তারাও আমাদের মতোই কঠোর সমালোচনা করেন, ডারউইনের গলার সাথে বাঁদরের দেহ জুড়ে দিয়ে কার্টুন আঁকেন, মেয়েরা তাদের পছন্দসই কাপড় চোপড় না পড়লে ফতোয়া দেন, একে তাকে মুরতাদ ঘোষণা করে হত্যার হুমকি দেন, এমন কিছু নেই যে তারা বাদ রাখেন, অথচ ধর্মের বেলায় তারা হাস্যকরভাবে সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম চান।

ধর্মবাদীরা অবশ্য তাদের সবকিছুকেই নিয়মের বাইরে রাখতে চান। তারা মনে করেন তাদের মহান ঈশ্বর এই বিশ্বজগতসহ সব কিছু পরম মমতাভরে বানিয়েছেন। কিন্তু যদি উল্টে কোন দুর্মুখ প্রশ্ন করে *তবে ঈশ্বরকে কে বানালো?* তখনই তারা বলবেন, ঈশ্বরকে রাখতে হবে নিয়মের বাইরে। 'ও সব প্রশ্ন কোরোনা – বোবা কালা হয়ে থাক'। একই ধারায় তারা চান পৃথিবীর সবকিছুর সমালোচনা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ চলবে, কেবল ধর্মের বেলায় – নৈব নৈব চ। আসলে ধর্মবাদীদের এই ছেঁদো যুক্তিতে কান দিয়ে শুধু ধার্মিকেরা নন, আমরা মুক্তমনারাও অনেক সময় নিজেদের অজান্তেই তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলি এবং পরিশেষে আমাদের পতন ডেকে আনি। এ ব্যাপারটি সম্প্রতি স্পষ্ট করেছেন .আইনজীবী এবং মানবাধিকার কর্মী এডওয়ার্ড তাবাস। ফ্রি ইনকোয়েরি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত 'Atheist Must Not Self-Censor' শিরোনামের প্রবন্ধে নাস্তিকদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছেন – ধার্মিকদের কু যুক্তির কাছে মাথা নত করে নমনীয় হবার কিছু নেই[209]। আসলে এমন কোন যুক্তি কারো থলিতে নেই যা মেনে ধর্মকে সমালোচনার চোখে দেখার থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায়। বরং প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই রয়েছে অমানবিকতা এবং নৃশংসতার ছড়াছড়ি। আছে নারীদের অন্তরিন রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা, আছে বিধর্মীদের প্রতি হুঙ্কার, আছে নিম্নবর্ণের মানুষদের উপর ঢালাও অত্যাচারের নির্দেশ। তাই, অন্য সব কিছুর সমালোচনা হলেও ধর্মের বেলায় মাথায় হাত বোলাতে হবে – সেটা তো হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রগুলোতে ধর্ম ব্যাপারটি এতটাই সমাজের হাড়ে-মজ্জায় ঢুকে গেছে যে, ধর্মকে সমালোচনার হাত থেকে বাঁচানোকেই আমরা এখন স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করি।

অথচ ধার্মিকদের ধর্মানুভূতির মতো আমাদেরও 'নাস্তিকানুভূতি' কিন্তু আহত হতে পারতো। প্রতিনিয়ত হয়ও। আমাদের নাস্তিকানাভূতি প্রতিদিনই আহত হয়, যখন দেখি টিভি খুললেই কিংবা কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান শুরু হলেই কোরআন তেলোয়াত আর গীতা, ত্রিপিটক আউরে অদৃশ্য এবং অলীক ঈশ্বরকে খুশি করে অনুষ্ঠান শুরু করতে হয়;

---

[209] Edward Tabash, Atheists Must Not Self-Censor, Free Inquiry, vol 34 issue 1, 2013

আমাদের অবিশ্বাসের দর্শনানুভূতি আহত হয় যখন জোর করে ধর্মশিক্ষার মত রূপকথাকে মাধ্যমিক স্তরে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়, আমাদের বিজ্ঞানুভূতি আহত হয় যখন মেরাজ আর বোরাকের রূপকথাকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব টেনে এনে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করা হয় কিংবা বিবর্তনকে পাঠ্যপুস্তক থেকে অস্পৃশ্য করার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু এর জন্য কারো অনুভূতির বাটি চৌচির হতে দেখি না, মামলাও হয় না, হয় কেবল এর বিপরীতটি ঘটলেই।

অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ 'ধর্মানুভূতির উপকথা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন কয়েক বছর আগে। তিনি এই ধর্মানুভূতির উপকথা প্রবন্ধটি লেখার পর নিজেই মুক্তমনায় ইমেল করেছিলেন প্রকাশের জন্য। লেখাটি মুক্তমনা সাইটে রেখে দেয়া হয়েছিলো পিডিএফ আকারে। পরে অধ্যাপক আজাদ এই প্রবন্ধটিকে নিজের বইয়ে সংকলিত করেন যে বইটির শিরোনামও ছিল 'ধর্মানুভূতির উপকথা'। ব্যতিক্রমধর্মী এ প্রবন্ধটি পরবর্তীতে মুক্তমনার সংকলন গ্রন্থ 'স্বতন্ত্র ভাবনা' (২০০৮) তেও প্রকাশিত হয়। তিনি লেখাটিতে কিছু তাৎপর্যময় কথা বলেছিলেন যা, আজকের সময়েও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক –

> 'একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় আজকাল, কথাটি হচ্ছে 'ধর্মানুভূতি'। কথাটি সাধারণত একলা উচ্চারিত হয় না, সাথে জড়িয়ে থাকে 'আহত' ও 'আঘাত' কথা দুটি; শোনা যায় 'ধর্মানুভূতি আহত' হওয়ার বা 'ধর্মানুভূতিতে আঘাত' লাগার কথা। আজকাল নিরন্তর আহত আর আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে মানুষের একটি অসাধারণ অনুভূতি, যার নাম ধর্মানুভূতি। মানুষ খুবই কোমল স্পর্শকাতর জীব, তার রয়েছে ফুলের পাপড়ির মতো অজস্র অনুভূতি; স্বর্গ চ্যুত মানুষেরা বাস করছে নরকের থেকেও নির্মম পৃথিবীতে, যেখানে নিষ্ঠুরতা আর অপবিত্রতা সীমাহীন; তাই তার বিচিত্র ধরণের কোমল অনুভূতি যে প্রতিমুহূর্তে আহত রক্তাক্ত হচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যখন সুদিন আসবে, সে আবার স্বর্গে ফিরে যাবে, তখন ওই বিশুদ্ধ জগতে সে পাবে বিশুদ্ধ শান্তি; সেখানে তার কোনো অনুভূতি আহত হবেনা, ফুলের টোকাটিও লাগবে না তার কোনো শুদ্ধ অনুভূতির গায়ে। অনন্ত শান্তির মধ্যে সেখানে সে বিলাস করতে থাকবে। কিন্তু পৃথিবী অশুদ্ধ এলাকা, এখানে আহত হচ্ছে, আঘাত পাচ্ছে, রক্তাক্ত হচ্ছে তার নানা অনুভূতি – এটা খুবই বেদনার কথা; এবং সবচেয়ে আহত হচ্ছে একটি অনুভূতি, যেটি পুরোপুরি পৌরাণিক উপকথার মতো, তার নাম ধর্মানুভূতি।
>
> মানুষ বিশ্বকে অনুভব করে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে; ইন্দ্রিয়গুলো মানুষকে দেয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শ্রুতির অনুভূতি; কিন্তু মানুষ, একমাত্র প্রতিভাবান সৃষ্টিশীল প্রাণী মহাবিশ্বে শুধু এ-পাঁচটি ইন্দ্রিয়েই সীমাবদ্ধ নয়, তার আছে অজস্র ইন্দ্রিয়াতীত ইন্দ্রিয়। তার আছে একটি ইন্দ্রিয়, যার নাম দিতে পারি সৌন্দর্যন্দ্রিয়, যা দিয়ে সে অনুভব করে সৌন্দর্য; আছে একটি ইন্দ্রিয়, নাম দিতে পারি শিল্পেন্দ্রিয়, যা দিয়ে সে উপভোগ করে শিল্পকলা; এমন অনেক ইন্দ্রিয় আছে তার, সেগুলোর মধ্যে এখন

> সবচেয়ে প্রখর প্রবল প্রচণ্ড হয়েছে হয়ে উঠেছে ধর্মেন্দ্রিয়, যা দিয়ে সে অনুভব করে ধর্ম, তার ভেতর বিকশিত হয় ধর্মানুভূতি, এবং আজকের অধার্মিক বিশ্বে তার স্পর্শকাতর ধর্মানুভূতি আহত হয়, আঘাতপ্রাপ্ত হয় ভোরবেলা থেকে ভোরবেলা। অন্য ইন্দ্রিয়গুলোকে পরাভূত ক'রে এখন এটিই হয়ে উঠেছে মানুষের প্রধান ইন্দ্রিয়; ধর্মেন্দ্রিয় সারাক্ষণ জেগে থাকে, তার চোখে ঘুম নেই; জেগে থেকে সে পাহারা দেয় ধর্মানুভূতিকে, মাঝেমাঝেই আহত হয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে, বোধ করে প্রচণ্ড উত্তেজনা। এটি শিল্পানুভূতির মতো অনুভূতি নয় যে আহত হওয়ার যন্ত্রণা কেবল একলাই সহ্য করবে। এটা আহত হ'লে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ধর্মানুভূতির উত্তেজনা ও ক্ষিপ্ততায় এখন বিশ্ব কাঁপছে।'

হুমায়ুন আজাদের কথা একবর্ণ মিথ্যে নয়। ধর্মানুভূতি নামক জুজুর উত্তেজনা ও ক্ষিপ্ততায় এখন সারা বিশ্ব কাঁপছে। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ২০০৬ সালে ড্যানিশ একটি পত্রিকায় মোহাম্মদ (সঃ) এর বেশ কয়েকটি কার্টুন প্রকাশের পর ধর্মানুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে কিভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো সারা মুসলিম বিশ্ব। ড্যানিশ পত্রিকায় ছাপা হওয়া কার্টুনগুলো পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে এমনকি বাংলাদেশেও রাজনীতিবিদদের কার্টুন এর মানদণ্ডে মোটামুটি গোবেচারা ধরণের। সর্বমোট বারোটি ছবির মধ্যে, তিনটি কার্টুনকে বড়জোর ইসলাম এবং সন্ত্রাসের সাথে সম্পর্কিত করা যায়। আর এই কার্টুনগুলো ছাপানোর পরে সেগুলো না দেখেই পুরো পৃথিবীতে বিক্ষোভ প্রকাশে ফেটে পড়ে মুসলমানরা। সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডেনমার্ক কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান, এবং এমন ঘটনা যেন ভবিষ্যতে কেউ করার সাহস না পায়, তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের যথাযথ শাস্তি প্রদানের অনুরোধ করেন। এর ঠিক দুইবছর আগে ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে নেদারল্যান্ডের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রথমবারের মতো সম্প্রচারিত হয় চলচ্চিত্র নির্মাতা থিও ভ্যান গগের স্বল্প-দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'সাবমিশন' – যার মূল বিষয় ছিলো মুসলিম নারীর উপর আরোপিত ইসলামি সমাজের নির্যাতন কথা। থিও ভ্যান গগ আর তার চলচ্চিত্রের মাঝে সময়টা মোটে এক মাস। একই বছরের নভেম্বরের দুই তারিখ, ভ্যান গগ আমস্টারডামের রাস্তায় মুহাম্মদ বোয়েরি নামের এক ধর্মান্ধ মুসলমানের গুলিতে নিহত হন। গুলি করে মেরে ফেলেই খুনি ক্ষান্ত হয়নি, ছুরি দিয়ে তার মাথা আলাদা করে ফেলা হয়। ১৯৯২ সালে মিশরের লেখক ফারাজ ফদা ইসলামকে অপমান করার জন্য খুন হন, নোবেল পুরস্কার পাওয়া মিশরের আরেক উপন্যাসিক নাগিব মাহফুজকে ধর্মানুভূতিতে আঘাতের উছিলায় ছুরিকাঘাত করা হয় ১৯৯৪ সালে, ২০০৪ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রথাভাঙ্গা লেখক হুমায়ুন আজাদের উপর হামলা চালায় এদেশের একটি ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠী। চাপাতি দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলা হয় তার দেহ,যা পরে তাকে

প্রলম্বিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। দেশের সরকার অবশ্য সেসময় এটাকে সেক্যুলারিস্টদের কাজ বলে পার পেতে চেয়েছিলো, তৎকালীন ইসলামিস্ট মন্ত্রী এও বলেছিলেন, 'বাংলাভাইরা সব মিডিয়ার সৃষ্টি'।

ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক আছে কি নেই সেই চায়ের পেয়ালায় ঝড় তোলা পুরনো বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, ডেনমার্কের পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুনগুলো কিছু বাস্তবতার দিকে আঙ্গুল প্রদর্শন করে যে বাস্তবতায় আছে বাংলাদেশের বাংলা ভাই, বিদেশের ওসামা বিন লাদেন, আইমান আল যাওয়াহ্‌রি, আবু হামজা, মোহাম্মদ আতা সহ হাজার হাজার জিহাদি যারা কোরআন এবং হাদিসের বানী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হত্যা করছে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে। শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা কার্টুনটি দেখে এই বাস্তবতাটা দেখতে পারতেন, সে বাস্তবতায় সত্যতা পেলে সেটা সমাধানে সচেষ্ট হতে পারতেন, কিন্তু আমরা মানুষেরা – যা দেখতে চাই না, তা দেখিনা, তাই মুসলমানরা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লেগেছে বলে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। ডেনমার্কের পত্রিকার ব্যান চাইলেন, সম্পাদক পেলেন মৃত্যুর হুমকি।

চিত্র : ড্যানিশ পত্রিকায় কার্টুন ছাপানোর পরে ব্রিটেনের মুসলিমরা সন্ত্রাসের সাথে যে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, কিংবা ইসলাম যে কত শান্তিপূর্ণ ধর্ম, তা 'প্রমাণ' করতে রাস্তায় মিছিল করেছিল ব্যানার আর প্ল্যাকার্ড নিয়ে, যেগুলোতে লেখা ছিল 'যারা বলে ইসলাম ভায়োলেন্ট রিলিজিয়ন, তাদের কতল করুন', কিংবা 'ইসলামকে ব্যঙ্গ যারা করে তাদের ম্যাসাকার করুন'।

তারচেয়েও মজাদার ছিলো ব্রিটেনের কিছু মৌলবাদী মুসলিমদের কাজকর্ম। ব্রিটেনের মুসলিমরা সন্ত্রাসের সাথে যে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, কিংবা ইসলাম যে কত শান্তিপূর্ণ ধর্ম, তা 'প্রমাণ' করতে রাস্তায় মিছিল করেছিল ব্যানার আর প্ল্যাকার্ড নিয়ে, যেগুলোতে লেখা ছিলো – 'Slay those who insult Islam', 'Butcher those who mock islam', 'Behead those who say Islam is a violent religion'।

'যারা বলে ইসলাম ভায়োলেন্ট রিলিজিয়ন, তাদের কতল করুন' – এর চেয়ে বড় কার্টুন আর কি হতে পারে! সাধে কি আমরা বলি ধর্মই সকল বিনোদনের উৎস? তামাসা কেবল ড্যানিশ কার্টুন নিয়েই হয়নি, তামাসা হয়েছিলো বাংলাদেশে কার্টুনিস্ট আরিফের আঁকা আপাত নিরীহ 'মুহম্মদ বিড়াল' কার্টুন নিয়েও। বেচারা আরিফকে জেল খাটতে হয়েছিলো এর জন্য। অথচ সেই কার্টুন বহু আগেই প্রকাশ করেছিলো শিবিরের পত্রিকা 'কিশোর কণ্ঠ'। তখন অবশ্য কারো ধর্মানুভূতি আহত হতে দেখা যায়নি।

ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস-এর আর্টিকেল-১৯ এ পরিষ্কার বলা আছে –

> "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

রাষ্ট্রের কাছে থেকে তাই বাক স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার আশা করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাষ্ট্র সেটা না দিয়ে বরঞ্চ বাক-স্বাধীনতার অধিকাররোধে বেশি সচেষ্ট থাকে; রাষ্ট্র বেফাঁস কথা বলা পছন্দ করেনা, বিরোধিতা পছন্দ করেনা। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে রাষ্ট্রযন্ত্র মূলত ক্ষমতার মসনদ ধরে রাখার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠকে ধর্মীয় আফিমে নেশাগ্রস্ত করে রাখতে অনেক আগ্রহী – তাই এ ধরণের রাষ্ট্রযন্ত্রগুলো বাক স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার দেবার পরিবর্তে হরণে বেশি আগ্রহী। আর সেইসব রাষ্ট্রের আফিমগ্রস্থ মানুষেরা বিশ্বাস করে, আত্মঘাতী বোমা হামলা করে ত্রিশ জন মারার ঘটনা থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে ঘটনায় ইসলামকে জড়িয়ে খারাপ কিছু বলা হয়েছে কিনা – যদি হয়ে থাকে,তাহলে তারা আঘাত পায়। মূল ঘটনা ধামাচাপা পড়ে বড় হয়ে উঠে অন্য ঘটনা – যে ঘটনার খলনায়ক – 'ব্যাটা তোরে লিখতে কইছে কে'।

লিখবোনা? আঁকবোনা? যেখানে সমালোচনা দেখলে সমালোচকের গলা টেপার পরিবর্তে সমালোচনার কারণ খতিয়ে দেখা 'উচিৎ' – পৃথিবীর ধার্মিকেরা এতো সহজ ব্যাপারও বোঝেনা? মুখে শান্তির ধর্ম বলে ফ্যানা তুলে ফেলে সারা বিশ্বে সন্ত্রাসের চাষ করে বেড়ালে সেই দ্বিচারিতা নিয়ে কেউ ব্যঙ্গ করবে না? পৃথিবীর আলো-বাতাস-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সব ব্যবহার করে যারা আজও গুণগান গাইছে মধ্যযুগের হিংসা-বিদ্বেষভরা মতবাদগুলোর প্রতি, সেইসব বালুর মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা ব্যক্তিদের নিয়ে কৌতুক করাটা দোষের? পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ আহাম্মক গোষ্ঠীর মধ্যে কতোগুলো গোষ্ঠী আজও বিশ্বাস করে পৃথিবী সমতল, কতোগুলো মনে করে এলভিস প্রিসলি বেঁচে আছেন এখনও – এই আহাম্মকদের নিয়ে উপহাস করা যাবেনা? কারণ তারা আঘাত পাবে?

আমাদের দেশটায় আজ ধর্মের জয়জয়কার। ধর্মান্ধতার জয়জয়কার। জয়জয়কার নির্বুদ্ধিতার। অথচ বিজ্ঞান – যে সত্যিকার অর্থে আমাদের পার করিয়েছে নদী, সেতু তৈরি করে, কোনো নবী বা ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান নয় – সে বিজ্ঞানের চেতনা আমরা পরিহার করছি সযতনে – যদিও এইসব চেতনা বুঝতে একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই হয়। কিন্তু এতো সহজ একটা কাজও না করে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করি আমরা। ধর্মানুভূতির চাপে পড়ে আজ এদেশে বিবর্তনবিদ্যা পড়ানো হয়না, স্কুল কলেজের জীববিজ্ঞান বই থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয় জীববিজ্ঞানের মূল ভিত্তি বিবর্তন সেই বিষয়টাই। আমাদের ধর্মানুভূতির সেপাই আজও আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিতে চাইছেন, আমরা কী দেখবো, কী পড়বো, কী শুনবো আর কী শুনবোনা।

দেশের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াগুলোতে ধর্মের সমালোচনা বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু ইন্টারনেট? সেখানে সমালোচনা বন্ধ করা দরকার না? ধর্মানুভূতির সেপাইরা রাষ্ট্রকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন সে ব্যাপারে। আমাদের ধর্মানুভূতির সেপাইরা রাত ভর মাইকিং করে অন্য ধর্মের মানুষদের, অন্য দেশের মানুষের আরাম করে গালাগালি করে যেতে পারেন, কিন্তু ফেসবুকে তার ধর্মের বিরুদ্ধে একটা কথা শুনলে মুখ ভার করে ফেলেন। আসলেই কি ফেলেন? না ফেলেন না, কিন্তু সংগঠন ফেলে। সংগঠন তাদের পরিচালনা করে। আর যেহেতু এদেশে তাদের সংগঠন শক্তিশালী তাই রাষ্ট্র তাদের হাত করার জন্য তাদের পক্ষ নেয়, রাষ্ট্র আমাদের বিজ্ঞানানুভূতিতে নিয়ে চিন্তিত নয়, আমাদের সৌন্দার্যানুভূতি নিয়ে চিন্তিত নয়, আমাদের সভ্যতানুভূতি নিয়ে চিন্তিত নয় – হঠাৎ করে রাষ্ট্র চিন্তিত সংখ্যাধিক্য সংগঠনের ধর্মানুভূতি নিয়ে, কারণ সংখ্যালঘুদের বেইল দিয়ে লাভ নেই। মূলধারার পর ইন্টারনেটে তাই এখন ধীরে ধীরে পড়ছে ধর্মানুভূতির রক্ষার্থে কথা সেন্সরশিপের কোপানল।

ইন্টারনেট কি এভাবে দমানো সম্ভব?

ড্যানিশ কার্টুনের ঘটনা, থিও ভ্যান গগের ঘটনার পর সাউথ পার্কও মুসলমানদের একই রোষানলে পড়ে তাদের ২০০ এবং ২০১ তম পর্বটি সেন্সর করতে বাধ্য হয়। ভয় দেখিয়ে বর্তমান সময়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর এই নিরন্তর বাধার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ইন্টারনেটে এক অভূতপূর্ব আন্দোলনের জন্ম হয় – '*এভরিবডি ড্র মুহাম্মদ ডে*' নামে। একটি ফেসবুক পাতাকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ ছবি আঁকা হয়, মুহাম্মদের। এখানে একটি বিষয় মুসলমানদের বোঝা দরকার, মুহাম্মদের ছবি আঁকা তাদের জন্য নিষিদ্ধ হলেও যারা তাদের ধর্মভুক্ত নয় – তাদের জন্য কিন্তু এ নিয়ম খাটে না। ২০ মে ২০১০ সালে দিনটি পালনের আগের দিন পাকিস্তানের আদালত ফেসবুক ব্লক করে। কী লাভ হলো তাতে? এখানে বলে নেয়া উচিত, মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শুনেও

একজন মুসলিমের ধর্মানুভূতি আহত হওয়ার কথা, সেটার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হওয়ার কথা। কিন্তু হচ্ছে না, কেন? কারণ হিসেবে বলা যায়, কোন দেশের আইন বা মানুষের নৈতিকতার ভিত্তিটা গড়ে ওঠে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস বলে, ইসলাম ধর্ম এদেশে প্রবেশ করার পূর্বে আমরা ছিলাম জাতিগতভাবে সনাতন অথবা বৌদ্ধ ধর্মানুসারী – সুতরাং আমাদের যে মিশ্র ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং সহনশীলতার ইতিহাস আছে, মূল্যবোধ আছে – সেটা মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান ধর্মের মূল্যবোধে নেই। ক্ষেত্র বিশেষে ব্যতিক্রম হলেও, আমাদের দেশে ইসলাম প্রচারে এসেছিলো প্রধানত সূফী সাধকেরা, যাদের প্রেমের বাণী এদেশের মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে মৌলবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও আমরা কিন্তু সৌদি আরব কিংবা ইরানের মতো ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করি নি হাতে কলমে, আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সেটা বলে না। তাহলে কেন সেই মধ্যযুগীয় অন্ধ মূল্যবোধের দোহাই দিয়ে আমাদের রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করবে? ধর্মানুভূতি বলে কোন সুনির্দিষ্ট অনুভূতি চিহ্নিত করে কি কোন আইন প্রণয়ন করা সম্ভব? কারণ ধর্মানুভূতির ব্যাপারটাই বিমূর্ত এবং প্রত্যেক ধর্ম একে অপরের সাথে সঙ্ঘাতপূর্ণ। কোন সনাতন ধর্মাবলম্বী গিয়ে যদি আদালতে আবেদন করে গরু কোরবানির জন্যে তার ধর্মানুভূতি রক্তাক্ত – তাহলে রাষ্ট্র কি তার ধর্মানুভূতি রক্ষার জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে? যেহেতু রাষ্ট্রের চোখে সবাই সমান – প্রত্যেক ধর্মানুসারীই, না কি তখন আইন প্রণয়ন করা হবে সংখ্যাগুরু মানুষের মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে? পরোক্ষভাবে কি এখনো সেই ব্যাপারটাই হচ্ছে না? ভয়-ভীতি দেখিয়ে বই, পত্র-পত্রিকা বন্ধ করলেও এখন কি আর আদতে মুখ চেপে ধরা সম্ভব হয়?

পুরাতন পদ্ধতি আর কাজ করছে না, রাষ্ট্র – আর আমাদের সেন্সরকারীরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে নতুন এই ক্ষেত্র 'ইন্টারনেট'কে আটকে ফেলার উপায় বের করতে। উইকিলিক্স আমেরিকার আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধের গোপনীয় বিশাল নথি, গুয়ানতানামু কারাগার এবং আমেরিকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অসংখ্য নথি সংগ্রহ করে ইন্টারনেটে ছেড়ে দিয়ে সাংবাদিকতার এক নতুন দিগন্ত প্রতিষ্ঠা করে। আমরা দেখলাম, খুব আগ্রহ নিয়েই দেখলাম – পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকাও তাদের গলা টিপে ধরার প্রচেষ্টায় সফল হতে পারলো না। ২০১০-১১ সাল জুড়ে চলা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ঘনীভূত হয়ে ওঠা সংগঠিত চলমান আন্দোলনের পেছনে ইন্টারনেটের এবং সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোর প্রভাব আমরা সবাই দেখেছি। সিরিয়ার মতো একটি বদ্ধ দেশে থাকা মানুষেরা তাদের কথা, তাদের অবস্থা সারাবিশ্বকে জানাতে পেরেছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। তিউনিসিয়ায় চাকুরিবিহীন বেকার যুবকদের আগুনে আত্মাহুতি দেবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিউনিসিয়ার সরকারের প্রতি যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিলো তাকে ঠেকাতে ইন্টারনেটের সংযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলো সরকার। লাভ হয়নি, বরং

তিউনিসিয়ার সফল বিপ্লবকে চিহ্নিত করা হয়েছে ‘The Story of the First Successful Internet Revolution’ হিসেবে। মিশরের বিপ্লবীরাও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে ইন্টারনেট। মিশরের সরকার গদি বাঁচাতে ফেসবুক ইউটিউব টুইটার বন্ধ করে দিয়েছিলো, লাভ হয়নি সেখানেও। বাংলাদেশে এই আওয়ামীলীগ সরকারের আমলেও কদিন আগে যখন ধর্মানুভূতি এবং রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর ইমেজানুভূতিতে আঘাত করার জন্য ফেসবুক বন্ধ করার পায়তারা নেয়া হয়েছিলো তখন জনমানসে কী ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো, কিভাবে সরকার আবার নিজেদের হাস্যাস্পদ করে অবশেষে ফেসবুককে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলো, রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা নিশ্চয় তা ভুলে যায় নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভুল থেকে শিক্ষা নিতে তাদের খুব কমই দেখা গেছে।

রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা এখন তাই আবার নড়ে চড়ে বসেছে, আরেকটি মহাভুল আবারো করার জন্যই বোধ হয়। আবারো ইন্টারনেটের মুখ চেপে ধরতে তারা বদ্ধপরিকর। দিকে দিকে ব্লগ, ফেসবুক, টুইটারের নামে মামলা, কনটেন্ট মোছার আবেদন, ব্লক আরও কতো কী। সম্প্রতি তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (সংশোধন) অধ্যাদেশে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা, যেখানে ৫৭ ধারা নামে একটি ধারা সংযুক্ত হয়েছে। ‘অনুভূতির বাণিজ্য’ পুঁজি করে দেশের প্রগতিশীল মুক্তমনা লেখকদের হুমকির মুখে রাখা এবং পরিস্থিতি বুঝে তাদের কারাগারে প্রেরণটাই যেন এর একমাত্র উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যেই এর শিকার হয়ে কারাগারে গেছেন মুক্তবুদ্ধির দুই তরুণ মাহমুদর রহমান রায়হান (রায়হান রাহী) এবং উল্লাস দাশ। যখন এগুলোতেও ফায়দা হয় না, তখন হয় শারীরিক আক্রমণ। কিন্তু তারা ভুলে যান, হুমায়ুন আজাদ, রাজীব কিংবা আসিফ মহিউদ্দীনকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়েও মুক্তবুদ্ধির অগ্রযাত্রা স্তিমিত করা যায়নি; বরং আমরা বেড়েছি, চারা গাছ হিসেবে জন্ম নিয়ে মহীরুহ আকারে ছড়িয়ে পড়েছি এখানে ওখানে সর্বত্র। কয়জনকে হেনস্থা করবে, কয়টা সাইট বন্ধ করবে? আজকে যে কোন ব্লগে গেলেই, কিংবা ফেসবুক, টুইটারের যে কোন জায়গাতেই মুক্তবুদ্ধির স্বপক্ষে হাজারো আলোচনা চোখে পড়ে। কেবল পাঁচ ছয়টি সাইট বন্ধ করে দিলেই সব শেষ হয়ে যাবে? মুক্তমনারা আজ আর একটি সাইটে নয়, মুক্তমনা একটি সফল আন্দোলনের নাম যা ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সাইটে, ফেসবুক পেইজে, মানুষের মনে, চিন্তা-চেতনায়। প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিক্রিয়ায় এ আন্দোলন রাতারাতি বন্ধ হয়ে যাবে -সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

সমাজ ধর্মহীন হয়ে গেলে কি উচ্ছন্নে যাবে?

এই বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা সুইডেনের একটি সংবাদ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ০৩ তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত সেই

সংবাদ থেকে জানা গিয়েছিল, সুইডেনের কারাগারগুলো নাকি সব ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিগত সময়গুলোতে কারাবন্দির সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়ার ফলেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে রাষ্ট্রকে।

আমাদের মত দেশ যেটা দুর্নীতিতে শীর্ষস্থানীয়, যেখানে বিশ্ব-বেহায়া এরশাদের মত সুযোগসন্ধানী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কিংবা রাষ্ট্রীয় নেতা হবার গৌরব নিয়ে থাকেন, যেখানে কেউ সুযোগ পেলেই অন্যের ঘাড় ভেঙে, চুরি চামারি কিংবা প্রতারণা করে টু-পাইস কামিয়ে নিতে চায়, তাদের হয়তো ব্যাপারটা অবাক করবে। হয়তো তারা আরো অবাক হবেন জেনে যে, সুইডেন পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নাস্তিক-প্রধান দেশ (দেশটিতে নাস্তিকের হার শতকরা ৪৫ থেকে ৮৫ ভাগ হিসেবে উঠে এসেছে বিভিন্ন সমীক্ষায়)।

আমাদের দেশের অনেকেই যারা ধর্ম এবং নৈতিকতাকে এক করে দেখেন, যারা মনে করেন ধর্ম না থাকলেই সমাজ উচ্ছন্নে যাবে, তাদের কাছে 'প্রায় ধর্মহীন' সুইডেনে কারাবন্দিদের সংখ্যা এভাবে কমে যাওয়ার উদাহরণটা হয়তো খানিকটা বিস্ময়ের বটে। এর কারণ আছে। সেই ছেলেবেলা থেকেই নৈতিক চরিত্র গঠনের মূলমন্ত্র হিসেবে আমাদের শেখানো হয়েছে ধর্ম যারা পালন করে তারাই ভাল। কিংবা দোষ করলে আল্লাহ গোনাহ দিবে ইত্যাদি। ছোটবেলা থেকেই এইভাবে নৈতিকতার সাথে ধর্মের খিচুড়ি একসাথে মিশিয়ে খাওয়ানোর ফলে আমরা বড় হয়েও আর ভাবতেই পারি না যে ধর্ম মানা ছাড়াও কারো পক্ষে ভালো মানুষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু সত্যিই কি ধর্মের সাথে নৈতিক চরিত্র গঠনের কোনো বাস্তব যোগাযোগ আছে?

ব্যাপারটির অনুসন্ধান করে আমি আমার সহলেখক রায়হান আবীরের সাথে মিলে বছর দুয়েক আগে একটা বই লিখেছিলাম 'অবিশ্বাসের দর্শন' নামে[210]। বইটি লিখতে গিয়ে একাডেমিয়ায় প্রকাশিত বেশ কিছু পরিসংখ্যান নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়েছিল, পরিচিত হয়ে হয়েছিল গবেষকদের প্রাসঙ্গিক কাজের সাথে। সবচেয়ে আলোচিত ছিল ফিল জুকারম্যানের উদাহরণটি। ভদ্রলোক ক্যালিফোর্নিয়ার একটি কলেজের সোশিওলজি বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ২০০৫ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। সেসব দেশগুলোতে ঈশ্বরে বিশ্বাস এখন একেবারেই নগণ্য পর্যায়ে নেমে এসেছে। যেমন, সুইডেনের কথা আমরা আগেই বলেছি; সেখানে জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ ভাগ এবং ডেনমার্কে প্রায় ৮০ ভাগ লোক এখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। অথচ সেসমস্ত 'ঈশ্বরে অনাস্থা পোষণকারী' দেশগুলোই আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত এবং সবচেয়ে কম সহিংস দেশ হিসেবে চিহ্নিত বলে ফিল সাহেবের গবেষণায় উঠে এসেছিল।

ফিল জুকারম্যান তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি বই লিখেছেন, 'ঈশ্বরবিহীন

---

[210] অভিজিৎ রায় এবং রায়হান আবীর, অবিশ্বাসের দর্শন, জাগৃতি, ২০১৫

সমাজ' (Society without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment) শিরোনামে।

তিনি সেই বইয়ে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন যে, ডেনমার্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আরহাসে থাকাকালীন সময়গুলোতে কোনো পুলিশের গাড়ি দেখেন নি বললেই চলে। প্রায় ৩১ দিন পার করে তিনি প্রথম একটি পুলিশের গাড়ি দেখেন রাস্তায়। পুরো ২০০৪ সালে মাত্র একজন লোক হত্যার খবর প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, সেই ২০০৪ সালে পুরো বছর জুড়ে প্রায় পঁচিশ লক্ষাধিক মানুষ বসবাসকারী মেট্রোপলিটন শহর আরহাসে সংগঠিত খুনের সংখ্যা ছিল এক। এ থেকে বোঝা যায় এ সমস্ত দেশগুলোতে মারামারি হানাহানি কতো কম। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে ডেনমার্ক পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দেশ।

মোদ্দাকথা হল – বেশিরভাগ ড্যানিশ এবং সুইডিশ আমাদের দশের মত ধর্ম দ্বারা সংজ্ঞায়িত 'গুনাহ' বা পাপ নামক কোনো ব্যাপারে বিশ্বাসী নন অথচ দেশ দু'টিতে অপরাধ প্রবণতার হার পৃথিবীর সকল দেশের তুলনায় সর্বনিম্ন। এই দুই দেশের প্রায় কেউই চার্চে যায় না, পড়ে না বাইবেল। তারা কি অসুখী? ৯১ টি দেশের মধ্যে করা এক জরিপ অনুযায়ী, সুখী দেশের তালিকায় ডেনমার্কের অবস্থান প্রথম, যে ডেনমার্কে নাস্তিকতার হার মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা আশি ভাগ। স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় মাত্র ২০ শতাংশের মতো মানুষ ঈশ্বরের বিশ্বাস করেন, তারা মনে করেন ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর পরের জগতে। আর বাকিরা স্রেফ কুসংস্কার বলে ছুঁড়ে ফেলেছেন এ চিন্তা।

'ঈশ্বরহীন' এইসব সমাজের অবস্থাটা তবে কেমন? দেশগুলো কি সব উচ্ছন্নে গেছে, যেভাবে আমাদেরকে ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়েছে? না, তা যায়নি। বরং, সমাজের অবস্থা মাপার সকল পরিমাপ – গড় আয়ু, শিক্ষার হার, জীবন যাপনের অবস্থা, শিশুমৃত্যুর নিম্নহার, অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থা, লিঙ্গ সাম্যাবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, দুর্নীতির নিম্নহার, পরিবেশ সচেতনতা, গরীব দেশকে সাহায্য সবদিক দিয়েই ডেনমার্ক ও সুইডেন অন্যান্য সকল দেশকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে উপরে। তবে পাঠকদের আমরা এই বলে বিভ্রান্ত করতে চাই না যে, এইসব দেশে কোনো ধরণের সমস্যাই নেই। অবশ্যই তাদেরও সমস্যা আছে। তবে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য তারা যৌক্তিক পথ বেছে নেয়, উপর থেকে কারও সাহায্যের অপেক্ষা করে না, কিংবা হাজার বছর পুরনো গ্রন্থ ঘেঁটে সময় নষ্ট করে না। ইহজাগতিক সমস্ত সমস্যার সমাধান ইহজাগতিকভাবেই সমাধানের চেষ্টা এবং উদ্যোগ নিয়েছে তারা।

কেবল ফিল জুকারম্যানের কাজই নয়, অবিশ্বাসের দর্শন বইটিতে আরো অনেক পরিসংখ্যান নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলাম। আমরা দেখিয়েছিলাম, আমেরিকায় নাস্তিকদের চাইতে পুনরুজ্জীবিত খ্রিস্টানদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার

বেশি; এও দেখা গিয়েছে, যেসব পরিবারের পরিবেশ ধর্মীয়গতভাবে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল সেসমস্ত পরিবারেই বরং শিশুদের উপর পরিবারের অন্য কোনো সদস্যদের দ্বারা বেশি যৌন নিপীড়ন হয়। ১৯৩৪ সালে আব্রাহাম ফ্রান্সব্লাউ তার গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন ধার্মিকতা এবং সততার মধ্যে বরং বৈরী সম্পর্কই বিদ্যমান। ১৯৫০ সালে মুর রসের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, ধার্মিকদের তুলনায় নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরাই বরং সমাজ এবং মানুষের প্রতি সংবেদনশীল থাকেন, তাদের উন্নয়নের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ১৯৮৮ সালে ভারতের জেলখানায় দাগী আসামীদের মধ্যে একটি জরিপ চালিয়েছিল। জরিপের যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল অবাক করার মতো। দেখা গিয়েছে, আসামীদের শতকরা ১০০ জনই ঈশ্বর এবং কোনো না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী। আমেরিকায়ও এরকম একটি জরিপ চালানো হয়েছিল ৫ ই মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে। সে জরিপে দেখা গেছে যে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (৮-১০%) ধর্মহীন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা কম, সে তুলনায় ধার্মিকদের মধ্যে শতকরা হিসেবে অপরাধ-প্রবণতা অনেক বেশি। ফেডারেল ব্যুরোর দেয়া পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় জেল হাজতে নাস্তিকর মাত্র ০.২ ভাগ, বাকিরা সবাই ধার্মিক। আমি জানি, আজ বাংলাদেশে জরিপ চালালেও ভারতের মতোই ফলাফল পাওয়া যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, বেহেস্তের লোভ বা দোজখের ভয় কোনোটাই কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে নি। আল্লাহর গোনাহ কিংবা ঈশ্বরের ভয়েই যদি মানুষ পাপ থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারত, তবে তো বাংলাদেশ এতদিনে বেহেস্তে পরিণত হতো। অথচ বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বরাবরই থাকে তালিকার শীর্ষে। এই তো ধর্মপ্রাণ, আল্লাহ-খোদায় বিশ্বাসী বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা। অপরদিকে সুইডেন কিংবা ডেনমার্কের মতো ঈশ্বরবিহীন দেশগুলোর দিকে তাকালে বুঝতে পারি আমাদের দেশের ধর্মকেন্দ্রিক নৈতিকতার কলসিটা কতটা ফাঁপা।

দেশে কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় হয়েছে সম্প্রতি। কাদের মোল্লা, নিজামী, গোলাম আজম, সাকা চৌধুরী কিংবা বাচ্চু রাজাকারের মতো মানুষেরা আমাদের বারবারেই মনে করিয়ে দেয়, যে ধর্মকে নৈতিকতার উৎস বলে মনে করা হয়, সেই ধর্মের নামে মানুষেরা কতটা নৃশংস হয়ে উঠতে পারে সুযোগ পেলেই। একাত্তরে রাজাকারদের কাজকর্ম আমাদের অনেক সময়ই চোখ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মানবিকতার চেয়ে ধর্মের সৈনিকদের কাছে ধর্মবোধটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। শুধু একাত্তর তো কেবল নয়, বছর কয়েক আগে গুজরাটে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দাঙ্গা, আর তারও আগে অযোদ্ধায় বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে শিবসেনাদের তাণ্ডব নৃত্য ধর্মের তথা বিশ্বাসের ভাইরাসগুলোর ভয়াবহ রূপটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভাইরাসমুক্ত জীবন : এক চলমান যাত্রাপথের নাম

যে কোন ভাইরাস সংক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য গড়ে তোলা দরকার 'এন্টিবডি', সহজ কথায় তৈরি করা দরকার ভাইরাস-প্রতিষেধকের। আর এই সাংস্কৃতিক ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে পারে আমার –আপনার মত বিবেকসম্পন্ন প্রগতিশীল মানুষেরাই। আমি কিন্তু আসলেই মনে করি এই এন্টিবডি তৈরি করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সামাজিক সচেতনতা। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান মনস্ক, যুক্তিবাদী সাইটগুলোর বড় সড় ভূমিকা আছে। ভূমিকা রাখতে পারে বিশ্বাসের নিগড় থেকে বেরুনো মানবতাবাদী গ্রুপগুলো এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী ব্যক্তিবর্গ। দরকার সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার, দরকার খোলস ছেড়ে বেরুনোর মত সৎ সাহসের, দরকার আমার-আপনার সকলের সামগ্রিক সদিচ্ছার। আপনার আমার এবং সকলের আলোকিত প্রচেষ্টাতেই হয়ত আমরা একদিন সক্ষম হব সমস্ত বিশ্বাস-নির্ভর 'প্যারাসাইটিক' ধ্যান ধারণাগুলোকে তাড়াতে, এগিয়ে যেতে সক্ষম হব বিশ্বাসের ভাইরাস-মুক্ত নীরোগ সমাজের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে।

প্রিয় ব্যক্তিত্ব রবার্ট গ্রিন ইঙ্গারসোলের একটি উক্তি দিয়ে শুরু হয়েছিল আমার এই বইটি – 'বিশ্বাসী মন খাঁচায় বন্দি পাখি, আর মুক্তমন যেন মুক্ত বিহঙ্গ – ঘন মেঘের পর্দা ভেদ করে উড়ে চলা অবিশ্রান্ত এক ডানামেলা ঈগল'। বিশ্বাসের ভাইরাসের কুফলগুলো বোঝার পর বোধ হয় কারোরই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। বইয়ের শেষ প্রান্তে এসে আমরা আবারো সেই ইঙ্গারসোলের শরণাপন্ন হব। ইঙ্গারসোল ছিলেন পেশায় আইনজীবী, অসাধারণ বাগ্মী, এবং ঊনবিংশ শতকের প্রখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী মুক্তচিন্তক। 'Ingersoll's Vow' নামে ইঙ্গারসোলের ছোট একটা রচনা আছে, যেটা আমার খুব প্রিয়[211]। সে লেখাতে ইঙ্গারসোল ব্যক্ত করেছেন, যখন তিনি সকল বিশ্বাসের ভাইরাস থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলেন চারপাশের সবকিছুই প্রাকৃতিক, ঐশ্বরিক কিছু নেই, তখন কী ভীষণ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তার মন। রায়হান আবীর তাঁর 'মানুষিকতা' গ্রন্থে সে অংশটির অনুবাদ সংকলিত করেছিলেন 'ইঙ্গারসোলের প্রতিজ্ঞা' শিরোনামে, যেটি সবসময়ই আমার কাছে এক অনাবিল প্রেরণার উৎস[212]:

> 'যেদিন নিশ্চিতভাবে বুঝে গেলাম আমার চারপাশের সবকিছুই প্রাকৃতিক, সকল দেবতা, অপদেবতা কিংবা ঈশ্বর মানুষের সৃষ্ট পৌরাণিক চরিত্র ব্যতীত কিছুই নন, সেদিন সত্যিকারের স্বাধীনতার তীব্র আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছিল আমার মন, শরীরের প্রতিটি কণা, রক্তবিন্দু, ইন্দ্রিয়। আমাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা চার দেয়াল টুকরো টুকরো হয়ে মিশে গেল ধুলোয়, আলোর স্রোতে আলোকিত হয়ে গেল আমার

---

[211] Ingersoll's Vow, http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/RelSci/vow.html

[212] রায়হান আবীর, মানুষিকতা, শুদ্ধস্বর, ২০১৩

অন্ধকূপের প্রতিটি কোণ। সেদিন থেকে আমি কারও চাকর, সেবক বা বান্দা নই। এই পৃথিবীতে আমার কোনো মনিব নেই, আমার কোনো মনিব নেই এই সীমাহীন মহাবিশ্বেও।

আমি স্বাধীন, মুক্ত-চিন্তা করতে, চিন্তারাজি প্রকাশে, আদর্শ নির্ধারণে, ভালোবাসার মানুষদের সঙ্গী করে নিজের মতো বাঁচতে। আমি স্বাধীন আমার মানসিক এবং শারীরিক ক্ষমতা ব্যবহারে, প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে কল্পনার ডানা মেলে উড়ে যেতে, নিজের মতো স্বপ্ন দেখতে, আশা করতে। আমি স্বাধীন — নিজের মতো ভাবতে। আমি স্বাধীন — নির্দয়, উগ্র ধর্মকে অস্বীকার করতে। আমি স্বাধীন — অসভ্য, মূর্খের 'অলৌকিক' গ্রন্থসমূহ এবং এগুলোকে পুঁজি করে ঘটা অসংখ্য নিষ্ঠুরতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। আমি স্বাধীন অসংখ্য মহাজাগতিক মিথ্যা থেকে, স্বাধীন সীমাহীন শাস্তির ভীতি থেকে, আমি স্বাধীন ডানাওয়ালা ফেরেশতা থেকে, শয়তান থেকে, জ্বিন-ভূত এবং ঈশ্বর থেকে। জীবনে প্রথমবারের মতো আমি স্বাধীন।

আমার চিন্তার রাজ্যে সেদিন থেকে নেই আর কোনো নিষিদ্ধ জায়গা, নেই কোনো অশরীরী শৃঙ্খল যা বেঁধে রাখে আমার অবয়বকে, আমাকে রক্তাক্ত করার জন্য নেই কোনো অলৌকিক চাবুক, আমার মাংসের জন্য নেই কোনো আগুন। আমার মাঝে নেই ভয়, আমার মাঝে নেই অন্যের দেখানো পথে হাঁটার দায়বদ্ধতা, আমার প্রয়োজন নেই কারও সামনে অবনত হওয়া, কাউকে পূজা করা, আমার প্রয়োজন নেই মিথ্যে কথা বলারও। আমি মুক্ত। ভয়-ভীতি, মেরুদণ্ডহীনতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেদিন আমি প্রথমবারের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, জগতকে নতুন করে দেখার, ভাবার চেতনা নিয়ে।

আমার অন্তর সেদিন কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়েছিল। আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিলাম ইতিহাসের সেই সব নায়কদের প্রতি, মানুষের প্রতি যারা নিজের জীবন বিপন্ন, বিসর্জন করেছিল মানুষের হাত এবং মস্তিষ্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে। আমি ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম পৃথিবীর আলোকিত সকল সন্তানদের, যাদের কেউ আত্মাহুতি দিয়েছিল মূর্খের সাথে যুদ্ধে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল অন্ধ প্রকোষ্ঠে আ-বদ্ধাবস্থায়, যাদের মাংস পুড়েছিল ধর্মান্ধদের আগুনে। আলোকিত সেইসব সাহসী মানুষেরা, যারা এসেছিল পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, যাদের চিন্তায়-কর্মে স্বাধীনতা পেয়েছে মানুষের সন্তানেরা। অতঃপর আমি নিচু হলাম, যে আলোর মশাল তারা জ্বালিয়েছিলেন সে আলোর মশাল তুলে নিলাম নিজের হাতে, উঁচু করে তুলে ধরলাম সেটা, এ আলো নিশ্চয়ই একদিন জয় করবে সকল অন্ধকার।'

ড.ডেরেল রে যে কথাগুলো বলে তার 'গড ভাইরাস' বইটি শেষ করেছেন, সে কথাগুলো উচ্চারণ করে আমিও সমাপ্তি টানবো আমার এই 'বিশ্বাসের ভাইরাস' বইটির[213] –

> 'ভাইরাস মুক্ত জীবনের আস্বাদন কোন সুনির্দিষ্ট গন্তব্য নয়, বরং একটি চলমান যাত্রাপথের নাম। আমরা সবাই এই ভাইরাস দিয়ে কোন না কোনভাবে আক্রান্ত, এবং আমরা নিজেদের অজান্তেই বয়ে নিয়ে যাই অসুস্থ বিশ্বাস, মতামত কিংবা ধারণা। আমাদের অনেকের মাথাই আক্রান্ত করে ফেলা হয়েছে আমাদের শিশু বয়সেই আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের পানপাত্র হাতে তুলে দিয়ে। আক্রান্ত মননকে প্রতিষেধক দিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ করে ফেলাই হবে আমাদের যাত্রাপথের লক্ষ্য। আমরা যদি বিশ্বাসের ভাইরাসের কুফলগুলো সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকতে পারি, তবেই আমরা ভাইরাস মুক্ত সমাজ প্রত্যাশা করতে পারি।'

আর সেটা যদি আমরা পারি, তাহলে ইঙ্গারসোলের মতোই আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারব, 'এ আলো একদিন জয় করবে সকল অন্ধকার'।

---

[213] Darrel W. Ray, The God Virus: How religion infects our lives and culture, IPC Press; First edition, December 5, 2009